বৌ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দোকানীর বৌ

সরলার পায়ে সব সময় মল থাকে। মল বাজাইয়া হাঁটে সরলা,—ঝমর ঝমর! চুপি চুপি নিঃশব্দে হাঁটিবার দরকার হইলেও মল সরলা খুলিয়া ফেলে না, উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া শক্ত করিয়া পায়ের মাংসপেশীতে আটকাইয়া দেয়,—মল আর বাজে না। প্রথম প্রথম শম্ভু এ খবর রাখিত না, ভাবিত বৌ আশে পাশে আসিয়া পৌঁছানোর আগে আসিবে মলের আওয়াজের সঙ্কেত—পিছন হইতে মোটর আসিবার আগে যেমন হর্ণের শব্দ আসে। ক'বার বিপদে পড়িয়া বৌ এর মলের উপর শম্ভুর নির্ভর টুটিয়া গিয়াছে।

ঘোষপাড়ার প্রধানতম পথটার ধারে একখানা বড় টিনের ঘরের সামনের খানিকটা অংশে বাঁশের মাচার উপর শম্ভুর দোকান। মাটির হাঁড়ি, নানা কেরোসিন কাঠের তক্তার চৌকো চৌকো খোপ, ছোট বড় বারকোশ, চটের বস্তা ইত্যাদি আধারে রক্ষিত জিনিসপত্রের মাঝখানে শম্ভুর বসিবার ও পয়সা রাখিবার ছোট চৌকী, হাত ও লোহার হাতা বাড়াইয়া এখানে বসিয়াই শম্ভু অধিকাংশ জিনিষের নাগাল পায়। পিছনে প্রায় এক মানুষ উঁচু পাঁচ সারি কাঠের তাক। সাবু, বার্লি ও দানাদার চিনি রাখিবার জন্ত এক পাশে কাচ বসানো হলদে রঙের টিন, এলাচ,

লবঙ্গ প্রভৃতি দামী মসলার নানা আকারের পাত্র, লণ্ঠনের চিমনী, দেশলাই-এর প্যাকেট, কাপড়-কাচা গায়ে-মাখা সাবান, জুতার কালি, লজেঞ্জস্ এবং মুদিখানা ও মনোহারী দোকানের আরও অনেক বিক্রেয় পদার্থের সমাবেশে তাকগুলি ঠাসা। তাকের তিন হাত পিছনে শম্ভুর শয়নঘরের মাটিলেপা চাঁচের বেড়ার দেয়াল। তাক আর এই দেয়ালের সমান্তরাল রক্ষণাবেক্ষণে যে সরু আবছা অন্ধকার গলিটুকুর সৃষ্টি হইয়াছে, শম্ভুর সেটা অন্দরে যাতায়াত করার পথ। সরলা বৌ-মানুষ, অন্দরেই তার থাকার কথা, কিন্তু সরলা মাঝে মাঝে করে কি, পায়ের মল উপরে ঠেলিয়া দিয়া চুপি চুপি তাকের জিনিষের ফাঁকে চোখ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, স্বামীর দোকানদারী দেখে এবং খদ্দেরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শোনে। বাড়ীতে শম্ভু খুব নিরীহ শান্ত প্রকৃতির চুপচাপ মানুষ, কিন্তু দোকানে বসিয়া খদ্দেরের সঙ্গে তাকে কথা বলিতে ও হাসি-তামাসা করিতে দেখিয়া সরলা অবাক মানে। মানুষ বুঝিয়া এমন সব হাসির কথা বলে শম্ভু যে তাকের আড়ালে সরলার হাসি চাপিতে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। ক্রেতারা যদি পুরুষ হয় তবেই শম্ভুর ব্যবহারে এরকম মজা লাগে সরলার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শম্ভুর দোকানে শুধু পুরুষেরাই জিনিষ কিনিতে আসে না।

বেচা কেনা শেষ হওয়া পর্যন্ত সরলা অপেক্ষা করে, তারপর পায়ের মলগুলি আলগা করিয়া দেয় এবং মাটিতে লাথি মারার মত জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া অন্দরে যায়। শম্ভুও ভিতরে আসে। একটু পরেই। দেখিতে পায় উনান নিবিয়া আছে, ভাত-ডালের হাঁড়ি গড়াগড়ি দিতেছে উঠানে, আর স্বয়ং সরলা গড়াইতেছে রোয়াকে। অন্য দুর্লক্ষণগুলি শম্ভু তেমন গুরুতর মনে করে না ; ঘরে তিন পুরুষের পালঙ্কে প্রশস্ত সুখশয্যা থাকিতে রোয়াকে ছেঁড়া মাদুরে কালা, কানা, বোবা ও

বিকৃতমুখী সরলাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াই সে কাবু হইয়া যায়। তারপর অনেকক্ষণ তাকে ওজন করিয়া কথা বলিতে ও সোহাগ জানাইতে হয়। একটা মানুষের একটু হাসা ও একটা মানুষকে একটু হাসানোর মধ্যে যে দোষের কিছুই নাই আর একটা মানুষ যে কেন তা বুঝিতে পারে না বলিয়া অনেক আপশোষ করিতে হয়, আর অজস্র পরিমাণে খরচ করিতে হয় দোকানে বিক্রীর জন্য রাখা লজেঞ্জস্। সরলা একেবারে লজেঞ্জস্ খাওয়ার রাক্ষসী। তাও যদি কম দামী লজেঞ্জস্ খাইয়া তার সাধ মিটিত! পয়সায় যে লজেঞ্জস্ শম্ভু দুটির বেশী বিক্রী করে না, কেউ চার পয়সার কিনিলেও একটি ফাউ দেয় না, সেইগুলি সরলার গোগ্রাসে গেলা চাই।

তারপর সরলার কানাত্ব কালাত্ব ও বোবাত্ব ঘোচে এবং রাগের আগুন নিবিয়া যায়। তবে একটা উদাস-উদাস অবহেলার ভাব, কথায় কথায় অভিমান করিয়া কাঁদ কাঁদ হওয়া, এ সমস্তের ওষুধ হিসাবে দরকার হয় একখানা শাড়ী, দামী নয়, সাধারণ একখানা শাড়ী, ডুরে হইলেই ভাল।

এক বছর মোটে দোকান করিয়াছে শম্ভু, এর মধ্যে এমনি ভাবে এবং এই ধরণের অন্য ভাবে সরলা সাতখানা শাড়ী আদায় করিয়াছে। সাধারণ কম দামী শাড়ী,—ডুরে হইলেই ভাল।

তবু, বছরের শেষাশেষি চৈত্র মাসের কয়েক তারিখে, অকারণে শম্ভু তাকে আর একখানা ডুরে শাড়ী কিনিয়া দিল। বলিল অবশ্য যে ভালবাসিয়া দিয়াছে, একটু বাড়াবাড়ি রকমের ব্যগ্রতার সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম স্পষ্ট করিয়াই বলিল, কিন্তু বিনা দোষে সাতবার জরিমানা আদায়-কারিণী বৌকে এরকম কেউ কি দেয়? যাই হোক, শাড়ী পাইয়া এত খুসী হইল সরলা যে আর এক দণ্ডও স্বামীর বাড়ীতে থাকিতে পারিল না, বেড়ার ওপাশে শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। শম্ভুর বাড়ীটা আসলে

আস্ত একটা বাড়ী নয়, একটা বাড়ীর একটুকরা অংশ মাত্র,—তিন ভাগের এক ভাগ। দোকানঘর ও শয়নঘরে ভাগ করা বড় ঘরখানা, উত্তরের ভিটায় আর একখানা খুব ছোট ঘর, তার পাশে রান্নার একটি চালা আর শয়ন ঘরের কোণ হইতে রান্নার চালাটার কোণ পর্যন্ত মোটা শক্ত ডবল চাঁচের বেড়া দিয়া ভাগ করা তিনকোণা এক টুকরা উঠান। শম্ভুরা তিন ভাই কিনা, তাই বছর খানেক আগে এই রকম ভাবে পৈতৃক বাড়ীটা ভাগ করা হইয়াছে, বেড়ার এপাশে শম্ভুব এক ভাগ এবং ওপাশে অন্য দু-ভায়ের বাকী দুভাগ। এপাশে শম্ভু আর সরলা থাকে, ওপাশে একত্র থাকে শম্ভুব দাদা দীননাথ ও ছোট ভাই বৈদ্যনাথ, তাদের বৌ আর ছেলেমেয়ে, শম্ভুর বিধবা মা আর মাসী এবং শম্ভুর দুটী বোন। এভাবে শুধু বৌটিকে লইয়া বাড়ীর উঠানে বেড়া দিয়া ভিন্ন হওয়ার জন্য শম্ভুকে ভয়ানক স্বার্থপর মনে হইলেও আসল কারণটা কিন্তু তা নয়। এক বছর আগে শম্ভু ছিল বেকাব, সরলার দোকানদার বাবা বিষ্ণুচরণ তখন অবিকল এই রকমভাবে ভিন্ন হওয়ার সর্ত্তে জামাইকে দোকান করার টাকা দিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয়, স্বামীকে ভেড়া বানাইয়া নয়, বর্ত্তমান সুখ ও স্বাধীনতাটুকু সবলা তার বাপের টাকাতেই কিনিয়াছে!

কি সুখ সরলার, কি স্বাধীনতা! বেড়াব ওপাশে যাদের কাছে সে ছিল একটা বেকার লোকের বৌ, বেড়ার এপাশে এখন তাদের শোনাইয়া শোনাইয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া হাঁটিতে তার কি গর্ব, কি গৌরব! দোকানটা ভালই চলিতেছে শম্ভুব, ওদের টানাটানির সংসারের তুলনায় তার কি সচ্ছলতা! একটু মুখ ভার করিলে তার ডুরে শাড়ী আসে, না করিলেও আসে।

সরলার পরণে নূতন ডুরে শাড়ীখানা দেখিয়া বেড়ার ওপাশের অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করিল। তার মধ্যে সবচেয়ে কড়া হইল

ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা বড়-জা কালীর মন্তব্য। শীর্ণ মুখে ঈর্ষা বিকীর্ণ করিয়া বলিল, নাচনেউলী সেজে গুরুজনদের সামনে আসতে তোর লজ্জা করে না মেজ-বৌ? যা যা নাচ দেখিয়ে ভোলাগে যা স্বামীকে।

ছোট-জা ক্ষেন্তির মাথায় একটু ছিট্ আছে কিন্তু ঈর্ষা নাই। সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ঝম্-ঝম্ যা মল বাজে সারাদিন, মেজদি নিশ্চয় দিন রাত্তিব নাচে, দিদি। পান খাবে মেজদি?

হঠাৎ ভাসুরের আবির্ভাব ঘটায় লম্বা ঘোমটা টানিয়া সরলা একটু মাথা নাড়িল। দীননাথ গম্ভীর গলায় বলিল, মেজবৌ কেন এসেছে পুঁটি?

বিবাহেব তিন মাসের মধ্যে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত কাঠির মত সরু পুঁটি বলিল, এমনি।

এমনি আসবার দরকার!—বলিয়া দীননাথ সরিয়া গেল। সরলা ঘোমটা খুলিল এবং বৈদ্যনাথ আসিয়া পড়ায় ক্ষেন্তি টানিল ঘোমটা। বৈদ্যনাথ একটু রসিক মানুষ, শম্ভু কেবল দোকানে বসিয়া বাছা বাছা খদ্দেরের সঙ্গে রসিকতা করে, বৈদ্যনাথ সময় অসময় মানুষ অমানুষ বাছে না। সম্ভবতঃ রাত্রে তার রসিকতায় চাপিয়া চাপিয়া হাসিতে হয় বলিয়া ক্ষেন্তিব মাথায় যখন-তখন কারণে অকারণে খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠার ছিট দেখা দিয়াছে। সে আসিয়াই বলিল, মেজো বৌঠান যে সেজেগুজে! কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, এঁ্যা? ও পুঁটি, দে দে বসতে দে, ছুটে একটা দামী আসন নিয়ে আয়গে ছিনাথ বাবুর বাড়ী থেকে।

এই রকম করে সকলে সরলার সঙ্গে। কেবল শম্ভুর মা বড় ঘরের দাওয়ার কোণে বসিয়া নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে মালা জপিয়া যায়; সরলা সামনে আসিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিলেও চাহিয়া দেখে না।

সরলা পায়ে হাত দিতে গেলে শুধু বলে, নতুন কাপড় পরে ছুঁয়ো না বাছা।

সরলার দাঁতগুলি একটু বড় বড়। সাধারণতঃ কোন সময়েই সেগুলি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে না। কুড়ি মিনিট শ্বশুরবাড়ী কাটাইয়া বাড়ী ফেরার সময় দেখা গেল তার অধর ও ওষ্ঠে আজ নিবিড় মিলন হইয়াছে।

ভিন্ন হওয়ার আগে ওরা সরলাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিত। উঠানে বেড়া ওঠার আগে সরলা ছিল ভারি রোগা ও দুর্বল, কাজ করিত বেশী, খাইত কম, বকুনি শুনিয়া শুনিয়া ঝালাপালা কাণ দুটিতে শম্ভুও কখনও মিষ্টি কথা ঢালিত না।

এক বছর একা থাকিয়া সরলার শরীরটি হইয়াছে নিটোল, মনটি ভরিয়া উঠিয়াছে সুখ ও শান্তিতে। রাণীর মত আছে সরলা, রান্না ছাড়া কোন কাজই একরকম তাকে করিতে হয় না, পাড়ার একটি দুঃখী বিধবা কাজগুলি করিয়া দিয়া যায়। দোকান করার জন্য তার বাবা যত টাকা শম্ভুকে দিবে বলিয়াছিল, সব এখনও দেয় নাই, অল্পে অল্পে দিয়া দোকানের উন্নতি করার সাহায্য করিতেছে। মাসে একবার করিয়া আসিয়া দোকানের মজুত মালপত্র ও বেচা কেনার হিসাব দেখিয়া যায়। প্রত্যেকবার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে ইতিমধ্যে শম্ভুর পত্নীপ্রেমে সাময়িক ভাঁটাও কখনও পড়িয়াছিল কি না। বড় সন্দেহ-প্রবণ লোকটা, বড় অবিশ্বাসী,—নয় তো মেয়ের আহ্লাদে গদ-গদ ভাব আর ডুরে শাড়ীর বহর দেখিবার পর ও-কথাটা আর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার চেষ্টা করিত না।

দুঃখ যদি সরলার কিছু থাকে সেটা তার এই পরম কল্যাণকর একা থাকিবার দুঃখ। বেড়ার ওধারে অশান্তি-ভরা মস্ত সংসারটির কলরব দিনরাত্রি তার কাণে আসে, ছোট বড় ঘটনাগুলির ঘটিয়া চলা

এ বাড়ীতে বসিয়াই সে অনুসরণ করিতে পারে; ছেলেমেয়েগুলি কখনও কাঁদে ক্ষুধায় আর কখনও কাঁদে মার খাইয়া, বড়-জা কখনও কারণে অকারণে চেঁচায়, ছোট-জা কখনও খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ধমক শোনে, ছোট দেবর কখনও কাকে খোঁচা দিয়া ঠাট্টা করে, কবে কে আত্মীয়স্বজন আসে যায়। বেড়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সরলা স্থানে স্থানে কয়েক জোড়া ফুটা করিয়াছে, সরিয়া সরিয়া এই ফুটাগুলিতে চোখ পাতিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। ওই আবর্তের মধ্যে কিছুক্ষণ পাক খাইয়া আসিতে বড় ইচ্ছা হয় সরলার।

নিজের বাড়ী আসিয়া সে ডুরে শাড়ী ছাড়িল না, রান্নার আয়োজন করিল না; একবার শম্ভুর দোকানদারী দেখিয়া আসিয়া ছটফট করিতে লাগিল। বিকালে তার বাবা আসিবে, বাপের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে কি না তাই ভাবিতে লাগিল সরলা। কত কথা মনে আসে, আলস্যের প্রশ্রয়ে অবাধ্য মনে। শম্ভু বেকার ছিল তাই আগে সকলে তাকে দিত যন্ত্রণা, ভিন্ন হইয়া আছে বলিয়া এখন সকলে তার সঙ্গে ব্যবহার করে খারাপ। বেড়াটা ভাঙিয়া আবার ভাঙা বাড়ী দুটাকে এক করিয়া দিলে ওরা কি তাকে খাতির করিবে না? তার স্বামী এখন রোজগার করে, ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশী করিবে, এই সমস্ত ভাবিয়া? তবে মুস্কিল এই, এখন যদি দোকানের আয়ে ওরা ভাগ বসায় দোকানের উন্নতি হইবে না, এমন একদিন কখনও আসিবে না যেদিন লোহার সিন্দুকে টাকা রাখিতে হইবে শম্ভুকে। যত ডুরে শাড়ী সে আদায় করুক আর লজেঞ্জস্ খাক, দোকানের আয় ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব তো সরলা জানে। তিন পুরুষের পালঙ্কে গিয়া সে শুইয়া পড়ে। কত দিন পরে ও-বাড়ীর সকলের ভয় ভালবাসা

ও সমীহ কিনিবার মত অবস্থা তার হইবে হিসাব করিয়া উঠিতে না পারিয়া বড় কষ্ট হয় সরলার।

অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া অভ্যাসমত সরলা একবার বেড়ার মাঝখানের ফুটায় চোখ পাতিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ও-বাড়ীতে বড় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া শম্ভু সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে শম্ভুকে সে বেড়ার ওদিকে দেখিতে পায়। এতে সরলা আশ্চর্য হয় না, সে পরের মেয়ে সে যখন যায়, শম্ভুও মাঝে মাঝে যাইবে বইকি! সরলার কাছে বিস্ময়কর মনে হয় শম্ভুর সঙ্গে সকলের ব্যবহার। ভিন্ন হওয়ার জন্য রাগ করা দূরে থাক কেউ যেন একটু বিরক্ত পর্যন্ত হয় নাই শম্ভুব উপর। বেড়া ডিঙ্গানো মাত্র ওপাশেব মানুবগুলির সঙ্গে শম্ভু যেন এক হইয়া মিশিয়া যায়, এতটুকু বাধা পায় না। পুঁটি এক গ্লাস জল আনিয়া দিল শম্ভুকে। সকলের সঙ্গে কি আলোচনা শম্ভু করিতেছে সবলা বুঝিতে পারিল না; মন দিয়া সকলে তার কথা শুনিতে লাগিল আর খুশী হইয়া কি যেন বলাবলি করিতে লাগিল নিজেদেব মধ্যে। শম্ভু উঠিয়া আসিবার পরেও ওদের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। সরলা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, তার স্বামীর যোগ আছে অথচ তার জানা নাই এমন কি গুরুতর ব্যপার থাকিতে পাবে যে এত পবামর্শ দরকার হয়? জিজ্ঞাসা করিতে শম্ভু বলিল, ও কিছু না। জমিজমা ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা হচ্ছিল। আমাব ভাগটা বেচে ফেলব ভাবছি কি না।

—কেন, বেচবে কেন?

শম্ভু মুখ ভার করিয়া বলিল, তুমি জান না, না? কবে থেকে বলছি তেল নূন বেচে লাভ নেই একদম বাজারে একটা মণিহারী দোকান করব,—তাতে টাকা লাগবে না? কোথায় পাব টাকা, জমি

না বেচলে ?

সরলা বলিল, জমির থেকেও আয় তো হচ্ছে ?

—দোকানে বেশী হবে।

সরলা চিন্তিতা হইয়া বলিল, কবে খুলবে বাজারে দোকান ?

—পয়লা বোশেখ খুলব ভাবছি, এখন আমার অদেষ্ট।

প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া মুখের সামনে তুড়ি দিল শম্ভু, মাথা নাড়িল, বাঁকা হইয়া বসিল। বলিল, তোমার বাবা বলেছিল সব সুদ্ধ ছশ টাকা দেবে দোকান করতে, দোকান খোলার জন্যে একশ দিয়ে বাকী টাকা আটকে দিলে। এক বছরে আর মোটে দুশ দিয়েছে তারপর—এমনি করলে দোকান চালাতে পারে মানুষ? দোকান করতেও একসঙ্গে টাকা চাই।

মনে মনে একটা জটিল হিসাব করিয়া সরলা বলিল, বাবা ত আসবে আজ, বাবাকে বলব ?

শম্ভু বিমর্ষ মুখে বলিল, ব'লে কি হবে? বিশ ত্রিশ টাকার বেশী একসঙ্গে দেবে না।

আমি বললে নিয্যস দেবে, বলিয়া সরলা একগাল হাসিল।

তারপর বৌকে লজেঞ্জস্ দিল শম্ভু, কালো গালে অদৃশ্য রং আনিল আর ফিস ফিস করিয়া নিজের গোপন মতলবের কথা বলিতে লাগিল। মা'র হাতে কিছু টাকা আছে শম্ভুব, সব ছেলের চেয়ে শম্ভুকেই তার মা বেশী ভালবাসে তা ত জানে সরলা, ওই টাকাটা বাগানোর ফিকিরে আছে শম্ভু, নয়ত এত বেশী ওবাড়ীতে যাওয়ার তার কি দরকার! বাজারে মস্ত দোকান খুলিবে শম্ভু, এবার আর দোকানদারী নয়, রীতিমত ব্যবসাদারী,—বাবাকে বাকী টাকাটা এক সঙ্গে দিবার কথা বলিতে সরলা যেন না ভোলে। দুর্গা দুর্গা। না, এবেলা আর রাঁধিবার দরকার

নাই। ফলারটলার করিলেই চলিবে। আহা, গরমে সরলার রাঁধিতে কষ্ট হইবে যে।

সরলা জানে হিসাবে ভুল হইতেছে, বাটখারা লাভের দিকে না-ঝুঁকিবার সম্ভাবনা আছে. তবু স্বামীর সঙ্গে আর বেশী দোকানদারী করা ভাল নয়। বাপের টাকায় স্বামীকে কিনিয়া রাখিয়াছে এক বছর, এবার তাকে মুক্তি দেওয়াই ভাল, তাতে যা হয় হইবে। একদিন ত নিজেকে কোন রকম রক্ষাকবচ ছাড়াই স্বামীর হাতে সমর্পণ করিতে হইবে তার। তা ছাড়া এক বছর ধবিয়া স্বামী তাকে যে-রকম ভালবাসিয়াছে সেটা শুধু নিজের মনের খুঁতখুঁতানির জন্য ফাঁকি মনে করা উচিত নয়। অবশ্য, পেটে যে সন্তানটা আসিয়াছে সেটা জন্মগ্রহণ করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেই সব চেয়ে ভাল হইত, এতদিন একসঙ্গে বাস করিয়া সরলার কি আব জানিতে বাকী আছে নিজেব ছেলের মুখ দেখিলে শম্ভুর পাকা শক্ত মনটা কি রকম কাঁচা আর নবম হইয়া যাইবে। তবে ছেলেটার জন্মিতে এখনও অনেক দেবি। তার আগে জমি বেচিয়া বাজারে মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিলে শম্ভু ভাবিবে সব কীর্ত্তি তার একার, কারও কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কিছু নাই। আগেকার কথা মনে করিয়া সরলা অবশ্য ভাবিয়া উঠিতে পারে না কৃতজ্ঞতার কতখানি দাম আছে শম্ভুর কাছে। বাজারে মনোহারী দোকান খুলিয়া দু-এক বছরের মধ্যে এমন অবস্থা যদি হয় শম্ভুর যে মাঝখানের বেড়াটা ভাঙিয়া সরলা নির্ভয়ে এবং সুখে শান্তিতে, একরকম বাড়ীর কর্ত্রীর মতই সকলের সঙ্গে বাস করিতে পারে, হয়ত অকৃতজ্ঞ পাষাণের মত শম্ভু নিজেই তাকে দাবাইয়া রাখিবে। তবু, ভবিষ্যতেও সে তাব বশে থাকিতে পারে এ রকম

একটু সম্ভাবনা যখন দেখা গিয়াছে এবারে হাল ছাড়িয়া দেখাই ভাল যে কি হয়।

সরলার সন্দেহপ্রবণ অবিশ্বাসী বাবা মেয়ের অনুরোধ শুনিয়া প্রথমটা একটু ভড়কাইয়া গেল। একসঙ্গে তিন-শ টাকা! জামাইকে আর একটি পয়সা না দিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। দোকান যেমন চলিতেছে শম্ভুর, তাতে দু-জন মানুষের খাইয়া-পরিয়া থাকা চলে, বড়লোকের মত না হোক গরীবের মত চলে। জামাইকে বড়লোক করিয়া দিবার ভার ত সে গ্রহণ করে নাই। মোট ছ'শ টাকা অবশ্য সে দিবে বলিয়াছিল, তবে সংসারে কত সময় মানুষ অমন কত কথা বলে, সব কি আর চোখ-কান বুজিয়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত, না তাই মানুষ পারে? অবস্থা বুঝিয়া করিতে হয় ব্যবস্থা। তাছাড়া, বাজারে মনোহারী দোকান খোলার মত দুর্বুদ্ধি যদি শম্ভু করিয়া থাকে—

কাঁদিয়া-কাটিয়া সরলা অনর্থ করিতে থাকে. কত কষ্টে বাপের কাছ হইতে টাকাটা সে আদায় করিয়া দিতেছে, শম্ভুকে তা বোঝানোর জন্য যতটা দরকার ছিল তার চেয়ে বেশী কাঁদাকাটা করে। দেবে বলেছিলে এখন দেবে না বলছ বাবা?—বলিতে বলিতে দুঃখে অভিমানে বুকটাই যেন ফাটিয়া যাইবে সরলার। একসঙ্গে তিনশ টাকা দেওয়া সরলার বাবার পক্ষে সহজ নয়, তবু একবেলা মেয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সে হার মানিল। ছেলে তার আছে তিনটা কিন্তু আর মেয়ে নাই। সরলা তার একমাত্র মা-মরা ছোট মেয়ে। কোথায় দোকান করিবে, কি রকম দোকান খুলিবে, কত টাকার জিনিয রাখিবে দোকানে আর কত টাকা পুঁজি রাখিবে হাতে, শম্ভুকে এসব অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সরলার বাবা গম্ভীর চিন্তিত মুখে বিদায় হইয়া গেল।

সরলা বলিল—দেখলে?

শম্ভু যথোচিত ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইল। স্বামীদের যে-ভাবে স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান উচিত ঠিক সে ভাবে নয়, নম্র ভাবে, সবিনয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই সময় বেড়ার ওপাশে হঠাৎ শোনা গেল ছোটবৌ ক্ষেন্তির খিলখিল হাসি। বেড়ার ফুটায় সে চোখ পাতিয়া ছিল নাকি এতক্ষণ, তাদের আলাপ শুনিতেছিল? রান্নার চালাটার পিছন দিয়া ঘুরিয়া সরলা চোখের নিমেষে ও-বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। বৈদ্যনাথ ক্ষেন্তি আর বাড়ীর কুকুরটা ছাড়া উঠান নির্জন। উঠানের বেড়া আর ধানের মরাইটার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রসিক বৈদ্যনাথ স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা করিতেছিল।

—সবাই কোথা গেছে লো ছোটবৌ?

কাছে আসিয়া ক্ষেন্তি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, ঘরে।

সেটা সম্ভব। চৈত্রের দুপুরে ঘরের বাহিরে কড়া রোদ, গরম বাতাস। কিন্তু এদের দুজনের কি ঘর নাই? এখানে এরা কি করিতেছে এ সময়? হাসাহাসি? নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া বারান্দা ছাড়িয়া এবার সরলা ও শম্ভু ঘরে গেল। তিন পুরুষের পুরানো পালঙ্কে (ভিন্ন হওয়ার সময় ভাইদের কবল হইতে শম্ভু সেটা কি কৌশলে বাগাইয়াছিল আজও সরলা তাহা বুঝিতে পারে না) শুইয়া সরলা চোখ বুজিল, শম্ভু বসিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল তামাক। নিজেই তামাক সাজে কি না শম্ভু, এত বেশী তামাক দেয় যে তামাক শেষ হইতে হইতে দুপুরে এবং রাত্রে দু-বেলাই সরলার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আজ দেখা গেল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয় বাপের সঙ্গে সমস্ত সকালবেলাটা লড়াই করিয়া না-হয় বৈদ্যনাথ ও ক্ষেন্তিকে ধানের মরাইয়ের আড়ালে রোদে দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করিতে দেখিয়া সরলা বোধ হয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

দিন-সাতেক পরে শম্ভু সকাল বেলা সরলার বাবার কাছ হইতে টাকা আনিবার জন্য রওনা হইয়া গেল। গেল ও-বাড়ী হইয়া। দোকানে নূতন মাল আনা সে কিছুদিন আগেই বন্ধ করিয়াছিল, অনেক জিনিষ ফুরাইয়া গিয়াছে, অনেক খদ্দের ফিরিয়া যায়। মনোহারী দোকানে যে-সব জিনিষ রাখা চলিবে না,—চাল ডাল মশলাপাতি, সে সব শেষ হইয়া যাওয়াই ভাল। তাই আজকাল একটা দিনের জন্যও দোকানটা সে বন্ধ রাখিতে চায় না। বৈদ্যনাথ আসিয়া দোকানে বসিবে। বেকার রসিক বৈদ্যনাথ। শম্ভুর যে ছোট ভাই এবং যে দুপুর রোদে উঠানে ধানের মরাইয়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া বৌয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে। শম্ভুও একদিন বেকার ছিল, বৌও ছিল শম্ভুর—ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত হাড্ডিসার হোক, বৌ বৌ। ক্ষেন্তিই বা এমন কি রূপসী পরীর মত? ওর মাথায় বরং ছিট আছে, এক বছর আগেকার সরলার মত কম খাইয়া বেশী খাটিতে খাটিতেও কারণের চেয়ে অকারণেও বেশী খিল্ খিল্ করিয়া হাসে। বেকার অবস্থায় একবারও নয়, দোকানদার হওয়ার পর শম্ভুকে কয়েক বার হাসাহাসি করিতে দেখিয়াছে সরলা, কিন্তু সে অন্য এক জনের সঙ্গে। তারপর শম্ভু বৌকে কিনিয়া দিয়াছে ডুরে শাড়ী। অন্য অনেকের সঙ্গেই বৈদ্যনাথ হাসাহাসি করে, ক্ষেন্তিকে কিন্তু কখনও কিছু কিনিয়া দেয় না। কি করিয়া দিবে? পয়সা নাই যে!' দু-ভায়ের মধ্যে প্রভেদটা কি আশ্চর্যজনক! নামে নামে পর্যন্ত শুধু 'নাথ'এর মিল, ওটা বাদ দিলে এক জন শম্ভু অন্য জন বৈদ্য!

মন না বাজাইয়া দোকানে তাকের আড়ালে দাঁড়াইয়া সরলা বৈদ্যনাথের অনভ্যস্ত দোকানদারী দেখে। মালপত্রের অভাবে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লক্ষ্মী-ছাড়া মনে হয় দোকানটা।

ক'দিন হইতে মনটা ভাল ছিল না সরলার, উঁচু দাঁত দুটি অনেক সময় ঢাকা পড়িয়া যাইতেছিল। পাকা দোকানীর মেয়ে সে, কাঁচা দোকানীর বৌ, তার কেবল মনে হইতেছিল ভুল হইয়াছে, ভুল হইয়াছে, শুধু লোকসান নয়, একেবারে সে দেউলিয়া হইয়া যাইবে এবার। কিছু দিন হইতে কি রকম যেন হইয়া উঠিয়াছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা তার; সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তবু চোখ-কান বুজিয়া এই সব না-বোঝা অবস্থা ও ঘটনাগুলিকে পরিণতির দিকে চলিতে সাহায্য করিতেছে। আজকাল শম্ভু ঘন ঘন ও-বাড়ীতে যাওয়া-আসা সুরু কবিয়াছে, ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে, সেটা না হয় জমিজমার ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্যই হইল, শম্ভুব সঙ্গে ও-বাড়ীব সকলেব ব্যবহার? ও-বাড়ীতে কি শুধু দেবদেবী বাস কবে যে, এক বছর ধরিয়া এমন ভাবে ভিন্ন হইয়া থাকিয়া জমিজমার ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতে গেলেও শম্ভুর সঙ্গে ওরা সকলে পরমাত্মীয়েব মত ব্যবহার কবিবে? তাছাড়া এখানকার দোকান তুলিয়া দিয়া বাজারে দোকান খুলিতেছে শম্ভু, সে জন্য ও-বাড়ীতে একটা উত্তেজনার প্রবাহ আসিবে কেন? ওদেব কি আসিয়া যায? বেড়াব ফুটায় চোখ রাখিয়া সবলা স্পষ্ট বুঝিতে পারে ও-বাড়ীর বয়স্ক মানুষগুলির কি যেন হইয়াছে, অদূব ভবিষ্যতে বিবাহ উপনয়নেব মত বড় রকম একটা ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে বাড়ীব লোকগুলি যেমন কবে, ওরাও করিতেছে অবিকল তেমনই। হইতে পারে শম্ভুব বাজাবে দোকান খোলাব একই সময়ে ওদের সংসাবেও একটা বড় ব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, তবে সেটা কি ব্যাপার তা সবলা জানিতে পারিতেছে না কেন? বেড়ার ওপাশে যা ঘটিবে, সকলে গোপন না করিলে সরলার কাছে তো তা গোপন থাকাব কথা নয়। আর, সরলার কাছে সকলে যা গোপন করিবে, তার পক্ষে সেটা কি কখনও শুভকর হইতে পারে?

শুধু টাকা আদায়ের চেষ্টা করার বদলে বাপের সঙ্গে এ-সব বিষয়ে পরামর্শ না-করার জন্য সরলার দুঃখ হয়। মেয়েমানুষ সে, এত লোকের ষড়যন্ত্র সে কি সামলাইয়া চলিতে পারে? চক্রান্তটা বুঝিতে পারিলেও বরং আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া দেখিত, একটা বুদ্ধি খাটানো চলিত। সে যে অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে, স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। সে যে ঠিক করিয়াছে এবার হাল ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল! মেয়েমানুষ সে, বৌ-মানুষ সে, তার কি উচিত এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখা যাহাতে তার বিরুদ্ধে সকলের চুপি চুপি চক্রান্ত করিতে হয়?

দোকানে খদ্দের নাই দেখিয়া এক সময় সে বৈদ্যনাথকে ভিতরে ডাকিল।

—আচ্ছা ঠাকুরপো, ও তোমাদের বাড়ী গিয়ে কি সব ব'লত বল ত?

রসিক বৈদ্যনাথ বলিল, তা জান না মেজো বৌঠান? তোমার নিন্দে করত—তুমি নাকি দাদার এক কান ধরে ওঠাও, আর এক কান ধরে বসাও। কানের ব্যাথায়—

সরলা রাগিয়া বলিল, চাষার মতন কথাবার্তা হয়েছে তোমার বাপু, এদিকে এক পয়সা রোজগার নাই, কথা শুনলে গা জ্বলে মানুষের। বিক্রীর পয়সা থেকে আজ কত গাপ করবে তুমিই জান!

ক'দিন আগে ধানের মরাইয়ের আড়ালে বৌ-এর সঙ্গে হাসাহাসি করার পুরস্কার পাইয়া বৈদ্যনাথ দোকানে গিয়া বসিল। সরলা গালে হাত দিয়া রোয়াকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল ভবিষ্যতের কথা। বড় ভাই উকীলের মুহুরী, পাত্র নিজে একটা পাস দিবার দু-ক্লাস নীচে পর্যন্ত পড়িয়া একটা আড়তে হিসাব লেখার কাজ করে, এত সব দেখিয়া তার বাবা শম্ভুর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়াছিল, তার দাঁত-উঁচু কালো মেয়েকে।

না-ই বা দিত? পাশের গাঁয়ের জগৎ নামে যে লোকটি জমি চাষ করিয়া খায় তার সঙ্গে দিলেই হইত? সে লোকটা এমনিই বশে থাকিত সরলার, আর অদৃষ্টে থাকিলে তাহাকে দিয়া আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি করিয়া এমন দিন হয়ত সে আনিতে পারিত যখন ডুরে শাড়ীটি পরিয়া মল বাজাইয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইত, না করিত সংসারের কাজ, না শুনিত কারও বকুনি। দোকানদারের দাঁত-উঁচু কালো মেয়ের মুখ্যু চাষা স্বামীই ভাল। লেখাপড়া শিখিয়া পরের আড়তে যে কাজ করে আর পরের টাকায় দোকানী হয়, তার মত পাজী বজ্জাত লোক—

পরদিন অনেক বেলায় শম্ভু ফিরিয়া আসা মাত্র সরলা টের পাইল, যে-লোকটা কাল বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল অবিকল সেই লোকটাই ফিরিয়া আসে নাই। গিয়াছিল দম-আটকানো অবস্থায়, ফিরিয়া আসিয়াছে হাঁফ ছাড়িয়া। শম্ভু একবার একটা মামলায় পড়িয়াছিল, রায় প্রকাশের দিন সে যেমন অবস্থায় কোর্টে গিয়াছিল আর স্বপক্ষে রায় শুনিয়া যেমন অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া-আসা তার সঙ্গে মেলে।

টাকা পেলে? সরলা জিজ্ঞাসা করিল।

শম্ভু একগাল হাসিয়া বলিল, হাঁ পেয়েছি।

—সব?

—সব। পাখাটা কই? বাতাস কর না একটু।

সরলা হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, ওই যে পাখা বেড়ার গায়ে। হ্যাগো, দাদা কিছু বলল না এই টাকার ব্যাপার নিয়ে? বিয়ের সময় তোমাকে চার-শ টাকা পণ দেওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে যে কাণ্ডটা বেধেছিল দাদার!

শম্ভুর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল, কড়া দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, ঘেমেটেমে এলাম এই রোদে, পাখাটা পর্যন্ত এনে দিতে পার না

তুমি হাতে? অন্য কেউ হ'ল বাতাস করত নিজে থেকে, বলতেও হ'ত না।

সরলা হাসিয়া বলিল, ছোটবৌ করে, ঠাকুরপো ওকে খুব হাসায় কি না সেই জন্যে।

পাখাটা আনিয়া সরলা স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল বটে, বাতাসে শম্ভু কিন্তু ঠাণ্ডা হইল না। ভিতরে ভিতরে সে যে গরম হইয়াই আছে সেটা বুঝা যাইতে লাগিল তার মুখের ভাবে ও তাকানোর রকমে। সরলা আনমনে বলিতে লাগিল, আহা, আমার মাথার যত চুল তত বচ্ছর পরমায়ু হোক ছোট-বৌয়ের!

—কেন?

—কাল রাত্তিরে দুঃস্বপন দেখলাম যে। হাসতে হাসতে ছোটবৌটা যেন মরে গেছে বুক ফেটে। আগুন লাগুক আমার পোড়া স্বপন দেখায়!

শম্ভু রাগিয়া বলিল, ইয়ার্কি জুড়েছ নাকি আমার সঙ্গে, এ্যাঁ? ভাল হবে না বলছি। ঘেমেটেমে এলাম আমি —

বকুনি শুনিয়া সরলা অভিমান করিয়া পাখা ফেলিয়া রোয়াকে গিয়া ছেড়া মাদুরে শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া তেল মাখিতে মাখিতে শম্ভু বলিল, রাগ হ'ল নাকি? রাগবার মত কি তোমাকে বলেছি শুনি?

সরলা জবাব না দেওয়ায় গামছা কাঁধে সে স্নান করিতে চলিয়া গেল পুকুরে। চলন্ত স্বামীকে দেখিতে দেখিতে চৈত্রের রোদে চোখে যেন ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল সরলার! ডুরে শাড়ী নয়, লজেঞ্জস নয়, সোহাগ নয়, মিষ্টি কথা নয়, শুধু সে রাগ করিয়াছে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়া স্নান করিতে চলিয়া যাওয়া! একদিনে এমন অধঃপতন হইয়াছে শম্ভুর? কে জানে স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়া ডাল পোড়া লাগার জন্য সরলাকে

হয়ত আজ সে গালাগালি পর্য্যন্ত দিয়া বসিবে! সব কথা খুলিয়া বলিয়া বাবার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কি ভুলই সে করিয়াছে।

ডাল পোড়া-লাগার জন্য শম্ভু কিছু বলিল না, বরং মুখ ভার করিয়া না থাকার জন্য একবার অনুরোধই করিল সরলাকে। সরলা সজল সুরে বলিল, বকলে কেন? শম্ভু বলিল, না বকিনি। ঘেমেটেমে এলাম কিনা—

খাওয়ার পর সরলাই আজ তাকে তামাক সাজিয়া দিল। সাজিয়া দিল, ফুঁ দিয়া তামাক ধরাইয়া দিল না। আয়নার সামনে সে অভিনয় করিয়া দেখিয়াছে যে ফুঁ দিবার সময় বড় বিশ্রী দেখায় তার মুখখানা। শম্ভু নিজেই তামাক ধরাইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত টানিতে আরম্ভ করিল। সরলা বলিল, ঠাকুরপো যা বিক্রী-সিক্রী করেছে, হিসাব নিও।

শম্ভু বলিল, নেব।

সরলা বলিল, রাখালবাবুর বাড়ী আধ মণ চাল নিয়েছে, ছিনাথ উকীলের বাড়ী আড়াই সের মুগের ডাল, আড়াই-পো মিছরি আর গায়ে মাখা একটা সাবান, তাছাড়া খুচরো জিনিষ অনেক বিক্রী হয়েছে। ভাঁড়ে ক'রে ঠাকুরপো অনেকটা তেল বাড়ী নিয়ে গেছে কাল, আর আজ নিয়ে গেছে কতগুলো লেবেঞ্চুস, আর কিসের যেন একটা কৌটো, অত নামটাম জানি না বাপু আমি, জিজ্ঞেস ক'রো।

শম্ভু বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন।

তারপর এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। সরলা একবার ও-বাড়ীতে গেল। কেহ তাহাকে আসিতেও বলে না, বসিতেও বলে না, তবে এতদিনে এটা তার সহ্য হইয়া গিয়াছে। বড়-জা কালী শুইয়া আছে, ক্ষেন্তি সেলাই করিতেছে কাঁথা, বৈদ্যনাথ ঘুমে অচেতন। শাশুড়ী উবু হইয়া বসিয়া মালা জপিয়া চলিয়াছে, কাছে চুপচাপ বসিয়া আছে পুঁটি। ভাসুর এ-সময় কাজে যায়, নাম মাত্র ঘোমটা দিয়া অনেকটা

স্বাধীনভাবেই সরলা খানিকক্ষণ এঘরে খানিকক্ষণ ওঘরে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। ক্ষেন্তির কাছেই সে বসিল বেশীক্ষণ। ফিস্ ফিস্ করিয়া আবোল-তাবোল কতকগুলি কথা বলিল ক্ষেন্তি, একবার খিলখিল করিয়া হাসিল, আসল কথা একটিও আদায় করা গেল না তার কাছে। বাড়ী আসিয়া পালঙ্কে উঠিয়া সরলা বসিয়া রহিল। টাঙানো বাঁশে সাজানো জামা কাপড়গুলি জোর বাতাসে দুলিতেছে, ওর মধ্যে সরলার ডুরে শাড়ী দুখানাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শম্ভুর ঘাড়ের কাছে লোমভরা মস্ত জন্মচিহ্নটি। কাৎ হইয়া শুইয়া আছে শম্ভু, চওড়া পিঠে শয্যায় বিছানো পাটির ছাপ। সরলা বিছানায় উঠিবার পর সে পাশ ফিরিয়াছে, সরলার দিকে নয়, ও দিকে। কে জানে এটা তার ভাগ্যেরই ইঙ্গিত কি না! এরকম কত ইঙ্গিত ভাগ্য মানুষকে আগে-ভাগে করিয়া রাখে। শম্ভুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে সোনারপুরে তার জন্য খুব ভাল একটি পাত্র দেখিতে বাহির হওয়ার সময় তার বাবা চৌকাটে হোঁচট খাইয়াছিল, আগের বারের ছেলেটা তার পেটের মধ্যেই যেদিন মরিয়া গিয়াছিল তার আগের রাত্রে একটা প্যাঁচা ঘরের পিছনে আমগাছটায় ডাকিয়া ডাকিয়া ভয়ে তাহাকে আধমরা করিয়া দিয়াছিল।—সরলা হঠাৎ শক্ত হইয়া যায়, লম্বাটে হইয়া যায় তার মুখখানা। বেড়ার গায়ে ঠিক এমনি সময় একটা টিকটিকিও যে ডাকিয়া উঠিল আজ? মাগো, না জানি কি আছে সরলার কপালে!

বিকালে ঘুম ভাঙিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আগের বারের সাজা তামাক টানার সুখটা মনে করিয়া শম্ভু বলিল, দাও না, এক ছিলুম তামাক সেজে দাও না।

সরলা বলিল, তুমি সেজে নাও।

শম্ভু গভীর উদারতা বোধ করিতেছিল, জেলখানার কয়েদী যেন নিজের বাড়ীতে তিন পুরুষের পুরান পালঙ্কে প্রথম ঘুম দিয়া উঠিয়াছে।

নিজেই তামাক সাজিয়া সে গিয়া দোকান খুলিল, কাঠের ছোট চৌকীটাতে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। পাড়ার দুঃখী মেয়েটি আসিয়া বাসন মাজিয়া রান্নাঘর লেপিয়া জল তুলিয়া দিয়া গেল। ও-বাড়ীর দুপুরের স্তব্ধতা ধীরে ধীরে ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। বেলা পড়িয়া গেল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সরলা গা ধুইল না, রান্নার আয়োজন করিল না, খানিকক্ষণ ছটফট্ করিতে লাগিল অন্দরে আর খানিকক্ষণ ফাঁকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল দোকানে তাকের আড়ালে। সন্ধ্যাব পর দীননাথ কাজ হইতে ফিরিয়া বাড়ী ঢোকার আগে আসিল শম্ভুব দোকানে। উপস্থিত খদ্দেরটি চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিল, টাকা পেয়েছিস ?

—হাঁ, বাড়ী যান আমি যাচ্ছি।

—এখানেই বসি না, ব'সে কথাবার্ত্তা কই ?

—না, না, এখানে নয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি সব শোনে।

দীননাথ এ-বগলের নথিপত্র ও-বগলে চালান করিয়া বলিল, বাড়ীতে ছেলেপিলেগুলো বড্ড জ্বালায়। বৌমা এলে মলের আওয়াজে—?

সরলার মল যে সব সময় বাজে না এ-কথা বুঝাইয়া বলিতে সে যে কেমন লোকের মেয়ে এ-বিষয়ে একটা মন্তব্য করিয়া দীননাথ বাড়ী গেল। খানিক পরে দোকান বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শম্ভু গেল অন্দরে। ত্রিকোণ উঠানের এক কোণে এক বছর আগে সরলার স্বহস্তে রোপিত তুলসী গাছটার তলায় শুধু একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে নিবু-নিবু অবস্থায়, আর কোথাও আলো নাই। বেড়া ডিঙাইয়া ও-বাড়ীর আলো খানিকটা শোবার ঘরের চালে আসিয়া পড়িয়াছে! ঘরে গিয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া সরলা যে খাটে শুইয়া আছে শম্ভু তাহাও দেখিয়া লইল, একটা বিড়িও ধরাইয়া লইল। তারপর সরলাকে একবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেল ও-বাড়ীতে।

তখন উঠিয়া বসিল সরলা। এ বাড়ীতে এক বছর রাণীর মত যে মল বাজাইয়া সে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে আজ প্রথম সেই মলগুলি খুলিয়া ফেলিল। এমন হাল্কা মনে হইতে লাগিল পা দুটিকে সরলার! লঘুপদে সে নামিয়া গেল উঠানে। বেড়ায় ফুটায় চোখ দিয়া বুঝিতে পারিল ও-বাড়ীর একমাত্র কালি-পড়া লণ্ঠনটি জ্বলিতেছে বড় ঘরে এবং ও-ঘরেই আসর বসিয়াছে তিন ভাই-এর, দরজার কাছে বসিয়া আছে কালী আর ভিতরে তার শাশুড়ীর শরীরটা রহিয়াছে আড়ালে, শুধু দেখা যাইতেছে মালা-জপ-রত হাত। রান্নার চালাটার পিছন দিয়া ঘুরিয়াই বেড়ার ওপাশে ও-বাড়ীর ওঠানের একটা প্রান্ত পাওয়া যায়। সরলা সেদিকে গেল না, একেবারে নামিয়া গেল ও-বাড়ীর রান্নাঘর ও তার লাগাও ঢেঁকির ঘরের পিছনে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে। কি অন্ধকার চারি দিক। ভয়ে সরলার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। ছিটাল পার হওয়ার সময়ে পায়ে একটা মাছের কাঁটা ফুটিল। কিন্তু কি করিবে সরলা? ভয় করা আর মাছের কাঁটা ফোটাকে গ্রাহ্য করিলে তার চলিবে কেন? একা মেয়েমানুষ সে, এতগুলি লোক তার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র জুড়িয়াছে, রচনা করিতেছে ফাঁদ। কিসের ভয় এখন, কিসের কাঁটা ফোঁটা! আর যা হয় হোক, অন্ধকারে এভাবে বনে জঙ্গলে আর ছিটালে হাঁটার জন্য কিছু যেন তার নাগাল না পায়, পেটের ছেলেটা এবারও যেন তার মরিয়া না যায় জন্ম নেওয়ার আগেই। এলোচুলে সে ঘরের বাহির হয় নাই, একটি চুল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাঁ-হাতের কড়ে-আঙুলের নখে কামড় দিয়া তবে উঠানে নামিয়াছে, এই যা ভরসা সরলার।

বড়ঘরের পিছনে কয়েকটা কলাগাছ আছে ঘরের দুটো জানালাও আছে এদিকে। উঁচু ভিটার ঘর, জানালাগুলিও বেড়ার

অনেক উঁচুতে। এত কষ্টে এখানে আসিয়া জানালার নাগাল না পাইয়া সরলার কান্না আসিতে লাগিল। তবে জানালার পাশে পাতা চৌকীতেই বোধ হয় তিন ভাই বসিয়াছে, ওদের কথাগুলি বেশ শোনা যায়, শুধু বোঝা যায় না পুঁটি কালী শাশুড়ী ওদের মন্তব্য। কান্না এবং ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া সরলা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

শম্ভুর গলা: কবার ত বললাম, এই সোজা হিসেবটা তোর মাথায় ঢোকে না বস্থি? আমার দোকানে যা মণিহারী জিনিষ আছে তার দাম একশ'র বেশীই হবে, ধরলাম একশ। মাল না কেনার জন্যে হাতে জমেছে একশ দু-পাঁচ টাকা,—ধরলাম একশ। আর শ্বশুর-মশায় দিয়েছে তিনশ। এই হ'ল পাঁচশ, আমার ভাগ। তুই আর দাদা পাঁচশ ক'রে দিলে হবে দেড় হাজার। হাজার টাকায় দোকান হবে; হাতে থাকবে পাঁচশ।

হাসি চাপিতে ক্ষেন্তির মুখের কাপড় গোঁজার আওয়াজ। দীননাথের গলা: বৌমা! বেহায়াপনা ক'রো না বৌমা।

—কি জানিস শম্ভু, বড় বৌয়ের সব গয়না বেচে আর কুড়িয়ে জড়িয়ে আমি না-হয় পাঁচশ দিলাম, বস্থি অত টাকা কোথা পাবে? ছোট বৌমার গয়না বেচলে ত অত টাকা হবে না।

বৈদ্যনাথের গলা: শ-তিনেক হয় ত ঢের। তবে আমার বিয়ের আংটি বেচলে—

শম্ভুর গলা: থাম বাপু তুই, সব সময় খালি ফাজলামি তোর।

দীননাথের গলা: যেমন স্বভাব হয়েছে তোর তেমনি স্বভাব হয়েছে ছোটবৌমার।

শম্ভুর গলা: যাক্, যাক্। কাজের কথা হোক। বঙ্কি তবে আড়াইশ দিক, লাভের আমরা যা ভাগ পাব ও পাবে তার অদ্দেক। ভাগাভাগির কথা বলছি এই জন্যে, আগে থেকে এসব কথা ঠিক ক'রে না রাখলে 'পরে আবার হয়ত গোল বাধবে। যে যত দেবে তার তত ভাগ, বাস্, সোজা কথা ; সব গণ্ডগোল মিটে গেল।

একটু স্তব্ধতা। তার পর দীননাথের গলা: তবে আমিও একটা পষ্ট কথা বলি তোকে শম্ভু। তুই যে পাঁচ-শ টাকা দিবি—

শম্ভুর গলা: পাঁচশ নগদ নয়, একশ টাকার জিনিষ, চারশ নগদ।

দীননাথের গলা: বেশ। চারশই আমাদের একবার তুই দেখা। গয়নাগাঁটি বেচে ফেলবার পর শেষে যে তুই বলবি—

শম্ভুর গলা (ক্রুদ্ধ): আমাকে বুঝি বিশ্বাস হয় না আপনার? ভাবছেন আমি ভাঁওতা দিয়ে—

চার-পাঁচটি গলার প্রতিবাদ। শম্ভুর গলা (আরও ক্রুদ্ধ): সকলকে সমান সমান ভাগ দিতে চাচ্ছি কিনা তাই আমাকে অবিশ্বাস! আমি যেন একা গিয়ে দোকান করতে পারি না! পাঁচশ টাকা নিয়ে যদি দোকান খুলি আমি, এক বছরে হাজার টাকা লাভ করব, না আসতে চাও তোমরা না-ই আসবে! চাই না তোমাদের টাকা।

কোলাহল, কলহ, কড়া কথা, মধ্যস্থের গোলমাল থামানোর চেষ্টা। খানিকক্ষণ বাজে ব্যক্তিগত কথা। আবার ঝগড়া বাধিবার উপক্রম।

তারপর শম্ভুর গলা: বেশ, কাল সকালে টাকা দেখাব।

দীননাথের গলা: গজেন স্যাক্‌রার সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি. সাড়ে উনত্রিশ দর দেবে বলেছে। কাল কাজে না গিয়ে গয়না গুলোর ব্যবস্থা করব। যা লোকসানটাই হবে! এমনি সোনা হয় আলাদা কথা, তৈরি গয়না বেচার মত মহাপাপ আর নাই। বৌমা

বুঝি রাঁধেনি আজ? এখানেই তবে তুই খেয়ে যা শম্ভু। ও পুঁটি, ঠাঁই ক'রে দে ত আমাদের।

বাক্সে টাকাগুলি রাখিয়াছিল শম্ভু কোথায় যে গেল সে টাকা! টাকার শোকে এবং ও-বাড়ীর সকলের কাছে লজ্জায় শম্ভু পাগলের মত চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

সরলা সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, কি আর করবে বল? অদেষ্টের ওপর ত হাত নেই মানুষের! আমি ঘুমোচ্ছি, ঘরের দরজা খোলা, আর তুমি ও-বাড়ীতে গিয়ে ব'সে রইলে রাত দশটা পর্য্যন্ত! আর ওই ত বাস্কো! শাবলের এক চাড়েই হয় ত ভেঙে গেছে। আমারই বা কি ঘুম, একবার টের পেলাম না!

দু চোখে সন্দেহ ভরিয়া চাহিয়া শম্ভু বলিল, টের পেয়েছ কি না পেয়েছ—

সরলা তাড়াতাড়ি বলিল, এমন ক'রো না লক্ষ্মী। যেমন দোকান করছিলে তেমনি কর এখন, বাবাকে ব'লে আর কিছু টাকা—

—আর কি টাকা দেবে তোমার বাবা!

—সহজে কি দেবে? আমি কাঁদাকাটা করলে—

ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া গিয়া সরলা স্বামীকে এক বাটি মুড়ি ও খানিকটা গুড় আনিয়া দিল। সস্নেহে বলিল, খাও। না খেলে কি টাকা ফিরে পাবে? বাবা টাকা যদি না-ই দেয়,—দেবে ঠিক, যদির কথা বলছি—আমি গয়না বেচে তোমায় টাকা দেব।

কেরানীর বৌ

সরসীর মুখখানি তেমন সুশ্রী নয়! বোঁচা নাক, ঢেউ তোলা কপাল, ছোট ছোট কটা চোখ। গায়ের রং তার খুবই ফর্সা, কিন্তু কেমন যেন পালিশ নাই। দেখিলে ভিজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা মনে পড়িয়া যায়।

সরসীর গড়ন কিন্তু চমৎকার। বাঙ্গালী গৃহস্থ সংসারের মেয়ে, ডাল আর কুমড়ার ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইয়া যারা বড় হয়, একটা বিশেষ বয়সে মাত্র তাদের একটুখানি যৌবনের সঞ্চার হইয়া থাকে, বাকী সময় সবটাই অসামঞ্জস্য। সে হিসাবে সরসী বাস্তবিকই অসাধারণ। তার শরীরের মত শরীর সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কবিকে সে অনায়াসে মুগ্ধ করিতে পারে। একটু নীচুদরের ব্রহ্মচারীর মনে ঘোমটা খুলিয়া তার মুখখানি দেখিবার সাধ জাগা আশ্চর্য্য নয়।

ঘটনাটা নিছক মাতৃমূলক। সরসীর মার অনেক বয়স হইয়াছে, চল্লিশের কম নয়; কিন্তু এখনো তার শরীরের বাঁধুনি দেখিলে আপনার বিস্ময় বোধ হয় এবং তিনি লজ্জা পান।

তেরবছর বয়সে সরসী টের পায় যে অহঙ্কার করার মত গায়ের রঙ্ তো তার আছেই, কিন্তু আসল রূপ তার গায়ের রঙে নয়, অস্থিমাংসের বিন্যাসে। টের পাইবার পর সরসীর কাপড় পরার ভঙ্গি দেখিয়া সকলে অবাক্!

ও কি লো? ও আবার কি ঢং?

ঢং আবার কোথায় দেখলে?

ওকি কাপড় পরার ছিরি তোর? সং সেজেছিস কেন?

বেশ করেছি। তোমার কি?

মুখে আগুন মেয়ের!...যাসনে, সং সেজে ঢং করে পাড়া বেড়াতে. তুই যাসনে সরি! মেরে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব।

পাড়া বেড়ানোর সথ সরসীর আপনা হইতেই গেল।

একদিন বাড়ী ফিরিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া তার কি কান্না!

কি হয়েছে লো?

সরসী বলিতে পারে না। অনেক চেষ্টায় একটু আভাস দিল। বাকীটুকু মা জেরা করিয়া জানিয়া নিলেন।

জানিয়া মাথায় যেন তার বাজ পড়িল। একি সর্ব্বনাশ!

রাগের মাথায় মেয়ের পিঠেই গুম্ গুম্ করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিলেন। বলিলেন, সেইকালে বারণ করেছিলাম সারা দুপুর টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াস্‌নে সরি, বেড়াস্‌নে। হল ত এবার? মুখে চুনকালি না দিয়ে ছাড়বি, তুই কি সেই মেয়ে!

সরসী খুব কাঁদিল। রাত্রে ভাত খাইল না। দারুণ অভিমানে ভাবিতে লাগিল, মা আমাকেই মারল কেন? আমার কি দোষ?

সংসারের অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, কিন্তু এ ব্যাপারটা তার কাছে চূড়ান্ত রকমের রূঢ় ঠেকিল। তার কোনই অপরাধ

নাই; সুবলদা'র মতলব বুঝিতে পারা মাত্র তার হাতে কামড়াইয়া দিয়া পলাইয়া আসিয়াছে সে এত ভাল মেয়ে। তবু তাকেই মার খাইতে হইল! সকলের ভাব দেখিয়া বোঝা গেল সেই একটা অপকর্ম্ম করিয়াছে, দোষ আগাগোড়া তারই!

সুবলের কি শাস্তি হয় দেখিবার জন্য সরসী ব্যগ্র হইয়া রহিল, কিন্তু সুবলের কিছুই হইল না। সুবলের বাবাকে ব্যাপারটা জানাইয়া দিবার পরামর্শ পর্য্যন্ত মার যুক্তি তর্কে বাতিল হইয়া গেল। সরসীর প্রতিই শাসনের অবধি রহিল না। আপন-জন যে বাড়ী আসিল সকলের কাছে একবার করিয়া ব্যাপারটার ইতিহাস বলিয়া লতাকে জ্বা দেওয়া হইতে লাগিল। এ বাড়ীতে দুজনকে চুপি চুপি কথা বলিতে দেখিলেই সরসী বুঝিতে পারে, তার কথাই আলোচিত হইতেছে। নিদারুণ কড়াকড়ির মধ্যে পড়িয়া কয়েক দিনের মধ্যেই সরসী হাঁপাইয়া উঠিল।

সময়ে শাসনও একটু শিথিল হইল, সরসীরও সহ্য হইয়া গেল, কিন্তু মনে মনে সে এমন ভীরু হইয়া পড়িল বলিবার নয়।

ছেলেবেলা হইতে চেনা ছেলেরা বাড়ীতে আসিলে একা তাদের সঙ্গে কথা বলিতে সরসীর ভয় করিতে লাগিল। লোকে দোষ দিবে, ভাবিবে, কি জানি মনে ওর কি আছে! একা পাশের বাড়ী যাওয়ার সাহস পর্য্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিল। দুপুর বেলা সে মার কাছে শুইয়া থাকে, ঘুম আসে না, অন্য ঘরে গিয়া একটু একা থাকিতে ইচ্ছা করে, তবু সে শুইয়া থাকে। কোথায় গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি বলে যে বাড়ীতেই ছিল, পাশের ঘরে ছিল, কোথাও যায় নাই, মা হয়ত সে কথা বিশ্বাস করিবে না।

সংসারের আর সমস্ত মেয়ের মত সে নয়, কুমারী-ধর্ম্ম বজায় রাখার জন্য তার ওদের মত যথেষ্ট ও প্রাণপণ চেষ্টা নাই; সকলের মনে এমনি

একটা ধারণা জন্মিয়াছে জানিয়া সরসী দিবারাত্রি সজ্ঞানে নিজের চলা-ফেরা নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

সকলের চুরি চুরি খেলার মধ্যে চুরি না করিয়াও বেচারী হইয়া রহিল চোর।

উপদেশ শুনিল: মেয়েমানুষের জীবনে আর কাজ কি মা? চাদ্দিকে পুরুষ গুণ্ডা হাঁ করে আছে, পা পিছলে না ওদের খপ্পরে পড়তে হয়,—বাস্ এইটুকু সামলে চলা।

ছড়া শুনিল: পুড়ল মেয়ে উড়ল ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই!

শুনিয়া শুনিয়া সরসীর ভয় বাড়িয়া গেল। সংসারের নারী-সংক্রান্ত নিয়মগুলি এখন সে মোটামুটি বুঝিতে পারে। ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে খারাপ হওয়াটাই প্রত্যেক মেয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; মেয়েদের খারাপ না হওয়াটাই আশ্চর্য্য। এই আশ্চর্য্য কাজটা করাই নারী জীবনের একমাত্র তপস্যা।

সাবধানা হইতে হইতে সরসী ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানী হইয়া গেল। ভাল হইয়া থাকাটা তার কাছে আর ব্যক্তিগত ভালমন্দ বিবেচনার অন্তর্গত হইয়া রহিল না। সকলে চায় শুধু এইজন্যই নারীধর্ম্ম পালন করিয়া যাওয়ার জন্য নিজেকে যে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া নিল।

তারপর, ষোলবৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার কয়েক মাস আগে রাসবিহারীর সঙ্গে সরসীর বিবাহ হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য, রাসবিহারী কেরাণী।

বলা বাহুল্য এই জন্য যে সরসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে, বরাবর গাঁয়ে থাকার জন্য খানিকটা গেঁযো আর কথামালা পড়া বিদ্যায় লুকাইয়া নভেল পড়ার জন্য একটু সহুরে, অসামান্য অঙ্গ-সৌষ্ঠবের জন্য

তার শুধু স্বাস্থ্য ভাল এবং গায়ের রঙের জন্য সে একটু মূল্যবতী। কেরাণী ছাড়া এসব মেয়ের বর হয় না। রাসবিহারীর মাহিনা যে এখন এক'শ'র কাছে এবং একদিন দু'শ'র কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে, সে শুধু সরসীর ওই রঙটুকুর কল্যাণে।

রাসবিহারীর সাইজ মাঝারি, চেহারা মাঝারি, বিদ্যা মাঝারি, বুদ্ধি মাঝারি। যাকে বলে মধ্যবর্ত্তী, তাই। সরসীকেও সে মাঝারি নিয়মে ভালবাসিল, কখনো মাথায় তুলিল, কখনো বুকে নিল, কখনো পায়ের নীচে চাপিয়া রাখিল। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে রাগের মাথায় দুই একবার চড় চাপড়টা দিতে যেমন কসুর করিল না, ন'ভরি সোনার একছড়া হার এবং মধ্যে মধ্যে ভাল কাপড়ও তেমনি কিনিয়া দিল।

রাসবিহারী আর তার দাদা বনবিহারী এক বাড়ীতেই বাস করিতেছিল। মাসের পয়লা তারিখে রাসবিহারী বরাবর মাহিনার তিনের চারি অংশ দাদার হাতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে, বিবাহের বৎসর দুই পরে সেটা কমাইয়া কমাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া আনায় বনবিহারী তাকে পৃথক করিয়া দিল।

পটলডাঙ্গায় একটা বাড়ীর দোতলায় একখানা শয়নঘর, একটি রান্নাঘর ও খানিকটা বারান্দা ভাড়া নিয়া রাসবিহারী উঠিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিল!

সরসীকে বলিল, স সাব চালাতে পারবে তো?

সরসী বলিল, ওমা! তা আর পারব না?

বলিয়া বিবাহের পর এই প্রথম হাসিমুখে নাচিয়া দুইহাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্বামীকে চুম্বন করিল।

স্বাধীনতার, বেশী নয়, অল্প একটু স্বাধীনতার লোভে সরসীর খুসীর সীমা ছিল না। স্বামী তো তাহার আপিস যাইবে? সে বাড়ীতে

থাকিবে,—একা! একেবারে একা! চাকরের চোখের সামনে কলতলায় স্নান করিলে কেহ তাকে গাল দিবে না, দুইবেলা পাশের বাড়ী গেলে কেহ জানিবে না, খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিলে আর রাস্তার অজানা, অচেনা, ভয়ঙ্কর ও রহস্যময় লোকদের নিজেকে দেখাইলে কেহ কিছু মনে করিতে আসিবে না।

বনবিহারীর স্ত্রী চারটি সন্তান প্রসব করিয়া আর অজস্র পানদোক্তা খাইয়া শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, রাসবিহারীদের যাওয়ার দিন সে স্বামীকে বলিল, যাই বল বাবু, বাঁচলাম।

এবং একসময় রাসবিহারীকে একান্তে ডাকিয়া নিয়া বলিল :

তোমার ভালর জন্যই বলা।

রাসবিহারী কৌতূহল প্রকাশ করিলে এদিক-ওদিক চাহিয়া নীচু গলায় :

বৌকে একটু সামলে চলো।

কেন?

কেমন যেন বাড়াবাড়ি। সেদিন রাখাল এসেছিল জানো, নীচে আমি খাবার-দাবার করছিলাম ও ছোট বৌ, বাড়ীতে একটা লোক এসেছে, দু'টো কথাবার্তা বলবে না, একা একা চুপ করে বসে থাকবে? তা ছোটবৌ—কি জবাব দিলে শুনবে? বললে, 'পারব না দিদি, আমার লজ্জা করছে!' আমার ভাইএর,—বয়েস এখনো ওর আঠারো পোরেনি, ভগবান সাক্ষী—আমার ভাইএর কাছে ওর লজ্জা কি বলত?

রাসবিহারী বলিল, কি জানি।

অথচ আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার কামাই নেই। কি তাকানি, যেন গিলে খাবে।

রাসবিহারী বলিল, তা তোমার ভাইকে দেখলে দোষ কি?

বনবিহারীর স্ত্রী একটু হাসিল। অনেক পানদোক্তা খাওয়ার জন্য মুখের হাসি পর্যন্ত তার ঝাঁঝালো।

বলিল, তারপর শোন। এদিকে ছাতে কাপড়টি মেলে দিয়ে আসতে বললে যাব না, বলে চাদ্দিক থেকে তাকায় দিদি, আমি যাবনা। আমি যাব সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে, ছাতে, আর ছেলেমানুষ, না যায় না যাক, পাড়ার লোক গুলোও তো পোড়ারমুখো নয় কম। ওমা, এদিকে দুপুরবেলা চোখ বুজিছি কি বুজিনি, অমনি তুড়ুক করে ছাতে গিয়ে হাজির।

বাসবিহারী বলিল, ছাতে গিয়ে কি করে?

—কে জানে বাবু কি করে। কে খোঁজ নিতে যায়? একদিন মাত্র দেখেছি, মাথার কাপড় ফেলে, চুল এলো করে মহারাণী ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

—চুল শুকোচ্ছিলো হয়ত।

—হবে। কিন্তু দুবেলা যাবার দরকার! যখনি বলো সরমের কাহিনী গাইবার দরকার।

সরসীর কৌতূহল প্রচণ্ড। বাড়ীর কোথাও গোপনে কিছু ঘটিবার জো নাই। রাতে বনবিহারী কখনো একটু টানে, বড়বৌ তাকে কি বলে না বলে, কি না কি, মধ্যে মধ্যে তাদের বচসা হয়, এসব খবরও সরসী অনেক রাখে। আড়ালে দাঁড়াইয়া বড়-বৌ এর কথাগুলি শুনিতে সে বাকী রাখিল না। তখনকার মত সরসী চুপ করিয়া রহিল। বড়বৌ চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলে বিনা আপত্তিতে চুল বাঁধিল, সিঁদুর পরানোর পর যথা-নিয়মে তাকে প্রণামও করিল। জিনিষ-পত্র অধিকাংশই সকালে সরানো হইয়াছিল, বিকেলে গাড়ী ডাকিয়া বাকী জিনিষ উঠাইয়া বাসবিহারী যখন শেষবারের মত নীচে গিয়া তার জন্য অপেক্ষা করিতেছে,

তখন মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর করিয়া সরসী বড়-বৌকে বলিল, সকালবেলা ওঁকে কি বলেছিলে দিদি ?

কাকে ? ঠাকুরপোকে ? কই, কিছু বলিনি তো !

তোমার মুখে কুঠ্ হবে।

কি বললি ?

বললাম তোমার মুখে কুঠ্ হবে। কুঠ্ কাকে বলে জান না? কুষ্ঠব্যাধি।

কার মুখে কুঠ্ হবে ভগবান দেখছেন। আমি তোর গুরুজন, আমাকে তুই—

আ মরি মরি, কি গুরুজন। মুখে আগুন তোমার মত গুরুজনের ! বানিয়ে বানিয়ে কথা শুনিয়ে স্বামীর মন ভারি করে দিতে একটু বাধে না, তুমি আবার গুরুজন কিসের ? পাবে পাবে, এর ফল তুমি পাবে। যে মুখে আমার নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছ সে মুখে যদি পোকা না পড়ে তো চন্দ্রসূর্য্য আর উঠবে না। দিদি, ভগবানের সৃষ্টি লোপ পেয়ে যাবে। আমি যদি সতী হই তো—ভাবাবেগে সরসী কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু বলিতে ছাড়িল না,—আমি যদি সতী হই তো আমার যতটুকু অনিষ্ট তুমি করলে ভগবান তোমাকে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবেন। অঙ্গ তোমার খসে খসে পড়বে দিদি, পচে যাবে, গলে যাবে—ভাসুরঠাকুর দূর দূর করে তোমাকে বাড়ী থেকে দেবেন খেদিয়ে !

সরসী যে এমন করিয়া বলিতে জানে বড়বৌ-এর তা জানা ছিল না। হেলে সাপকে কেউটের মত ফোঁস ফোঁস করিতে দেখিয়া সে এমন অবাক হইয়া গেল যে ভালমত একটা জবাবও দিতে পারিল না। চোখ মুছিয়া গাড়ী চাপিয়া সরসী বিজয়-গর্ব্বে চলিয়া গেল। মুখ দিয়া উপরোক্ত কথাগুলি স্রোতের মত অবাধে বাহির করিয়া

দিতে পারিয়া নিজেকে তার খুব উচ্চশ্রেণীর আদর্শ স্ত্রী বলিয়া মনে হইতেছিল।

নূতন বাড়ীতে আসিয়া সরসী সংসার গুছাইয়া বসিল। শোবার ঘরখানা রাস্তার ঠিক উপরে। রাস্তার ওপাশে সামনের বাড়ী হইতে ঘরের ভিতরটা সব দেখা যায়। জানালার আগাগোড়া সরসী পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দিল। রাসবিহারীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—পর্দ্দা সরিয়ো না বাবু, ও বাড়ী থেকে দেখা যায়। ঘরটা একটু অন্ধকার হল,—কি করব!

রাসবিহারী ভাবিল, বড়বৌ-এর কথাটা মিথ্যা নয়। সরসীর একটু বাড়াবাড়ি আছে।

কাল তারা হোটেলের ভাত আনিয়া খাইয়াছিল। ঘরগুছানো ও জানালার পর্দ্দা-টাঙ্গানোর হিড়িকে এবেলাও সরসী রাঁধিতে পারে নাই। রাসবিহারীর আপিসের বেলা হইলে সরসী বলিল, হোটেলে খেয়ে তুমি আপিস চলে যাও, আমি এক ফাঁকে দু'টি ভাতে ভাত ফুটিয়ে নেব।

রাসবিহারী মনে মনে বিরক্ত হইয়া জামা গায়ে দিল। ঘরের দেয়ালে একটু ফুটা থাকার আশঙ্কার কাছে স্বামীর খাওয়া চুলোয় যায়, সব সময় এ গভীর ভালবাসা হজম করা শক্ত।

তবু, বাহিরে যাওয়ার আগে রাসবিহারী বলিয়া গেল, ছাতে উঠো না।

সরসী বলিল, না।

বলিয়া তৎক্ষণাৎ আবার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কাপড় শুকোতে দেব কোথায়?

দিও, ছাতেই দিও। দিয়ে চট্ করে নেমে আসবে।

আচ্ছা।

এসব অপমান সরসীর গায়ে লাগে না। অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। খোলা ছাদের চারিদিকে প্রলোভন, চারিদিকে বিস্ময়, চারিদিকে রহস্য। স্বামী তো বারণ করিবেই। কিছু মন্দ ভাবিয়া নয়, তার মঙ্গলের জন্যই বারণ করা।

রাসবিহারী বাহির হইয়া যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে সরসী ছাদে উঠিল। ভাবিল, একমিনিট, একমিনিট শুধু চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আসব।

কিন্তু একমিনিটে চোখ বুলান যায়না।

ইটের স্তুপ জড়ো করিয়া মানুষ এই সহর গড়িয়াছে, চারিদিকে সীমাহীন সংখ্যাহীন মানুষের আস্তানা, কোনদিকে শেষ নাই, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই, নীড়ে নীড়ে একটা বিস্ময়কর জমজমাট আলিঙ্গন, ছাদে ছাদে আলিসায় কার্ণিসে একটা অবিশ্রান্ত মিলন। এই বিপুলতার বিস্ময় অনুভব করিতেই সরসীর আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, কোন একটি বিশেষ বাড়ীকে বিশেষ ভাবে দেখিবার অবসর এই সময়ের মধ্যে সে পাইল না,—এতো তার চেনা সহর, সে বাড়ীর ছাদ হইতে সকলকে লুকাইয়া,—না সকলকে লুকাইয়া নয়, অত সাবধানতা সত্ত্বেও বড় বৌ টের পাইয়াছিল,—এই সহরকেই সে দেখিয়াছে, কিন্তু নতুন বাড়ীর নতুন ছাদে মাথার কাপড় পায়ের নীচে শুকনো শ্যাওলায় লটাইয়া মলিন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্ভুল নিশ্চিন্ত পর্য্যবেক্ষণের সবটুকুই আজ অভিনব।

মাথার উপরে সূর্য্য আগুন ঢালিতেছে, ছাদের কোথায় এক টুকরা ভাঙ্গা কাঁচ পড়িয়াছিল সরসীর পা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, কোমরে কোনমতে কাপড় আঁটা আছে কিন্তু দেহের উর্দ্ধাংশ একেবারে অনাবৃত, সেরসীর খেয়াল নাই। আকাশে একটা চিলের সকাতর চীৎকারে সরসী শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ে আজ তার আনন্দের উত্তেজনার বাণ ডাকিয়াছে,

সে উন্মাদিনী। তার বহুদিনের দেয়াল-চাপা দুর্ব্বল প্রাণে খোলা ছাদের এই সকরুণ দুঃসাহস, মানুষকে ভয় না করার এই প্রথম সংক্ষিপ্ত উপলব্ধি বুকের চামড়ায় পিঠের চামড়ায় পৃথিবীর গরম বাতাস আর আকাশের রূঢ় রৌদ্র লাগানোর উগ্র ব্যাকুল উল্লাস তার সহ্য হইতেছে না। তার ইচ্ছা হইতেছে, অর্দ্ধাঙ্গের কার্পাস তুলার বাঁধনটা টানিয়া খুলিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, দিয়া পাগলের মত সমস্ত ছাদে খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করে।

আর চেঁচায়। গলা ফাটাইয়া প্রাণপণে চেঁচায়! সে যে ঘরের বৌ, সে যে বোবা অসহায় ভীরু স্ত্রীলোক সব ভুলিয়া বুকে যত শব্দ সঞ্চিত হইয়া আছে সমস্ত বাহিরে ছড়াইয়া দেয়। অথবা আলিসা ডিঙ্গাইয়া নীচে লাফাইয়া পড়ে।

হ্যাঁ, শূন্যে পড়িবার সময়টুকু উন্মত্ত উল্লাসে হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে প্রকাশ্য রাস্তার ধারে ওই শক্ত রোয়াকটীতে আছড়াইয়া পড়িলে ভাল হয়। মাথাটা গুঁড়া হইয়া যাইবে কিন্তু শরীরে তার কিছু হইবে না। তার এই কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙে স্থানে স্থানে রক্ত লাগিবে রাস্তার লোক ভিড় করিয়া তার অপরূপ দেহের অপূর্ব্ব অপমৃত্যু চাহিয়া দেখিবে।

কোথায় লজ্জা, কোথায় সঙ্কোচ! কে জানিবে এই দেহের মধ্যে যে বাস করিতেছিল নিজেকে লুকাইয়া লুকাইয়া সে দিন কাটাইয়াছে, আঠারো বছরের বালকের ভয়ে অবশ হইয়া গিয়াছে, স্বামী ভিন্ন জগতের আর একটি পুরুষের দিকে চোখ তুলিয়াও চাহিতে সাহস পায় নাই? কে অনুমান করিতে পারিবে সকলের সামনে আত্মোন্মোচনের তার আর দ্বিতীয় পথ ছিল না বলিয়া, আঘাতের ভয়, অপমৃত্যুর ভয়ের চেয়ে সকলের সামনে মরিবার ভয় প্রবলতর ছিল বলিয়া, সে একাজ করিতে

পারিয়াছে? নিজের অনন্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে এ শুধু তার একটা তীব্র প্রতিবাদ, আপনার প্রতি তাব এই শেষ প্রতিশোধ।

স্বামীর সাহায্য ছাড়া, সমাজের চাবুকের সাহায্য ছাড়া কোনমতেই সে খাঁটি থাকিতে পারিত না, নিজেকে এমনি একটা কদর্য্য জীব বলিয়া চিনিয়াছিল তাই সে নিজেকে এমন ভয়ানক মার মারিয়াছে, একথাটাও কি কারো একবার মনে হইবে না?

দুইহাত শক্ত করিয়া মুঠা করিয়া সরসী এখন আপন মনে বিড়বিড় করিতেছে, তার মুখের দুই কোণে সূক্ষ্ম ফেনা দেখা দিয়াছে। হঠাৎ এক সময় হাঁটু ভাঙ্গিয়া সে ছাদের উপর বসিয়া পড়িল। দুই করতল সজোরে ছাদে ঘষিতে ঘষিতে সে জোরে জোরে বলিতে লাগিল—

বেশ, বেশ, বেশ! আমার খুসী! আমার খুসী আ—মা—র খু—সী!

তারপর শূন্যের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিয়া শূন্যকেই সম্বোধন করিয়া আবার বলিল, হল ত?

তাকে ঘিরিয়া সমস্ত জগৎ কলরব করিতেছে, সমস্ত জগৎ একবাক্যে তাকে ছি ছি করিতেছে, তার কথা কেহ শুনিবে না, তার কোন মুহূর্ত্তের আত্মজয়ের দাম দিবে না, তাকে ঠাসিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকিয়া তারই কটা চামড়ার স্বেদে তারই যৌবনের উত্তাপে তাকে সিদ্ধ করিবে।

সরসীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। লুটানো আঁচল তুলিয়া নিজেকে সে আবৃত করিয়া নিল। ঘসিয়া ঘসিয়া চোথ শুষ্ক করিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিষ্টিরিয়ার ফিটের পর যেমন সমস্ত জগৎ একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়, মুখে একটা ধাতব স্বাদ লাগিয়া থাকে, সরসী কানের কাছে তার নিজের রক্তের কোলাহল তেমনিভাবে অকস্মাৎ থামিয়া গিয়াছে, জিভে একটা কটু স্বাদ লাগিয়া আছে।

এখন আর তার কোন উত্তেজনা নাই। সে একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তার মনে হইতেছে, এমন একটা কাজ সে করিয়া বসিয়াছে সাধারণ কোন মেয়ে যা করে না। কাজটা তার ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

রাসবিহারীর আদেশ অমান্য করিয়া ছাদে বেড়ানোর জন্য সরসীর কোন আপশোষ নাই, স্বামীর ছোট বড় অনেক আদেশেই অমান্য করিতে হয়, নহিলে টেঁকা অসম্ভব, কিন্তু তারও অতিরিক্ত কিছু সে কি করিয়া বসে নাই? নিজেকে তবে কলুষিত, অপবিত্র মনে হইতেছে কেন?

ভাবিতে ভাবিতে সরসী নীচে নামিয়া গেল। ছাদের নীচেকার ছায়ায় গিয়া দাঁড়ানো মাত্র তার যেন অর্দ্ধেক গ্লানি কাটিয়া গেল। জানালার পর্দ্দা টাঙ্গানোর জন্য ঘরের আলো স্তিমিত হইয়া আছে, বাতাসের মৃদু স্যাঁতসেঁতে ভাব এখনো শুকাইয়া যায় নাই, সরসীর চোখে মুখে আর সর্ব্বাঙ্গে অল্প অল্প স্নিগ্ধতা সিঞ্চিত হইতে লাগিল।

ঘরের অসমাপ্ত কাজগুলি ঠিক যেন তারই প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সরসী চারিদিকে সস্নেহে দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল। কত কাজ তার, কত অফুরন্ত কর্ত্তব্য! তার কি নিশ্বাস ফেলিবার সময় আছে? সংসারে কি হয় আর কি হয় না, তাই নিয়া মাথা ঘামানোর অবসর সে পাইবে কোথায়? স্বামী হোটেলে খাইয়া আপিস গিয়াছে, এবেলার মধ্যে সমস্ত কাজ তার সারিয়া রাখিতে হইবে, ওবেলা দুটি রাঁধিয়া না দিলে চলিবে কেন? হোটেলের ভাতে পেট ভরানোর জন্য সে তো তাকে ভাত কাপড় দিয়া পুষিতেছে না।

সরসী অবিলম্বে কাজে ব্যাপৃত হইয়া গেল। নেড়া আনিয়া দেয়ালে পেরেক ঠুকিয়া কোণাকুনি একটা দড়ি টাঙ্গাইয়া নিল, জড় করা পরণের কাপড়গুলি একটি একটি করিয়া কুঁচাইয়া রাখিল, তাকে খবরের কাগজ বিছাইয়া তেলের শিশি, জুতার বুরুশ, রাসবিহারীর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম

তার নিজের মুখে মাখার পাউডার, পায়ে দেওয়ার আলতা, সীঁথিতে দেওয়ার সিঁদুর সমস্ত টুকিটাকি জিনিষ গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল।

চুল-বাঁধার যন্ত্রপাতিগুলি সাজাইয়া রাখার সময় একটু হাসিয়া ভাবিল, ও ফিরে আসার আগে চুল বাঁধার সময় পাবো তো? খাবারটা করেই চট্ করে একটু সাবান মেখে গা ধুয়ে নিয়ে বেঁধে ফেলব চুলটা,—যে নোংরাই দেখে গ্যাছে!

চুলগুলি মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, দুই হাতে চুলের গোছা ধরিয়া খালি ঘরে একটা অনাবশ্যক অপচয়িত মনোরম ভঙ্গীর সঙ্গে সরসী এলো খোঁপা বাঁধিয়া নিল।

এবার কোন্ কাজটা আগে করিবে?

বাক্সগুলি ও-কোণে রাখা চলিবে না, এদিকে সরাইয়া আনিতে হইবে, জলে কুঁজোটা যেখানে আছে সেইখানে।

জলের কুঁজো! সরসীর দু'চোখ চক্ চক্ করিয়া উঠিল। কি তৃষ্ণাই তার পাইয়াছে!

হাতের কাছে গেলাস ছিল, দেখিতে পাইল না। উবু হইয়া বসিয়া দুইহাতে কুঁজোটা তুলিয়া ধরিয়া সে গলায় জল ঢালিতে লাগিল। খানিক পেটে গেল, বাকীটাতে তার বুকের কাপড় ভিজিয়া গেল।

কী তৃষ্ণাই সরসীর পাইয়াছিল।

সাহিত্যিকের বৌ

সাহিত্যিক ? শেষ পর্য্যন্ত একজন দেশপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সঙ্গেই তার বিবাহ হইবে নাকি ?—এই বিস্ময় বিবাহের আগে কতদিন অমলাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে ; মোটামুটি তিনমাস। কারণ, স্বনামধন্য সাহিত্যিক সূর্য্যকান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হওয়ার মাস তিনেক পরেই শুভ-বিবাহটি সম্পন্ন হইয়াছিল।

ফোর্থক্লাস পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িয়া তারপর বাড়ীতে লেখাপড়া, গান-বাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই, সংসারের কাজকর্ম্ম, ঝগড়া-ঝাঁটির কৌশল ইত্যাদি শিখিতে শিখিতে যে সব মেয়ে আত্মীয়-স্বজনের সতর্ক পাহারা ও অসতর্ক রক্ষণাবেক্ষণে বড় হয়, অমলা তাদের একজন। অতএব বলাই বাহুল্য যে লাইব্রেরী মারফৎ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অমলার ভালরকম পরিচয়ই ছিল। প্রথমে লুকাইয়া আরম্ভ করিয়া তারপর ঘরের কোণ আশ্রয় করার মত বয়স হওয়ার পর হইতে প্রকাশ্যভাবেই সে সপ্তাহে চার পাঁচখানা গল্প উপন্যাসের বই ও মাসে তিনচারখানা মাসিকপত্র নিয়মিত ভাবে পড়িয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে, স্কুল ছাড়িবার পর বাড়ীতে তার পড়াটা দাঁড়াইয়াছে এই এবং লেখাটা দাঁড়াইয়াছে চিঠি লেখা। সূর্য্যকান্তের লেখা পাঁচখানা উপন্যাস, তিনখানা নাটক সে তার সঙ্গে

ভদ্রলোকের বিবাহের প্রস্তাব হওয়ার অনেক আগেই পড়িয়া ফেলিয়াছিল। তখন কি সে জানিত হৃদয়ের ভাবপ্রবণতাগুলিকে পরম উপভোগ্যভাবে উদ্বেলিত করিয়া রাখা, কখনো-কাঁদানো কখনো-হাসানো এই কাহিনীগুলির জন্মদাতা একদিন স্বয়ং তিনটি বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখিতে আসিবে এবং দেখিয়া পছন্দ করিয়া যাইবে!

বড় খাপছাড়া মনে হইয়াছিল ব্যাপারটা অমলার। সাহিত্যিকরা, বিশেষতঃ সূর্য্যকান্তের মত সাহিত্যিকরা কি এরকম রামশ্যামের মত জীবনসঙ্গিনী খুঁজিয়া নেয়? তার মত পদ্দানশীন সাধারণ মেয়েকে (সাধারণ মেয়ে অবশ্য সে নয় কিন্তু একদিন খানিকক্ষণ শুধু চোখে দেখিয়া, কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া, সেলাইএর কাজের একটু নমুনা দেখিয়া, আর একখানা গানের সিকি অংশ শুনিয়া তার কি পরিচয় ওরা পাইয়াছিল শুনি?) পছন্দ করে? এ জগতে পুরুষ ও নারীর প্রেম তো একরকম ওরাই ঘটায় এবং শেষ পর্য্যন্ত মিলন হোক আর বিচ্ছেদ হোক—ওদের ঘটানো প্রেমের অগ্রগতির কাহিনী পড়িতে পড়িতেই তো যতটুকু মন কেমন করা সম্ভব ততটুকু মন কেমন করে মানুষের? কয়েকটি ছোট গল্প ছাড়া সূর্য্যকান্তের কোন লেখাটি সে পড়িতে পারিয়াছিল যার মধ্যে দু'এক জোড়া নরনারীর জটিল সম্পর্ক তাকে দুশ্চিন্তা, আবেগ ও সহানুভূতিতে পরবর্ত্তী বইখানা পড়িতে আরম্ভ করা পর্য্যন্ত অন্যমনা ও চঞ্চলা করিয়া রাখে নাই? সেই সূর্য্যকান্ত একি করিতে চলিয়াছে? একটা শ্বাসরোধী অসাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়া প্রথম পরিচয় এবং কতগুলি জটিল ও বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যস্থতায় প্রেমের জন্ম হইয়া না হোক, অন্ততপক্ষে জানাশোনা মেয়েদের মধ্যে একজনকে খুব সাধারণভাবেই একটু ভালবাসিয়া তারপর তাকে বিবাহ করা তো উচিত ছিল সূর্য্যকান্তের? তার বদলে একটা অজানা অচেনা মেয়েকে সে গ্রহণ করিতেছে কোন যুক্তিতে? জানে এ

অসামঞ্জস্য সে বরদাস্ত করিবে কি করিয়া। ওর বইগুলিতে কত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসিতে পারে নাই, জীবনটা তাদের ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নিজের বেলাও সেরকম কিছু ঘটিতে পারে—এ ভয় সূর্য্যকান্তের নাই?

এসব গভীর সমস্যার কথা ভাবিবার সময় অমলা পাইয়াছিল তিনমাস। তিনমাসে উনিশ বছরের একটি মেয়ে যে কত চিন্তা আর কল্পনায় মনটা ঠাসিয়া ফেলিতে পারে, কত রোমাঞ্চকর রোমান্স অনুভব করিতে পারে, উনিশ বছরের মেয়েরাই তা জানে। একটা কথা অমলা বেশী করিয়া ভাবিত: প্রেম-সংক্রান্ত বিরাট ব্যাপার কিছু একটা যদি সূর্য্যকান্তের জীবনে নাই ঘটিয়া থাকে—ওসব বিষয়ে এমন গভীর ও নিখুঁত জ্ঞান সে পাইল কোথায়, আর ওরকম কিছু ঘটিয়া থাকিলে বিবাহে তার রুচি আসিল কোথা হইতে? কোন সময় অমলার মনে হইত নিজের বুক ভাঙ্গিবার রোমাঞ্চকর অপূর্ব্ব ইতিহাস যদি সূর্য্যকান্ত ভুলিয়া গিয়া থাকে, এত দুর্ব্বল যদি তার হৃদয়ের একনিষ্ঠতা হয় যে ইতিমধ্যে ভাঙ্গা বুকটা আবার লাগিয়া গিয়া থাকে জোড়া, মানুষ হিসাবে লোকটা তবে কি অশ্রদ্ধেয়! ছি ছি, শেষ পর্য্যন্ত এমন একটা স্বামী তার অদৃষ্টে ছিল যে ভালবাসে, কিন্তু ভুলিয়া যায়? আবার অন্য সময় অমলার মনে হইত, সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে হয়তো কখনো ভালবাসার ছাপ পড়ে নাই, আসলে লোকটা খুব জ্ঞানী আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া অন্য লোকের জীবনের ঘটনা ও মানসিক বিপর্য্যয় দেখিয়া শুনিয়া অনুমান ও কল্পনা করিয়া নর-নারীর হৃদয় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলি সে আহরণ করিয়াছে। ভালবাসিলে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী অনিবার্য্য, একথা জানে বলিয়াই বোধ হয় ভাল না বাসিয়া বিবাহ করাটা সে মনে করিয়াছে ভাল? তা যদি হয়, অমলা ভাবিত, তাতেও ওকে তো শ্রদ্ধা সে করিতে পারিবে না। দুঃখ পাইবে বলিয়া যে

ভালবাসে না, সে আবার মানুষ নাকি! একেবারে অপদার্থ জীব! আবার সময় সময় অমলার মনে হইত, নিজের ভালবাসার নির্ম্মম পরিণতির স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছে না বলিয়া অসহ্য মনোবেদনার তাড়নাতেই সূর্য্যকান্ত এই খাপছাড়া কাণ্ডটা করিতেছে! অমলা কি জানে না ওরকম অবস্থায় কতলোকে কত কি অদ্ভুত কাণ্ড করে? কেউ মদ খাইয়া গোল্লায় যায় (সূর্য্যকান্তের 'দিবাস্বপ্ন' 'ঘরের বাহিরে পথ' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), কেউ সন্ন্যাসী হয়, কেউ হাজার হাজার লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া যশ ও টাকা করে (নাম মনে নাই), কেউ আত্মহত্যা করে (মাগো!)। সূর্য্যকান্ত একটা বিবাহ করিবে তা আর বেশী কি? এই কথাগুলি ভাবিবার সময় ভাবী স্বামীর জন্য বড় মমতা হইত অমলার। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে বলিত, আহা, আমি কি ওকে এতটুকু শান্তি দিতে পারব?

যত পরিবর্ত্তনশীল এলোমেলো কল্পনাই মনে আসুক একথা কিন্তু অমলা কখনো ভুলিত না যে সাধারণ উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, চাকুরে, ব্যবসাদার বা ওই ধরণের কারো সঙ্গে তার বিবাহ হইবে না, স্বামী সে পাইবে অসামান্য; দেশ শুদ্ধ লোক যার নাম জানে, দেশ শুদ্ধ লোক যার লেখা পড়িয়া হাসে কাঁদে।

প্রায় ত্রিশ বছর বয়স সূর্য্যকান্তের। ঠিক সুপুরুষ তাকে বলা যায় না, তবে চেহারায় একটা দুর্ব্বোধ্য ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণ আছে। কথাবার্ত্তা চলাফেরায় সে খুব ধীর ও শান্ত—অনেকটা বৃহৎ সংসারের আকণ্ঠ-সংসারী বড়-কর্ত্তাদের মত। কারও সঙ্গে কথা বলিবার সময় সে এমনভাবে নিরপেক্ষ নিরুত্তেজ হাসি হাসে যে মনে হয় আলাপী লোকটির মত অসংখ্য লোকের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে এবং যে কথাগুলি লোকটি বলিতেছে কতবার যে এসব কথা সে শুনিয়াছে তার সংখ্যা হয় না। কেবল মানুষ নয়, এ জগতে কিছুই যেন

সূর্য্যকান্তের কাছে মৌলিক নয়, কিছুই তাকে আশ্চর্য্য করিতে পারে না, পুরাণো জুতার মত হইয়া গিয়াছে—মানুষ, ঘটনা, বস্তু, বাস্তবতা, কল্পনা ও জীবনের খুঁটিনাটি ;—তার অভিজ্ঞতায় এমন বেমালুম খাপ খায় যে ফোস্কা পড়া দূরে থাক অস্পষ্ট একটু মচ্ মচ্ শব্দ পর্য্যন্ত যেন করে না। যা কিছু আছে জীবনে সমস্তের সমালোচনা করিয়া দাম কষা হইয়া গিয়াছে —আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যথা বেদনা আনন্দ উচ্ছ্বাস আবেগ কল্পনা সমস্ত হইয়া আসিয়াছে নিয়ন্ত্রিত : নালিশও নাই, কৃতজ্ঞতাও নাই। বাহুল্যবর্জ্জিত একটা আরাম বোধ করা ছাড়া বাঁচিয়া থাকার আর কোন অর্থ সে যেন খুঁজিয়া পায় না। পাকা সাঁতারুর মত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সে সাঁতার কাটে জীবন সমুদ্রে, প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িয়া ফেনিল আবর্ত্ত সৃষ্টি করে না।

জীবন সমুদ্র? অমলা তো একেবারে থতমত খাইয়া গেল। এ যে গুমোটের দীঘি! একি শান্ত, ঠাণ্ডা মানুষ! ভাব কই, তীব্রতা কই, উচ্ছ্বাস কই? অন্যমনস্কতা, ছেলেমানুষী, খাপছাড়া চালচলন, রহস্যময় প্রকৃতির ছোট বড় অভিব্যক্তি—এসব কোথায় গেল? মানুষের মধ্যে সে যে একজন অত্যাশ্চর্য্য মানুষ—দিনে রাত্রে কখনো একটিবারও এ পরিচয় সে দেয় না। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বরং যতটুকু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, চরিত্রগত মৌলিকতা থাকে, তাও যেন তার নাই। তার অসাধারণত্ব যেন এই যে সাধারণ মানুষের চেয়েও সে সাধারণ। গম্ভীর নয়, বেশী কথাও বলে না। বেশভূষার দিকে বাড়াবাড়ি নজর নাই, অবহেলাও করে না। সুখ সুবিধা যতখানি পাওয়ার কথা না পাইলে কারণ জানিতে চায়, বেশী পাইলে খুসী হয়, অতিরিক্ত উদারতাও দেখায় না। স্বার্থপরের মত ব্যবহারও করে না। ক্ষুধা পাইলে খায়, ঘুম পাইলে ঘুমায়, রাগ হইলে রাগে, হাসি পাইলে হাসে, ব্যথা পাইলে ব্যথিত হয়,—এই কি অমলার

কল্পনার সেই আত্মভোলা রহস্যময় মানুষ? এসবে সাধারণ ব্যাপারে শুধু নয়, বৌএর সঙ্গে পর্য্যন্ত সে হাসে, গল্প করে, বৌকে রাগাইয়া মজা দেখে, বৌকে আদর করে স্নেহ জানায়—একেবারে সহজ স্বাভাবিক ভাবে, আর দশজন বাজে লোকের মত, একটা অপূর্ব্ব ও অসাধারণ সম্পর্ক তাদের মধ্যে যেন সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে না: আঙুলে ঠেকিলে দুজনের যাতে রোমাঞ্চ হয়, চোখে চোখে চাহিয়া মুহূর্ত্তে তারা যাতে আবিষ্কার করিতে পারে পরস্পরের নব নব পরিচয়, যাতে শুধু অফুরন্ত শিহরণ।

গোড়ার একদিনের কথা—যখন পর্য্যন্ত স্বামীর প্রকৃতির এরকম স্পষ্ট পরিচয় অমলা পায় নাই—অমলার মনে গাঁথা হইয়া আছে। বিকালে কোন কাগজের বিপন্ন সম্পাদক জরুরী তাগিদ দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার পর শোবার ঘরে সূর্য্যকান্ত লিখিতে বসিয়াছিল গল্প। বাড়ীতে অনেক লোক: বিবাহ উপলক্ষে আসিয়া অনেক আত্মীয়-স্বজন তখনো ফিরিয়া যায় নাই! কত যে বাধা পড়িতে লাগিল লেখায় বলা যায় না। এ অকারণে ডাকে, সে কি দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করে, ছেলেরা হট্টগোল করে ঘরের সামনে বারান্দায়, রান্নাঘরে ডাল-সম্ভার দিবার সময় হাঁচিতে হাঁচিতে বেদম হইয়া আসে সূর্য্যকান্ত। ঘরে আসিয়া দেখিয়া যাইতে না পারিলেও অমলা টের পাইয়াছিল স্বামী তার লিখিতে বসিয়াছে। ঘরে গিয়া স্বনাম-ধন্য লেখক সূর্য্যকান্তকে প্রথমবার লিখনরত অবস্থায় দেখিবার জন্য মনটা ছটফট করিতেছিল অমলার এবং একথা ভাবিয়া মনটা তার ক্ষোভে ভরিয়া গিয়াছিল যে এই হাঁকাহাঁকি গণ্ডগোলের মধ্যে এক লাইনও সে কি লিখিতে পারিতেছে? বাড়ীর লোকের কি এটুকু কাণ্ডজ্ঞান নাই? তার যদি অধিকার থাকিত, সকলকে ধমকাইয়া সে আর কিছু রাখিত না। সূর্য্যকান্ত লিখিতে বসিলে সমস্ত বাড়ীটা তো হইয়া যাইবে স্তব্ধ—পা টিপিয়া হাঁটিবে সকলে, কথা বলিবে ফিস্ ফিস্ করিয়া, ডালে সম্ভার পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে না। তা নয়,

আজই যেন গোলমাল বাড়িয়া গিয়াছে বাড়ীতে—একি অবিবেচনা সকলের, ছি!

রাত সাড়ে দশটার সময় সে যখন ঘরে গেল, সূর্য্যকান্ত তখনও লিখিতেছে। টেবিলে সাত আটখানা লেখা কাগজ দেখিয়া অমলা অবাক হইয়া গিয়াছিল। অত বাধা ও গোলমালের মধ্যেও সূর্য্যকান্ত তবে লিখিতে পারে? তা ছাড়া, কত সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘরে আসিয়াছে, লিখিতে লিখিতে তবু তো সে তাঁ টের পাইল! এবার সূর্য্যকান্তের বিরুদ্ধেই অমলার মনটা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

বাস্, আজ এই পর্য্যন্ত, বলিয়া কলম রাখিয়া দু'হাত উঁচু করিয়া বিশ্রী ভঙ্গিতে তুলিয়াছিল হাই। তারপর হাসিমুখে কাছে ডাকিয়াছিল অমলাকে। বিষণ্ণমুখে অমলা গিয়া টেবিল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিয়াছিল, আচ্ছা আপনি কি করে লেখেন?

গলার আওয়াজে তার কৌতুহল ছিল এত কম, আর বলার ভঙ্গিতে ছিল এত বেশী অবহেলা—যে মনে হইয়াছিল সে বুঝি জিজ্ঞাসা করিতেছে সূর্য্যকান্তের মত লোক যে লিখিতে পারে এটা সম্ভব হইল কি করিয়া? সূর্য্যকান্ত বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা বলা যায় না, চেয়ার ঘুরাইয়া বসিয়া সে ধরিয়াছিল অমলার একখানা হাত, তারপর তাকেও বসাইয়াছিল নিজের চেয়ারে। সাহিত্যিক বলিয়া অবশ্য নয়, নতুন-বৌ টেবিল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ওরকম একটা প্রশ্ন করিলে প্রথম নিঃশব্দ জবাবটা এভাবে না দিয়া কোন স্বামী পারে? তারপর একটু হাসিয়াছিল সূর্য্যকান্ত, বলিয়াছিল, তুমি যেমন করে লেখো ঠিক তেমনি করে, কাগজের ওপোর কলম দিয়ে। কিন্তু অমলারাণী, আর কতদিন আমায় আপনি বলবে?

অমলা অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিল, বারণ তো করনি আগে।

কেন করিনি জান ? তুমি নিজে থেকে বল কিনা দেখছিলাম। কেন বলনি বল তো ?

লজ্জা করে না বুঝি ? অভিমান হয় না বুঝি ?

যে অধিকার হইতে স্বামী তাকে এক সপ্তাহ বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, অধিকার পাওয়া মাত্র লজ্জাও থাকে নাই অমলার, অভিমানও থাকে নাই। সে ভাবিতেছিল, ঠিক দিয়েছি তো জবাবটা ? এমন অবস্থায় এরকম জবাব তো দিতে হয় ? না, আর কিছু বললে ভাল হত ? আচ্ছা, একথা বলব, তুমি কি বুঝবে তোমাকে তুমি বলতে বলনি বলে কি গভীর ব্যথা লেগেছিল আমার মনে ? মুখের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে! আর কিছু না বলে মুখ নীচু করাই বোধ হয় ভাল এবার।

সূর্য্যকান্ত সত্যসত্যই কয়েক মুহূর্ত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অমলার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, মুখের মৃদু লালিমার মধ্যে সে যেন পরিমাণ করিতে চাহিয়াছিল তার লজ্জা ও অভিমানের। বই লিখিবার সময় যতবড় মনস্তত্ত্ববিদ হোক সূর্য্যকান্ত, অমলাকে সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। স্বামীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি ভাব জমানোর জন্য অমলার ঔৎসুক্য তার কাছে অল্পে অল্পে ধরা পড়িতেছিল বটে, কিন্তু ভাব জমানোটাই যে তার অধীরতার কারণ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নয়—তাও বেশ বোঝা যাইতেছিল। ঠিক ভাবপ্রবণতা যেন নয়, কি যেন অমলা জানিতে ও বুঝিতে চায় তার সম্বন্ধে, সব সময়ে কি যেন একটা বিস্ময়কর কিছু সে প্রত্যাশা করে তার কাছে। এমন নাটকীয় ধরণে কথা বলে অমলা ! কথার পিছনে প্রকৃত নাটক থাকে না অথচ একেবারেই। হৃদয়াবেগ ও মস্তিস্ক মিশিয়া যেন তৈরী হয় তার ব্যবহার ও মুখের শব্দগুলি। কাঁচাপাকা আমের মত নতুন বৌকে সূর্য্যকান্তের লাগিতেছে মিষ্টি আর টক। তার দোষ ছিল না। ওইরকম ব্যবহারই করিতেছিল অমলা ! তিন মাস ধরিয়া তপস্যার মত সে যে

ভাবিয়াছে কি, কি কারণে সূর্য্যকান্তের মত লোক তার মত মেয়েকে এমন সাধারণভাবে বিবাহ করে, এখন বিবাহের পর সে জানিবার চেষ্টা করিবে না সেই কারণগুলির মধ্যে কোনটা তার স্বামীর বেলা প্রযোজ্য? তিন মাসের গভীর গবেষণা তার বিফলে যাইবে?

তবে ও বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের ইচ্ছাটা তার ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, অতীত জীবনে যত বিপর্য্যয় সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে ঘটিয়া থাক, সে কথা আজ না ভাবাই ভাল। তাকে লইয়া একটা নতুন অধ্যায় আরম্ভ হোক সূর্য্যকান্তের জীবনে। আপনা হইতে সে তুমি বলিতে আরম্ভ করে কিনা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল সূর্য্যকান্ত! হয়ত আপনা হইতে সে তাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে কিনা দেখিবার জন্যও সে অপেক্ষা করিয়া আছে? হায় অমলার অবোধ স্বামী। এতবড় সাহিত্যিক তুমি, তোমাকে ভাল না বাসিয়া কি অমলা পারে? এইসব ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে অমলা নিজেকে ও স্বামীকে মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল সূর্য্যকান্তেরই একখানা বইএর একজোড়া নবদম্পতীর মত। যদিও বইএর ওরা দু'জনে, শঙ্কর ও সরযূ, প্রায় তিন বছর ধরিয়া অনেক ভুল-বোঝা, কলহ বিবাদ ও বাধাবিপত্তির পর একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে নবদম্পতী হইয়াছিল, কিন্তু তাতে কি আসিয়া যায়? তেমন বৈচিত্র্যময় তিনটা বছর কাটাইবার পর তাদেরও মিলন হইয়াছে এটা কল্পনা করা এমন কি কঠিন? অন্ততঃ সূর্য্যকান্তের পক্ষে একটুও কঠিন নয়—সেই তো লিখিয়াছে বইটা।

অমলা (এখন সরযূ) তাই ধীরে ধীরে গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল সূর্য্যকান্তের (এখন শঙ্কর), 'স্মৃতির কাতরতা মেশানো অবর্ণনীয় পুলকের স্বপ্ন' ঘনাইয়া আসিয়াছিল তার দুটি অর্দ্ধনিমীলিত চোখে, 'তিন বছর যে কণ্ঠস্বরে লুকানো ছিল গোপন অশ্রুর সজল সুর তাতে প্রথম মোহকারী আনন্দের

আভাষ মিশিলে যেমন শোনায়' তেমনি কণ্ঠস্বরে সে বলিয়াছিল—হ্যাঁ গো তুমি কি কখনো ভাবতে পেরেছিলে তুমি আর আমি কোনদিন এত কাছাকাছি আসতে পারব?

যে সব গহনা দাবী করা হইয়াছিল বিবাহের সময় আজ অমলার হাতে তার অতিরিক্ত একজোড়া ব্রেস্‌লেট ছিল। সূর্য্যকান্ত জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল ও গহনাটি কে দিয়াছে। অবাক হইয়া সে বলিয়াছিল, তার মানে?

অমলা বলিয়াছিল, আমার মনে হচ্ছে কতকাল যেন ভাগ্য আমাদের জোর করে তফাৎ করে রেখেছিল। আরও দু'এক বছর দেরী করে যদি আমাদের বিয়ে হত, তাহলে হয়ত আমি—

সূর্য্যকান্তের মুখ দেখিয়া অমলা থামিয়া গিয়াছিল। এত অভিনয় নয়. সত্যই বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতেছিল তার, আবেগে সে নিশ্বাস ফেলিতেছিল ছোট ছোট! মধ্যবিত্ত সংসারের অনভিজ্ঞা, কোমলমনা, ছেলেমানুষ মেয়ে, জীবনে প্রথমবার একজনের সঙ্গে পাকা প্রেমিকার মত ব্যবহার করিতে গেলে বই পড়া বিদ্যায় কুলাইবে কেন। আবেগ, উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস ও হঠাৎ একেবারে জন্মের মত কথা বন্ধ করিয়া সূর্য্যকান্তের বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলিতে যাওয়ার মত যে গভীর লজ্জা এখন অমলার আসিয়াছিল, তার কোনটাই বানানো নয়।

সূর্য্যকান্ত ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল, তোমার বয়স কত বল ত?

উনিশ বছর।

বিয়ের আগে শুনেছিলাম ষোল চলছে। তোমার নাকি বাড়ন্ত গড়ন।

একি; অচিন্তিত আঘাত! আশ্বিনের রাত্রি,. আকাশে হয়ত জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি—পরশু সন্ধ্যায় সূর্য্যকান্তের এক বন্ধুর বৌ যে একরাশি ফুল

দিয়াছিল, ঘর ভরিয়া সেই বাসি ফুলের গন্ধ। শুধু তাই নয়। প্যাডে সূর্য্যকান্তের অসমাপ্ত গল্পটির শেষ কয়েকটা লাইন অমলা আড়চোখে পড়িয়া ফেলিয়াছিল,—অবনী নামে কে যেন অনুপমা নামে কার ছদ্মবেশ-পরাণো গোপন ভালবাসা জানিতে পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, বিবর্ণ পাংশু হইয়া আসিয়াছে তার মুখ, আর অনুপমার অনুপম চোখ দুটিতে দীপশিখার মত দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে বিদ্রোহ—প্রথার বিরুদ্ধে, দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে, কে জানে আরও কিসের বিরুদ্ধে! এমন সময়, অবনী ও অনুপমার ওরকম উত্তেজনাময় মুহূর্ত্তগুলির কথা লিখিতে লিখিতে বৌকে বুকে লইয়া একি রূঢ় বাস্তব মন্তব্য সূর্য্যকান্তের! সম্বন্ধ করার সময় দু'বছর কি আড়াই বছর বয়স দাঁড়াইয়াছিল তার বাপ মা, এই কি সে কথা তুলিবার সময়?

অবনী ও অনুপমার গল্পটা পরে অমলা অনেকবার পড়িয়াছে। সেদিন যেখানে সূর্য্যকান্ত লেখা বন্ধ করিয়াছিল, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া প্রত্যেকবার অমলার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর ও পর্য্যন্ত লিখিয়া সেদিন রাত্রে সূর্য্যকান্ত অমন নিরুত্তেজ আবেগহীন অবস্থায় কি করিয়াছিল? কি প্রবঞ্চক সূর্য্যকান্ত!

আজকাল স্বামীর প্রবঞ্চনাকে অমলা মাঝে মাঝে 'আত্মসংযম' বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছে। এটাও সে জানিয়াছে যে সূর্য্যকান্ত, সবদিক দিয়া যতই সাধারণ হোক—বাস্তব জীবনে, কি যেন আছে লোকটার মধ্যে, অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত, যার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না। সাফল্যলাভ করিবার আগে প্রতিভাবানের প্রতিভা যেমন থাকিয়াও থাকে না, সেই রকম একটা অস্তিত্বহীন বিপুল ব্যক্তিত্ব যেন সূর্য্যকান্তের থাকিয়াও নাই—অন্ততঃ অমলার কাছে। তাই, মাঝে

মাঝে বিনয়ে তার হৃদয়টা কেন এতখানি ভরিয়া আসে যে সূর্য্যকান্তের কাছে মাথা নত করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সে ভাল বুঝিতে পারে না। বশ মানিতে সাধ হয় অমলার। স্বামী তার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়, কল্পনাস্রোত রুদ্ধ করে, আশা অপূর্ণ রাখে, নিজেও যথোচিত ভাবে ভালবাসে না, তাকেও বাসিতে দেয় না—তবু!

আজকাল—মানে বিবাহের মাস আষ্টেক পরে—বসন্তের শেষে যখন গ্রীষ্ম সুরু হইয়াছে—গরমে অমলার ঘন ঘন পিপাসা পায়—সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্য্যকান্তের অবাস্তব কবিত্বময় ভালবাসার জন্য তার যে পিপাসা সব সময় জাগিয়া থাকে, গ্রীষ্ম তার কারণ নয়, সেটা স্বাভাবিকও নয়। একদিন, একটা দিনের জন্যও সূর্য্যকান্ত যদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত!—যদি আবোল তাবোল কথা বলিত অমলাকে, আবেগে অদ্ভুত ব্যবহার করিত, পাগলের মত মাতালের মত এমন ভালবাসিত তাকে—যে বাস্তব জগৎটা আড়াল হইয়া যাইত প্রেমের রঙীন পর্দ্দায়! কিন্তু সূর্য্যকান্ত একমিনিটের জন্যও আত্মবিস্মৃত হইতে জানে না। এমন কি অমলা নিজেই যদি একটু বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস আরম্ভ করিয়া দেয়, সৃষ্টি করিয়া লইতে চায় একটি মোহকারী কাব্যময় পরিবেষ্টনী, সূর্য্যকান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, এসব ছ্যাবলামি শিখলে কোথায়?

রাগের মাথায় অমলা বলে, তোমার কাছ থেকে শিখেছি, তোমার বই থেকে।

সূর্য্যকান্ত বলে, তোমাকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম, বিয়ের আগে, মনে হয়েছিল তুমি বুঝি খুব সাদাসিদে সরল—এসব পাকামি জানো না। তুমি যা শিখেছ অমল, আমার কোন বইএ তা নেই। যদি কখনো লিখে থাকি, ঠাট্টা করে খোঁচা দিয়ে লিখেছি; এরকম কবিত্ব যারা করে তাদের যে মাথার ব্যারাম থাকে তাই দেখাবার জন্য।

সূর্য্যকান্তের লেখার সমালোচকরা একথা শুনিলে তাকে মিথ্যাবাদী বলিত, অমলা রুদ্ধশ্বাসে শুধু বলে, ভালবাসা বুঝি মাথার ব্যারাম ?

ভালবাসার তুমি কি বোঝ শুনি ?

অমলা স্তব্ধ হইয়া যায়। রাগে অভিমানে প্রথমে তার মনে হয় এর চেয়ে মরিয়া যাওয়াও ভাল। ভালবাসার কিছু বোঝে না সে ? **বেশ,** চুলোয় যাক ভালবাসা। সে বুঝিতে চায় না। সে কি চায় তাতো সূর্য্যকান্ত বোঝে ? হোক এসব তার ছ্যাবলামি, কি দোষ আছে এতে, কি ক্ষতি আছে ? তার সঙ্গে এই ছ্যাবলামিতে সূর্য্যকান্ত একটু যোগ দিলে কি বাড়ীর ছাদটা ধ্বসিয়া পড়িবে, না পুলিশে ধরিয়া তাদের জেলে পুরিবে ? ক্ষতি তো কিছু নাই ই, বরং লাভ আছে অনেক—এই সব মনান্তর ও মনোকষ্টগুলি ঘটিত না। অকারণে কেন এরকম করে সূর্য্যকান্ত তার সঙ্গে ? কি সুখটা তার হয়, বৌকে এত কষ্ট দিয়া ? অমলার কান্না আসে। কুঁজোটা হাতখানেক সরাইয়া রাখা, টেবিল গুছানো, বই ও কাগজপত্রগুলি একটু ভিন্নভাবে সাজানো এই ধরণের খুঁটিনাটি কাজ করিতে করিতে সে চোখের জল ফেলিতে থাকে। সূর্য্যকান্ত যে দেখিতে পাইতেছে যে সে কাঁদিতেছে, তাতে অমলার সন্দেহ থাকে না।

সূর্য্যকান্ত বলে এক গ্লাস জল দাও তো।

অমলা কাঁচের গ্লাসে জল দিল। এক চুমুক পান করিয়া হাসিয়া বলে, তুমি জল দিলে আমার মনে হওয়া উচিত—জল খাচ্ছি না, সুধা পান করছি, না অমলা ?

ঠাট্টা। সে কাঁদিতেছে দেখিয়াও এমন রূঢ় পরিহাস। বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া এবার অমলা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। আছড়াইয়া পড়ার ধাক্কায় সূর্য্যকান্তের হাত হইতে গ্লাসটা পড়িয়া গিয়া

বিছানা ভাসিয়া যায়। গ্লাসটা তুলিয়া সরাইয়া রাখিবার পর মনে হয় অমলার চোখের জলেই বিছানাটা এমনভাবে ভিজিয়াছে।

সূর্য্যকান্ত বিব্রত হইয়া বলে, তোমার সঙ্গে পেরে উঠলাম না অমল, সোজা সহজ জীবনে তুমি খালি বিকার টেনে আনছ। এই বয়সে এরকম হল কেন তোমার? অনর্থক দুঃখ তৈরী করো কেন? কি হয়েছে তোমার, ছেলে মরেছে, না স্বামী তোমায় ত্যাগ করেছে? খেতে পরতে পাচ্ছ না তুমি? সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সইছে না তোমার? দিব্যি হেসে খেলে মনের আনন্দে দিন কাটাবে তুমি, তা নয়, সব সময় একটা কৃত্রিম ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আছ। বিয়ের আগে আর কারো সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে থাকলেও বরং ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম। তাও তো নয়। তোমার যত ব্যথা বেদনা সব আমাকে নিয়েই। কেন বলত? তোমাকে আমি অবহেলা করি, আদর-যত্ন করি না? আজ তোমাকে হাসাবার কত চেষ্টা করলাম তুমি হাসলে না, রাগাবার চেষ্টা করলাম রাগলে না, বললাম এসো দুজনে একটু ব্যাগাটেলি খেলি, তার বদলে তুমি—

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে অমলা উঠিয়া বসে, অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা গুঁজিয়া দেয় স্বামীর পায়ের মধ্যে, বলে, আমায় মাপ কর, মাপ কর। আমি তোমার উপযুক্ত নই।

সূর্য্যকান্ত বলে, এই তো! এই ছ্যাখো আবার কি আরম্ভ করলে!

এই ধরণের দাম্পত্যালাপের যখন ইতি হয় এবং উত্তেজনা কিছু জুড়াইয়া আসে, অমলার মনের মধ্যে তখন যে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া গজরায় ও গুমরায়—তার মধ্যে প্রধান হইয়া থাকে অভিমান। দুরন্ত

অভিমানকে জয় করিয়া তাকে ঘুম পাড়াইতে একেবারে হয়রাণ হইয়া যায় ঘুমের পরীরা। সকালে থাকে বিষাদ। সংসারের কাজ করিতে করিতে সে অন্যমন হইয়া যায়। বড় জা, বিধবা ননদ, দুটি দেবর এবং আরও যারা বাড়ীতে থাকে পরীক্ষকের দৃষ্টিতে সকলে মুখের দিকে তাকায় অমলার, মেয়েরা ফিস ফিস করিয়া নিজেদের মধ্যে তার কথা আলোচনা করে। তারপর সূর্য্যকান্ত আপিসে চলিয়া গেলে নিজের অজ্ঞাতেই এমন ব্যবহার করে অমলা, বাড়ীতে যেন আর মানুষ নাই, বাড়ী খালি হইয়া গিয়াছে।

দেবর চন্দ্রকান্ত বলে, মাথা ধরেছে মেজ বৌদি?

[illegible]

[illegible] শুনো না ওকে একবার শুনে এসে দিকি দিদি [illegible] সব মানুষ শোন।

তখন [illegible] মনে পড়ে [illegible] রান্নার পালা ছিল, কিন্তু রান্না সে করে নাই। [illegible] আগলাইয়া [illegible] বসিয়া আছে। [illegible] অপমান করে, [illegible] সময় যার জামার [illegible] কি [illegible] সারা [illegible] কাটান?' বলার [illegible] বিশ্বাসের [illegible] বিছানা আশ্রয় করিতে হইয়াছে, [illegible] সেই [illegible] কথাই ভাবিয়াছে বিছানায় [illegible] সকলের [illegible] কি কৈফিয়ৎ [illegible] হইয়া থাকার?

অমলা হঠাৎ কাতরকণ্ঠে বলে, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, আমি আজ খাব না।

উপবাসী হৃদয়ের কাণ্ডকারখানায় দিনটা অমলার উপবাসে কাটে। বিকালের দিকে ক্রমবর্দ্ধনশীল উত্তেজনায় সে হইয়া থাকে বোমার মত উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরক। সূর্য্যকান্ত বাড়ী আসিলেই বলে, শোন, ওগো

শোন, কাছে এস না? এইখানে এসে শোন! একমাসের ছুটি নেবে? কোথাও নিয়ে যাবে আমাকে? যেখান হোক, যেদিকে দু'চোখ যায় চল আমরা বেরিয়ে পড়ি। শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়। যাবে? বল না, যাবে? তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে অপর্ণার মত আমি তোমাকে শেষবার জিজ্ঞেস করব—

আপিস ফেরত ঘর্মাক্ত সূর্য্যকান্ত গলা হইতে অমলার হাতের বাঁধন ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয়। তারপর খোলে জামা।

জিজ্ঞাসা করে, অপর্ণা কে?

ওমা, ভুলে গেছ? তোমার অপর্ণা গো!

আমার অপর্ণা?

তোমার রামধনু বই এর। যে বলেছে, মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত একজনকে ভালবাসা, সে রাজা হোক, পথের ভিখারী হোক্—

ও, সেই অপর্ণা?—জুতা জামা খুলিয়া সূর্য্যকান্ত তফাতে চেয়ারে বসে। গম্ভীর চিন্তিত মুখে অমলাব মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে বলে, সামনের শনিবার ছুটি নিয়ে তোমাকে বাপের বাড়ী রেখে আসব কিছুদিনের জন্য।

স্তম্ভিতা অমলা বলে, কেন?

এখানে থাকলে তুমি ক্ষেপে যাবে।

এ আঘাতে অমলার উচ্ছ্বাসের বোমা ফাটিয়া যায়, কান্নার বিস্ফোরণে। সূর্য্যকান্ত নিষ্ঠুর নয়, মিনিটখানেকের মধ্যে তার ঘামে-ভেজা বুকখানা অমলার চোখের জল আরও ভিজাইয়া দিতে থাকে। বড় ম্লান দেখায় সূর্য্যকান্তের মুখখানা।

স্ত্রীকে নার্ভটনিক খাওয়ানোর বদলে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠানোই সূর্য্যকান্ত ভাল মনে করিল। এখানে থাকিয়াই সে নার্ভটনিক খাইতে পারিবে শুধু এই ভয়ে নয়। অমলা অনেকদিন বাপ মাকে দেখে নাই। কুমারী-জীবনের আবহাওয়ায় কিছুদিন বাস করিয়া আসিলে হয়ত বিবাহিত জীবন-যাপনের কৌশলগুলি সে কিছু কিছু আয়ত্ত করিতে পারিবে। উনিশটা বছর অমলা সেখানে ছিল, সবগুলি বছর বোধ হয় সঙ্গে আনিতে পারে নাই, তাই এরকম ছেলেমানুষী করে। তাছাড়া একটু বিচ্ছেদ ভাল। বিরহের তাপে ও প্রেমের অস্বাভাবিকতার বীজাণুগুলি একটু নিস্তেজ হইতেও পারে।

যাইতে রাজী হইল বটে অমলা, সে জন্য কাণ্ড করিল কম নয়। রাজী হওয়ার রাত্রে অনেকক্ষণ গুম খাইয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে সইতে পারছ না বলে পাঠিয়ে দিচ্ছ না তো?

না গো, না।

আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে?

করবে না? তুমি বুঝি ভাব তোমাকে আমি ভালবাসি না? একা একা বিশ্রী লাগবে অমল।

শুধু বিশ্রী লাগিবে! অমলা জোর দিয়া বলিল, একা একা আমি মরে যাব।

একমাস বাপের বাড়ীতে থাকিয়া অমলা ফিরিয়া আসিল। মরিয়া যাইতে অবশ্য সে পারিত, কারণ সেখানে দিন সাতেক সে খুব জ্বরে ভুগিয়াছিল। আশ্চর্য্য জ্বর। একশো এক ডিগ্রিতে পৌছিলেই অমলা বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে সুরু করিত (সজ্ঞানে) এবং তার চারটি বৌদির মধ্যে ছোটজনকে চুপি চুপি জানাইয়া দিত যে জীবনটা তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ছোটবৌদি বলিত ছোটদাদাকে এবং দুই

ননদকে। জ্বরের সাতদিনে বাড়ীর বিশেষ আদরের ছোট মেয়েটির জীবনের ব্যর্থতার সাত রকম দুর্ব্বোধ্য কাহিনী শুনিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোক এমন দুশ্চিন্তার পড়িয়াছিল বলিবার নয়। জ্বর সারিবার পর সকলের প্রতিনিধি হিসাবে বাড়ীর বড়-বৌ কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল অমলাকে। লোক ভাল নয় অমলার শ্বশুরবাড়ীব সকলে? কি করে অমলাকে তারা? বকে? গঞ্জনা দেয়? খাইতে দেয় না? খাটাইয়া মারে? এমনি মারে? তা যদি না হয় তবে সূর্য্যকান্ত বুঝি—

প্রশ্নগুলির জবাব শুনিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের দুশ্চিন্তা পরিণত হইয়াছিল অবাক হওয়ায়। কি জন্য তবে জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে তাব? কত খুঁজিয়া সূর্য্যকান্তেব মত জামাই তারা সংগ্রহ করিয়াছে অমলার জন্য! পণই যে দিয়াছে ষোলশ টাকা! বাড়ীশুদ্ধ লোক যদি বাড়ীরই একটি মেয়ের জীবন ব্যর্থ হওয়ার মত বৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে ধাঁধায় পড়িয়া যায়, মেয়েটির বিপদের সীমা থাকে না। সকলেব ব্যবহাব চিন্তায় ফেলিয়া দেয় তাকে। তার মনে হয়, তবে কি সেই ভুল কবিয়াছে? সত্যই কি তার আশা আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনাগুলি অকথ্য রকমের উদ্ভট মানসিক রোগ?

অমলার প্রতিহত উন্মাদনা, পৃথিবীতে আকাশ-কুসুমের বাগান করার অপূর্ণ কামনা ও বিবাহিত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা—সূর্য্যকান্তের কাছ হইতে সরিয়া আসিবার কয়েকদিন পর হইতেই তার মনে কাজ করিতে-ছিল। তা ছাড়া, বইএব যদি প্রভাব থাকে বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-বঞ্চিত কল্পনাপ্রবণ মনে, বই যারা লেখে তাদেব কি প্রভাব নাই? কাছে থাকিবার সময় স্বামীকে তার সাধারণ মানুষের মত মনে হইত বলিয়া, স্বনামধন্য সাহিত্যিক বলিয়া চেনা যাইত না বলিয়া, যে আপশোষ ছিল অমলার মনে, সাতদিন জ্বরে ভুগিবার সময় ছাড়া এখানে যেন সে আপশোষ

ধীরে ধীরে উপিয়া যাইতেছিল। মনে হইতেছিল, ওরকম সাধারণত্ব কি মানুষ মাত্রেরই থাকে না? ভুল দিকে সে স্বামীর অসাধারণত্ব খুঁজিয়া মারিয়াছিল। অনেক বিষয়ে অসামান্য ছিল বৈ কি সূর্য্যকান্ত! তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসীম জ্ঞান, উদ্দেশ্য বুঝিয়া মানুষের ভালমন্দ কাজের বিচার করা, কোলাহলভরা সংসারের বাস্তবতার মধ্যে থাকিয়াও অমন সুন্দর সব গল্প উপন্যাস রচনা করা, এসব কি অসাধারণত্ব নয়? সারাদিন আপিস করিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত লেখার পর এক একদিন কি বড় শ্রান্ত মনে হইত না সূর্য্যকান্তকে? সেই শ্রান্তিকেই কোনদিন অবহেলা, কোনদিন সংসারের চিন্তা, কোনদিন মানুষটার নিৰ্জ্জীবতা মনে করিয়া সে কি নিজের রাগ দুঃখ অভিমানের পাহাড় সৃষ্টি করিত না, রোমাঞ্চকর ভালবাসার খেলা চাহিয়া শেষে মনোবেদনায় সুরু করিত না কান্না? রামধনুর অপর্ণার মত লাখ লাখ মেয়েকেও সে সৃষ্টি করে ওরকম শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায়—সেও কি ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে বলিয়া বৌএর সঙ্গে ছাদে গিয়া মুগ্ধ ও বিহ্বল হইতে পারে? ঘুমানোর সুযোগ দেওয়ার বদলে কথা বলিয়া অভিমান করিয়া কাঁদিয়া রাত দুটো পর্য্যন্ত সে তাকে জাগাইয়া রাখিত!

এই ধরণের অনেক কথা ভাবিয়াছিল অমলা এক মাস ধরিয়া—সূর্য্যকান্তের ব্যক্তিত্ব, সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার ও উপদেশগুলি তলে তলে কাজ করিতেছিল এবং জ্বরের টনিক একটু শান্ত করিয়া দিয়াছিল অমলাকে। জ্বরের পর কিছুদিন একটু চুপচাপ শান্তিতে থাকিতে কে না চায়? তাই শুধু রোগা হইয়াই নয়, একটু বদলাইয়া অমলা এবার স্বামীগৃহে ফিরিয়া আসিল।

সূর্য্যকান্ত বলিল, এমন রোগা হয়ে গেছ!

জ্বরে ভুগলাম যে?

জবাবটা খাপছাড়া মনে হইল সূর্য্যকান্তের। 'রোগা হব না? একমাস

তোমাকে ছেড়ে—'এ রকম একটা জবাব সে প্রত্যাশা করিতেছিল। যাই হোক, সোজা কথার সোজা জবাব দিতে যদি অমলা শিখিয়া থাকে, ভালই। তাতে ক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু নাই।

অমলা বলিল, তুমিও রোগা হয়ে গেছ।

সূর্য্যকান্ত বলিল, হব না ? একমাস তোমাকে ছেড়ে থেকেছি একা একা।

এ জবাবটা খাপছাড়া মনে হইল অমলার। 'রোগা হয়েছি ? কদিন যা খাটতে হয়েছে অমলা—'এইরকম একটা জবাব সে প্রত্যাশা করিতেছিল। যাই হোক, সাধারণ কথার মিষ্টি জবাব দিতে যদি সূর্য্যকান্ত শিখিয়া থাকে, ভালই। তাতে পুলকিত হওয়ার কিছু নাই।

এই হইল তাদের প্রথম দেখা, অপরাহ্ণে এবং অল্পক্ষণের জন্য। রাত্রে যখন আবার দেখা হইল, চাঁদটা পৃথিবীর অপর পিঠে জ্যোৎস্না ঢালিতেছে : একটু অস্থির ও উন্মনাভাবে সূর্য্যকান্ত ঘরে পায়চারি করিতেছিল। আকাশ-ঢাকা মেঘগুলি এমন গুমোট রচনা করিয়াছে যে ফ্যানটা প্রাণপণে ঘুরিয়াও ভালমত বাতাস সৃষ্টি করিতে পারিতেছিল না। শুধু টেবিলে খোলা প্যাডটার পাতাগুলিকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

অমলা নালিশ করিল, সন্ধ্যে থেকে মেঘ করেছে, এখনো বিষ্টি নামল না, নামলে বাঁচি।

মেঘ করেছে নাকি ?

টের পাওনি ? কবার যে বিদ্যুৎ চমকালো, মেঘ ডাকলো ?

সূর্য্যকান্ত এক নতুন দৃষ্টিতে অমলাকে দেখিতেছিল, পরীক্ষার সময় ছেলেদের প্রথম প্রশ্নপত্র দেখার মত। তারপর একটা প্রশ্নেরও জবাব-না জানা ছেলের মত সে বলিল, সন্ধ্যা থেকে গল্প লিখিবার চেষ্টা করছিলাম অমল।

সত্যি ? নতুন গল্প ! দেখিতো কতটা লিখলে ?—অমলা তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গেল, কাগজ-চাপাটার তলে একটিও লেখা কাগজ না দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। প্যাডটার প্রথম পাতায় শুধু হেডিং, সূর্য্যকান্তের নাম আর পাঁচ ছ'লাইন লেখা।

সন্ধ্যা থেকে শুধু এইটুকু লিখেছ !

সূর্য্যকান্ত ধপাস্ করিয়া বিছানায় বসিয়া বলিল, না, অনেক লিখেছি। ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটটাতে পাবে।

অমলা সবিস্ময়ে বলিল, ওমা, ছেঁড়া কাগজে যে ভর্ত্তি ! সব আজকে লিখে লিখে ছিঁড়েছ ?

সায় দিয়া সূর্য্যকান্ত একটা হাই তুলিল। শ্রান্তি ? অমলা তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিল, ঘুম পেয়েছে ? ঘুমোও তবে। দাঁড়াও বালিশটা ঠিক করে দি'।

সূর্য্যকান্ত বলিল, না, ঘুমোব না। এক মাসের মধ্যে এক লাইন লিখতে পারলাম না—ঘুমোব। শুধু আজ ? কতদিন ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটটা এমনি ভাবে ভর্ত্তি করেছি তার ঠিক নেই। তুমি আমাকে কি করে দিয়ে গিয়েছ তুমিই জানো, লিখতে বসতেও আর ইচ্ছে করে না, বসলেও মন বসে না, জোর করে যা লিখি সব ছিঁড়ে ফেলে দিই। উপন্যাসের ইনষ্টলমেণ্টটা পর্য্যন্ত লিখে দিতে পারি নি।

সূর্য্যকান্তের বিষণ্ণ মুখ দেখিলে কষ্ট হয়। অমলার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, দু'চোখ বড় বড় করিয়া সে চাহিয়া রহিল। বিবাহিত জীবনের এই পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বাপের বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা সহজ ও শান্ত ভাবটুকু অমলার ঘুচিয়া যাইতেছিল। এ ঘরের আবহাওয়ায় সে একা যত বিদ্যুৎ ঠাসিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তার দেহ-মন যেন আবার তাহা শুষিয়া লইতেছে। তবু এবার

হয়ত একটু সংযত থাকিতে পারিত অমলা, হয়ত সূর্য্যকান্ত যে রকম চাহিয়াছিল সেই রকম হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে পারিত—সূর্য্যকান্ত যদি এমন ভাব না দেখাইত আজ, এমন ভাবে কথা না বলিত। তার সুদীর্ঘ কুমারী জীবনের শেষ ক'মাসের কল্পনার মত হইয়া উঠিয়াছে যে সূর্য্যকান্ত আজ! আঙুল চালাইয়া চালাইয়া চুল এলোমেলো করিয়া দেওয়ায় কি বন্যই আজ তাকে দেখাইতেছে! চোখের চাহনিতে যেন বিপন্নতার সঙ্গে মিশিয়া আছে বিদ্রোহ, কথা বলিবার ভঙ্গিতে যেন শোনা যাইতেছে পরাজিত ক্ষুব্ধ আত্মার নালিশ, বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে হঠাৎ উঠিয়া ভয়ানক কিছু করিবার এটা ভূমিকা মাত্র। তাছাড়া, তারই জন্য এক মাস সূর্য্যকান্ত কিছুই লিখিতে পারে নাই! প্রথম দীর্ঘ বিরহ আসিবামাত্র স্বামী তার বুঝিতে পারিয়াছে, কি ভয়ানক ভালই সে বসিয়া ফেলিয়াছে তার বৌকে! অমলা শিহরিয়া ওঠে, তার রোমাঞ্চ হয়।

গদগদকণ্ঠে সে বলিল, আমার জন্য? আমার জন্য এক মাস তুমি লিখতে পার নি?

সূর্য্যকান্ত তার হাত চাপিয়া ধরিল। এত জোরে ধরিল যে চুড়িগুলি প্রায় কাটিয়া বসিয়া গেল অমলার হাতে। গলা আবেগে কাঁপাইয়া সূর্য্য-কান্ত বলিল, কার জন্য তবে? তুমি আমায় পাগল করে দিয়েছে অমল, আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ। কতবার ইচ্ছে হয়েছে ছুটে গিয়ে তোমাকে দেখে আসি। কেন যাইনি জান? বিরহের যাতনা কত তীব্র হতে পারে তাই দেখবার জন্য। আমার রামধনু বইএর অপর্ণাকে মনে আছে তোমার? ভালবাসা বাড়ানোর জন্য সে থেকে থেকে নিজেই বিরহ সৃষ্টি করে নিত। আমিও ভাবছিলাম—

একটি মুখর হিরো ও প্রায় নির্ব্বাক হিরোইন—শুধু এই দুটি চরিত্র লইয়া নাটকের যেন অভিনয় চলিতে থাকে ঘরে,—রাত দুটা পর্য্যন্ত!

প্রথম অঙ্ক শেষ হওয়ার আগেই অমলার সবটুকু উত্তেজনা নিস্তেজ হইয়া আসে, জাগে ভয়, মুখ হয় বিবর্ণ। একি ব্যাপার ? সত্য সত্যই পাগল হইয়া গিয়াছে নাকি সূর্য্যকান্ত ? এসব সে কি বলিতেছে, কি করিতেছে ? ক্রমে ক্রমে শ্রান্তি বোধ করে অমলা, তার ঘুম পায়। কিন্তু ঘুমানোর উপায় নাই। তার আট মাসের প্রতিহত উচ্ছ্বাস স্বামী আজ সুদে আসলে ফিরাইয়া দিতেছে, গ্রহণ না করিয়া তার উপায় কি ? কখনো প্রচণ্ড ও কঠিন, কখনও মৃদু ও কোমল ভালবাসার বন্যা আনিয়া দিতেছে স্বামী, যা সে চাহিয়া আসিয়াছে চিরকাল, আজ এ বন্যায় ভাসিয়া না গেলে কি চলে ? মাগো, এমন হইল কেন সূর্য্যকান্ত, কিসে এমন পরিবর্ত্তন আসিল তার ?

রাত দুটোর সময় বোধ হয় তাব মুখ দেখিয়া দয়া হইল সূর্য্যকান্তের। হঠাৎ, মোটরের ব্রেক কষার মত, সে থামিয়া গেল। অমলা মরার মত জিজ্ঞাসা করিল, আমি এসেছি, এবার তো লিখতে পারবে ?

সূর্য্যকান্ত আনমনে জবাব দিল, আমি ভাবছি অমল, কথা কোয়ো না। তোমার কথা ভাবছি। পাশে শুয়ে আছ তুমি, তবু তুমি যেন কতদূরে, কত সমুদ্র, কত মরুভূমি পার হয়ে কুয়াশার আড়ালে তুমি যেন লুকিয়ে আছ, মনকে বাহন করে আমি তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। বাধা দিও না, কথা কোয়ো না।

বিষের ওষুধ নাকি বিষ। তবু, স্ত্রীর প্রকৃতির অস্বাভাবিকতাটুকু স্বাভাবিক করিয়া আনার জন্য সূর্য্যকান্তের এই অভিনব চিকিৎসাকে সমর্থন করা যায় না। আসলে, দোষ তো তারও কম নয়। প্রথম বয়সে ভাবপ্রবণতা, কবিত্ব ও রোমান্সের পিপাসা, হৃদয়ে আবেগ ও

উচ্ছ্বাসের বাহুল্য, অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরই কম বেশী থাকে। এদিকে সূর্য্যকান্ত হইয়া গিয়াছে বুড়া। বয়সে না হোক, মনের হিসাবে। শুধু নিজের জীবনে নয়, পরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করিয়া সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবিয়াছে স্তূপাকার, লিখিতে বসিয়া শুধু পুরুষের নয়, মেয়েদেরও অসংখ্য বিভিন্ন অনুভূতি উপভোগ করিয়াছে বহুবার। ধরিতে গেলে ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে সূর্য্যকান্তের, কখনো সে হইয়াছে বৌ, কখনো বর; সে একাই এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী সাজিয়া নানা ভাবে নানা রকম সংসার স্থাপন করিয়াছে। অমলা তার কোন্ পক্ষের বৌ বলা যায় না! তবু অমলার কল্পনাকে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া দেওয়ার মত ছেলেমানুষী অবাস্তর কল্পনা, জীবনকে কাব্যময় ও নাটকীয় করিয়া তুলিবার পিপাসা—এক কথায়, অনুভূতির জগতে বৈশাখী ঝড় ও বাসন্তী বায়ুর বিপরীত বিপর্য্যয় ঘটাইবার কামনা আজও সূর্য্যকান্তের আছে—তবে সেই সঙ্গে আছে ওই পিপাসা বা কামনাকে গোপন করিয়া রাখার অভ্যাস ও কোন জীবন্ত রক্তমাংসের রমণীর সঙ্গে ওসমস্তের আদান-প্রদানের অক্ষমতা। জীবনটা মানুষের যতখানি গল্প উপন্যাস হওয়া দরকার নিজের গল্প উপন্যাসে সূর্য্যকান্তের তা বহুগুণ বেশী হয়। লেখার সময় ছাড়া সে তাই হইয়া থাকে ভোঁতা, চায় শান্তি ও সহজ স্বাভাবিক জীবন। প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা এরকম হয় কিনা জানি না, তবে যে সব লেখকের বই পড়িয়া শুধু অমলার মত মেয়েদের বুকটা ধড়ফড় করে, তারা অবিকল এই রকম বা এই ধরণেরই অন্য রকম হয়।

বাস্তব জীবনের সাধারণ কাজগুলি সূর্য্যকান্ত সাধারণ ভাবেই করে, সাধারণ সমস্যার মীমাংসা করে সাধারণ বুদ্ধি খাটাইয়া, তাতে কাজও হয়, সমস্যাও মেটে। অমলার জ্বর হইলে সে ডাক্তার ডাকিত সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্বর সাধারণ অসুখ। অমলার হৃদয় মনের অস্বাভাবিক উত্তাপ তো

জ্বর নয়। এই অসুখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সূর্য্যকান্তর সাধারণ বুদ্ধি গুলাইয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল যে বিষে যদিও বিষ ক্ষয় হয়, হিষ্টিরিয়া হিষ্টিরিয়ায় সারে না—কারণ হিষ্টিরিয়া বিষ নয়।

কয়েক দিনের মধ্যে অমলা শুকাইয়া গেল। এতো আর বই পড়া নয়, কল্পনা করা নয়, স্বপ্ন দেখা নয়, নিজের হৃদয়োচ্ছ্বাসকে কোন রকমে বাহির করিয়া দেওয়া নয়! অন্য একজনের হৃদয়কে বহিয়া বেড়ানো—প্রত্যেক দিন উত্তেজনার মদ খাইয়া নেশায় জ্ঞান হারানো। স্বামীর আক্রমণের আকস্মিকতায় প্রথম রাত্রে অমলা ভয় পাইয়া গিয়াছিল, এখন আর ভয় হয় না, বুকটা ফাটিয়া যাইতে চায়, মাথার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল আবর্ত্তনের সৃষ্টি হয়, চোখের সামনে সমস্ত ঝাপ্সা হইয়া আসে। এক এক সময় চীৎকার করিয়া হাসিয়া অথবা কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। এক এক সময় ঘরের জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া ছারখার করিয়া দিবার অথবা সূর্য্যকান্তের বুকটা আঁচড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিবার অদম্য প্রেরণা জাগে। সূর্য্যকান্তর আদরে তার দম আটকাইয়া আসে, কথা শুনিতে শুনিতে দুই কাণের মধ্যে ঝম ঝম আওয়াজ হয়, হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া সে চুপ করিলে চারিদিকের স্তব্ধতা মনের মধ্যে আছড়াইতে থাকে।

ফিস ফিস করিয়া বলে, আলো নিভিয়ে দাও, আলো নিভিয়ে দাও!

সূর্য্যকান্ত বলে, আলো? কোথায় আলো অমলা? জ্যোৎস্নাকে আলো বোলো না।

একটু ঝিমায় অমলা।

লিখবে না আজ?

লেখা? একটু হাসে সূর্য্যকান্ত, কার জন্য লিখব? মনের পাতায় লিখছি, মুখে তোমাকে শোনাচ্ছি। আর কি দরকার লিখে?

মাথাটা কেমন ঘুরছে, কি রকম একটা কষ্ট হচ্ছে।

এবার হঠাৎ যেন সূর্য্যকান্ত চোখের পলকে আগেকার সূর্য্যকান্ত হইয়া যায়। একগ্লাস জল গড়াইয় সে অমলাকে দেয়, ভিজা হাত বুলাইয়া দেয় তার কপালে ও ঘাড়ে। শুধু বলে, শোও। তারপর আলো নিভাইয়া সেও আসিয়া শুইয়া পড়ে! বলে, কি কষ্ট হচ্ছে অমলা?

কি জানি, বুঝতে পারছি না।

কেবল কষ্ট নয়, অনেক কিছুই সে বুঝিতে পারে না। বারুদ-ফুরানো তুবড়ির মত হঠাৎ সূর্য্যকান্ত নিভিয়া গেল কেন? রামধনুর মোহিতের মত বিপুল দুর্ব্বোধ্য প্রেম একমুহূর্ত্তে কি করিয়া হইয়া গেল এমন মৃদু কোমল স্নেহ? গভীর বিষাদ ও অবসাদ বোধ করে অমলা, তার ঘুম আসে না। এক সময় মৃদুস্বরে সূর্য্যকান্ত তাকে ডাকে। ঘুমের ভাণ করিয়া সে জবাব দেয় না। তামাসা? সূর্য্যকান্ত কি তামাসা জুড়িয়াছে তার সঙ্গে? এতদিন ধরিয়া এরকম তামাসা করিবার মানুষ তো সে নয়! তাছাড়া, কারো তামাসা কি এমন উতলা করিয়া তুলিতে পারে একজনকে? প্রথম দু'একদিন কেমন খাপছাড়া মনে হইয়াছিল স্বামীর এই অভিনব পরিবর্ত্তন, এখনো মাঝে মাঝে সব যেন কেমন বেসুরো কৃত্রিম মনে হয়—কিন্তু বাকী সময়? তখন যে আশ্চর্য্য ব্যাকুলতা সে দেখায়, যে অভূতপূর্ব্ব ভাব ফুটিয়া থাকে তার মুখে চোখে, তা কি কখনো বানানো হইতে পারে? কথা বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া সে যখন শুধু চাহিয়া থাকে; শুধু ভাবে, আর মোহগ্রস্ত বিহ্বল মানুষের মত দুটি হাত বাড়াইয়া তাকে স্পর্শ করামাত্র চমকাইয়া ওঠে এবং ভীরু শিশুর মত তাকে জড়াইয়া ধরে, তখনও সে অভিনয় করিতেছে এ কি ভাবা যায়। অথচ এদিকে তার একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা অমলার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সূর্য্যকান্ত তাকে বলিয়াছিল সে বাপের বাড়ী যাওয়ার পর

মাসিকের উপন্যাসটির ইনষ্টলমেণ্ট পর্য্যন্ত সে লিখিয়া দিতে পারে নাই। কদিন আগে, সে আপিস চলিয়া গেলে বারটার ডাকে মাসিকপত্রটি আসিয়াছিল: তাতে ছিল উপন্যাসটির দশপাতা ইনষ্টলমেণ্ট! কৈফিয়ৎ অবশ্য সে একটা দিয়াছিল, সে নাকি এমাসের কথা বলে নাই, বলিয়াছিল আগামী মাসের কথা। এ সংখ্যার লেখাতো সে কবে লিখিয়া দিয়াছে, অমলার বাপের বাড়ী যাওয়ার অনেক আগে।

অন্ততঃ দু'মাস আগে লেখা দিতে হয় অমল, নইলে ওরা সময় পাবে কেন ছাপাবার?

তবু অমলার মনের খটকা যায় নাই। দু'মাস আগে হোক চারমাস আগে হোক, পাঠাইয়া দেওয়ার আগে সূর্য্যকান্তর কোন্ লেখাটা সে পড়িয়া ফ্যালে নাই? এ লেখা সে লিখিল কখন?

আপিসে লিখেছিলাম। দশবারো দিন একদম কাজ ছিল না, সেই সময়। এডিটর তাগিদ দিচ্ছিল তাই আর তোমাকে পড়তে দিইনি।

তবু মিথ্যাটা এসব কৈফিয়তের খোলসে সম্পূর্ণ ঢাকা যায় নাই। অমলার মনের প্রতিবাদ এসব না মানিয়া একটা বিস্বাদ ব্যথায় পরিণত হইয়া আজও তার মনে বাসা বাঁধিয়া আছে। আছে গোপনে। সূর্য্যকান্তর এখনকার নতুন ধরণের ভালবাসারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই!

লেখা সূর্য্যকান্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। বাড়ীতেও লেখে না, আপিসেও লেখে না। বাপের বাড়ী গিয়া নয়, এখানে আসিয়া অমলা তার লেখার ক্ষমতা হরণ করিয়াছে। অমলাকে অজস্র পরিমাণে দেওয়ার জন্য নিজের মধ্যে সে যে উচ্ছ্বাসের কারখানা বসাইয়াছে এবং কারখানা চালানোর জন্য মজুর ভাড়া করিয়াছে বই লেখার কৃত্রিম খাদ্যে পরিতুষ্ট মনের চাপা-পড়া পাগলামীগুলিকে, সেই কারখানাতে এখন সবসময় সে কর্ত্তৃত্ব খাটাইতে পারে না। অমলাকে দেওয়ার জন্য ছাড়া অন্য কাজে খাটাইতে গেলে

মজুররা ধর্ম্মঘট করে, কারখানা বন্ধ করার কথা ভাবিলে আরম্ভ করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে একটু একটু মদ খাইতে আরম্ভ করিয়া যারা নেশার দাস হইয়া পড়ে, তাদের মত অবস্থা হইয়াছে সূর্য্যকান্তের। অমলার সঙ্গ ছাড়া আর কিছু তার ভাল লাগে না—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কর্ত্তব্যপালন। শয়নঘরেব বাহিরে সে আগের চেয়েও গম্ভীর হইয়া থাকে, মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারকে সে আরও সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিয়া রাখে—মনে হয় সে যেন সবসময় প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া চলিতেছে আর বোধ করিতেছে দারুণ অস্বস্তি। সাহিত্যিক বন্ধুরা জানিতে চায় সে তার এক নম্বর এপিক্‌টা লিখিতেছে কি না, সম্পাদকরা প্রকারান্তরে জানাইয়া দেয় এরকম অন্যায় ব্যবহার সহ্য করা কঠিন, সাধারণ বন্ধুরা উপদেশ দেয় চেঞ্জে যাওয়ার, বাড়ীর লোকে চেষ্টা করে আদর যত্ন স্নেহ মমতা সহানুভূতি প্রভৃতির পরিমাণটা বাড়াইবার। বাইশ বছর বয়সে যা করা চলিত, ত্রিশ বছর বয়সে তাই করিতে চাহিয়া চারিদিকে সূর্য্যকান্ত বিশৃঙ্খলা আনিয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে তার মনে হয় অমলার চিকিৎসার জন্য নয়—ওই ছুতা করিয়া নিজের দাবাইয়া রাখা মানসিক বিকারগুলিকে সে সতেজে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছে। অমলার পাগলামী সারানো নয়, এ তার নিজেরই পাগল হওয়ার ইচ্ছা মেটানো। তা না হইলে, এসব অমলার সহ্য হইতেছে না দেখিয়াও সে কি থামিয়া যাইত না? সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া আনিত না তাদের সঙ্গ? এভাবে সে তো ওকে নির্য্যাতন করিতে চায় নাই! ওকে শুধু সে বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, ও যে নাটকীয় প্রেম চাহিত সেটা কত তুচ্ছ, কত হাল্কা, কতদূর হাস্যকর! সে তো শুধু থিয়েটার করিতে চাহিয়াছিল কদিন, তার নিজের গৃহের সিমেণ্টের রঙ্গমঞ্চে সাধারণ বাস্তব জীবনের বিরুদ্ধ দৃশ্যপটের আবেষ্টনীতে অমলার

উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা লইয়া রচিত একটা শিক্ষাপ্রদ নাটকের অভিনয় ; এখন তার কাছেই সে অভিনয় এতবড় সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে কোনমতেই যবনিকা সে আর ফেলিতে পারিতেছে না।

দিন কাটে। একমাসের ছুটি নেয় সূর্য্যকান্ত, আপিস বিরক্তিকর। অমলার চোখের নীচেকার কালিমার ছাপ গাঢ় হইতে থাকে, কোন কারণে কোন দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিলে মনে হয় চোখে যেন তার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সংসারের কাজ আছে, সকলের সঙ্গে মেলামেশা আছে, সংসারের দৈনন্দিন সুখদুঃখ হাসিকান্নার ভাগ নেওয়া আছে। শ্রান্ত বিষণ্ণ ও অন্যমনস্কভাবে এসব সে করিয়া যায়। রান্নাঘরে রাঁধিবার সময়ও সে যেন থাকে তার নিজের ঘরে, কল চালাইয়া সেজ ননদের ছেলের জামা সেলাই করিবার সময় সে যেন কণ্ঠলগ্না হইয়া থাকে সূর্য্যকান্তের। শান্ত ও স্নিগ্ধ একটু রূপ ছিল অমলার আর ছিল তেলমাখা পাথরের বাটির মত একটু ভোঁতা লাবণ্য, এখন তার রূপ হইয়াছে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা মুখভঙ্গির তীক্ষ্ণ তেজী মৌলিকতা, লাবণ্য হইয়াছে সদ্য শান্ দেওয়া সীসার ছুরির পালিশ। মেজাজ, বুদ্ধিবিবেচনা, আত্মসংযম, চিন্তা ও কল্পনা, সুনিদ্রা এসব বড় অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে অমলার। হঠাৎ সামান্য কারণে সে এত রাগিয়া যায় যে অন্ততঃ আরও একটা বছরের পুরাণ বৌ যদি সে হইত, না খাইয়া শুইয়া থাকার বদলে বাড়ীঘর মাথায় না তুলিয়া কখনই ছাড়িত না। ভাবনাগুলি তার এমন এলোমেলো হইয়াছে যে সব সময় কি ভাবিতেছে তাও সে বুঝিতে পারে না ; ষ্টিমারে চাপিয়া করে সে একবার ঢাকা গিয়াছিল, আর কাল সেজ ননদ যে বড়জার ছেলের দুধটুকু নিজের ছেলেকে খাওয়াইয়া দিয়াছিল, আর পরশু রাত্রে সূর্য্যকান্ত যে তার উনিশ বছর বয়সের একটা ভুলের কাহিনী শোনাইয়াছিল, আর ..! তবু এ সমস্ত খিচুড়ি পাকানো চিন্তার মধ্যে আসল চিন্তার খেইটা না হয়

নাই খুঁজিয়া পাওয়া গেল, বারান্দায় বাড়ীর যে দাসীটা আঁচল পাতিয়া ঘুমাইয়া আছে ওর মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া দিবার সাধটা কোন দেশী সাধ? আর আজ রাত্রে বিধবা বড় ননদের সঙ্গে শোয়ার সাধ? চুপি চুপি সদর দরজা খুলিয়া পালাইয়া যাওয়ার সাধ? কলের ছুঁচটার নীচে একটা আঙ্গুল দিয়া নিজেকে কেন্দ্র করিয়া বাড়ীতে একটা হৈ চৈ গণ্ডগোল সৃষ্টি করার সাধ? আচ্ছা, কাল যখন সিড়ি দিয়া নামার সময় পা পিছলাইয়া গিয়াছিল, রেলিং ধরিয়া সামলাইয়া না নিলে কি হইত? খুব কি লাগিত গড়াইয়া গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেলে, হাত ভাঙ্গিত, মাথা ফাটিত, একেবারে সে অজ্ঞান হইয়া যাইত? কি করিত সকলে? সূর্য্যকান্ত কি করিত?—ভ্যাখো! সেজ ননদের ছেলের জামার কোন-খানটা সে সেলাই করিয়া ফেলিয়াছে। মরেও না সেজ ননদটা।

একমাস ছুটি নিয়াছে সূর্য্যকান্ত। কিন্তু দুপুরে অমলা ঘরে যায় না। সূর্য্যকান্তও তাকে ডাকে না। আপিস না করার আলস্য সে অমলা কাছে না থাকার মুক্তির সঙ্গে মিশাইয়া উপভোগ করে। বেশী বেলায় বেশী খাওয়ার জন্য একটু অম্বলের জ্বালাও সে ভোগ করে। চোখ দিয়া দ্যাখে কড়িকাঠ, কাণ দিয়া শোনে ওদিকের ঘরে অমলার কল চালানোর ক্ষীণ শব্দ, হৃদয় দিয়া অনুভব করে ভোঁতা একটা গ্লানি, আর মন দিয়া ভাবে আজই পোষ্টাপিস হইতে শ' তিনেক টাকা তুলিয়া বিকালের কোন একটা গাড়ীতে কোথাও 'বেড়াইতে গেলে কেমন হয়। বিকালের গাড়ীতে, অন্ততঃ রাত্রি নটার আগের কোন গাড়ীতে। অমলা ঘরে আসার আগেই যে গাড়ীটা ছাড়িয়া যায়। কোন্ অমলা? তার মনের, না ও ঘরে কল চালাইয়া যে সেজ ননদের ছেলের জামা সেলাই করিতেছে, যে ঘরে আসিলে এতটুকু ঘরে কোটি বসন্ত আর কোটি প্রেমিকপ্রেমিকার মিলন মূহূর্ত্তগুলি ঘনাইয়া আসিবে? ঠিক বুঝিতে পারে না সূর্য্যকান্ত। মনের

অমলাকে সাথী করিয়া বিকালের গাড়ীতে পালানো যায়, কিন্তু তাতে কি ও ঘরের অমলার জন্য মন কেমন করা কমিবে ?

ছুটি নেওয়ার চার পাঁচদিন পরে বিকাল বেলা সূর্য্যকান্ত একখানা চিঠি লিখিতেছিল, অর্দ্ধেক লিখিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কার উপরে রাগ করিয়াই সে যেন উঠিয়া পড়িল। সহজ ভাষায় পরিষ্কার করিয়া কেবল দরকারী কথাগুলি লিখিয়া একখানা চিঠি লেখার ক্ষমতাও যদি তার লোপ পাইয়া থাকে, এবার তবে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। জামা গায়ে দিতে দিতে সূর্য্যকান্তের রাগ কমিয়া আসিল। কার উপরে রাগ করিবে ? চিঠি লিখিতে বসিয়া সে যদি ভাবিতে আরম্ভ করে যে আজ রাত্রে অমলার সঙ্গে প্রথমেই কি ভাবে একটা নতুন ধরণের মধুর কলহ আরম্ভ করা সম্ভব, গুরুতর বিষয়ের বৈষয়িক চিঠি সে লিখিবে কি করিয়া ? জুতা পায়ে দিয়া, কাপড় বদলাইয়া সূর্য্যকান্ত ঘরের বাহিরে আসিল। বারান্দায় ষ্টোভ জ্বালিয়া বৈকালিক চা জলখাবারের আয়োজন হইতেছে। মেঘলা রঙের শাড়ী পরিয়া অমলা বেলিতেছে লুচি। শুধু বাড়ীর মেয়েদের ও ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে অমলার স্বাভাবিক তুচ্ছ অসংযমটুকু কি রহস্যময় ! একটু দাঁড়াইল সূর্য্যকান্ত। অমলার সেজ ননদ বলিল, বেরিয়ে যাচ্ছ নাকি দাদা ? খেয়ে যাও, আগে চা করে দিচ্ছি তোমাকে। কেট্‌লিতে জল আনো দিকি মেজো বৌদি ? যা লুচি ভাজা হয়েছে ওতেই দাদার হয়ে যাবে।

সূর্য্যকান্ত বলিল, এখন কিছু খাব না। খিদে নেই। সময় নেই।

তখন উঠিয়া আসিয়া অমলা ঘরে ঢুকিল। বক্তব্য আছে। এ বাড়ীতে আধ-পুরাণ বৌদের প্রথমে নিজে সকলের চোখের আড়ালে গিয়া—তারপর স্বামীকে ইসারায় কাছে ডাকিয়া কথা বলা নিয়ম। এখন ইসারার দরকার ছিল না। সূর্য্যকান্তও ঘরে গেল।

অমলা বলিল, বাইরে থেকে চা খেয়ে এসো না কিন্তু। আমিও এখন চা খাব না, তুমি ফিরে এলে আমি নিজে চা করে দেব, তারপর এক পেয়ালা থেকে দুজনে এক সঙ্গে চা খাব, কেমন? এমনি করে খাব —

এ মন্দ পরামর্শ নয়। গালে গাল ঠেকাইয়া একসঙ্গে দুজনে চায়ের কাপে চুমুক হয়ত তারা দিতে পারিবে। কিন্তু কেন? গালে গাল ঠেকানো আর চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ব্যাপার দুটো পৃথক করিয়া রাখিলে দোষ কি?

আজ আমি ফিরব না অমল।

ফিরিবে না! রাত্রে বাড়ী ফিরিবে না! কোথায় থাকিবে সূর্য্যকান্ত সমস্ত রাত? বন্ধুর বাড়ী? কেন? বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রে থাকিবে কেন? নিমন্ত্রণ আছে, খাওয়া শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে, তাই? হোক রাত্রি, ট্যাক্সি করিয়া যেন সে ফিরিয়া আসে। একদিন না হয় ট্যাক্সি ভাড়া বাবদ দেড়টাকা দু'টাকা খরচই হইবে! অমলার অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চোখে বিঁধিতে থাকে সূর্য্যকান্তর, মাথাটা যেন ঘুরিয়া ওঠে।

তবে যাব না অমল।

সেই ভাল। কি হবে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে?

তাই তো বটে! তার চেয়ে অমলার সঙ্গে এক কাপে চা খাওয়া ঢের বেশী উপভোগ্য। কিন্তু কি ভাবে ওর সঙ্গে আজ সে মধুর কলহটা আরম্ভ করিবে? কি ভাবে আজ সে নূতন একটা বৈচিত্র্য আনিবে তাদের প্রেমাভিনয়ে? বেশী জটিল হইলে, বেশী আর্টিষ্টিক হইলে অমলা আবার বুঝিতে পারে না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে সে তার উপযুক্ত বৌ নয়, তার মরাই ভাল। ফেনা ভালবাসে অমলা, শুধু ফেনা। তার মত সাধারণ অল্পশিক্ষিতা ঘরের কোণায় বাড়িয়া ওঠা মেয়ে যা কিছু বুঝিতে, অনুভব করিতে ও উপভোগ করিতে পারে তারই ফেনা। ওর জন্য

জলকে সোডা ওয়াটারের মত সিদ্ধির সরবতকে মদের মত ফেনিল করিয়া তুলিতে হয় তাকে। নতুবা তাদের নাটক জমে না। নাটক না জমিলে অমলার মত তারও মনে হয় জীবনটা বৃথা হইয়া গেল, বাঁচিয়া থাকার কোন মানে রহিল না।

বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে নয়, পরদিন থিয়েটার দেখিতে গেল সূর্য্যকান্ত। অমলা ও বাড়ীর অন্য মেয়েরাও অবশ্য সঙ্গে গেল। থিয়েটারে তাই দুজনের মধ্যে দু'একবার দৃষ্টি-বিনিময় ছাড়া কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না। রাত তিনটার বাড়ী ফিরিয়া নিদ্রাতুর দুজনে দু'একটি কথা বলিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সূর্য্যকান্ত বাড়ীতেই রহিল বটে কিন্তু আগের রাত্রে বাহিরের আসল নাটক দেখিয়া আসার জন্যই সম্ভবতঃ সেদিন রাত্রে ঘরোয়া নাটক তাদের তেমন জমিল না, দারুণ অস্বস্তি মনে লইয়া দু'জনে সে রাত্রে ঘুমাইল। পরদিন অমলার সেজ ননদকে স্বামীর কাছে রাখিয়া আসিতে সূর্য্যকান্ত চলিয়া গেল পাটনা। কাজটা অমলার দেবর করিতে পারিত—তাই ঠিক ছিল আগে, শুধু দিন তিনেক তার কলেজ কামাই হইত। তিনদিন তাকে ছাড়িয়া থাকার চেয়ে ভাইএর তিনদিন কলেজ কামাই হওয়াকে সূর্য্যকান্ত যে বড় মনে করিল এতে কি মর্ম্মান্তিক আঘাতই অমলার মনে লাগিল! তাও, ভাগ্নের সঙ্গে যখন সেজ ননদকে পাঠানো চলিত, সেজ ননদের স্বামীকেও যখন লেখা চলিত যে, আসিয়া লইয়া যাও। ভাগ্নে অবশ্য খুব ছেলেমানুষ, সেজ ননদের স্বামী অবশ্য অনেক চেষ্টা করিয়াও ছুটি পায় নাই—তবু মনে আঘাত লাগা তো এসব যুক্তি মানে না! তারপর তিনদিন পরে যখন অমলার বদলে অমলার দেবরের নামে একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি আসিল সূর্য্যকান্তর যে, এখানে ওখানে,

সে একটু বেড়াইবে এবং ফিরিতে তার দেরী হইবে, অমলার চোখে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল স্বামী তাকে ত্যাগ করিয়াছে। হঠাৎ তাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া একবার যেমন ত্যাগ করিয়াছিল, এবার নিজে বোনের শ্বশুর বাড়ী গিয়া আবার তেমনি ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সেবার এখানে ফেরামাত্র স্বামীকে সে ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবার স্বামী তার ফিরিয়া আসিলেও তাকে আর সে ফিরিয়া পাইবে না। অনুপযুক্তা বৌটাকে জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য না থাকিলে এত লোক থাকিতে সে কেন যাচিয়া পাটনা যাইতে চাহিবে, তার সজল চোখের বারণ মানিবে না? হায়, একখানা চিঠিও যে সে লিখিল না অমলাকে!

তিন চারদিন পরেই আগ্রা হইতে চিঠি আসিল বটে, বেশ বড় চিঠি, ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রায় একপাতা। কাগজ দেখিয়া আর 'কল্যাণীয়াষু' সম্বোধন দেখিয়াই অমলা বুঝিতে পারিল এ চিঠি চিঠিই নয়, পরিত্যক্তা স্ত্রীর সঙ্গে এ শুধু সূর্য্যকান্তের ভদ্রতা। কি লিখিয়াছে সূর্য্যকান্ত? কিছুই নয়! অমলাকে সে একটা ভ্রমণ-কাহিনী পাঠাইয়া দিয়াছে। শুধু গোড়ায় একটা অর্থহীন কৈফিয়ৎ দিয়াছে হঠাৎ তার বেড়ানোর সখ জাগিল কেন এবং শেষে লিখিয়াছে অমলাকে সাবধানে থাকিতে, সময় মত খাওয়া-দাওয়া করিতে, শরীরের দিকে নজর রাখিতে, বাড়ী ফিরিয়া সে যদি অমলাকে বেশ মোটা-সোটা দ্যাখে তবে তার কত আনন্দ হইবে—এই কথা। তারপর ভালবাসা জানাইয়াই ইতি এবং সে যে শুধু অমলারই এই মিথ্যা ঘোষণা।

ঘরে খিল দিয়া চিঠি পড়িয়াছিল অমলা, পাঁচঘণ্টা পরে সে খিল খুলিল। পাংশু বিবর্ণ তার মুখ, চোখ দুটি লাল। অসুখের কথা সকলে বিশ্বাস করিল, কেবল অমলার ছোট ননদ, যার বিবাহের বয়স হইয়াছে

এবং সূর্য্যকান্তের মত সাহিত্যিকদের উপন্যাস পড়িয়া যার আজকাল বুক ধড়ফড় করে সে শুধু বলিল—বিরহ নাকি বৌদি ? চিঠি তো এল আজ। দাও না চিঠিখানা লক্ষী বৌদি ভাই, দেখি দাদা কি লিখেছে। সারাদিন ধরে পড়লে চিঠি, খেলে না দেলে না —

বিরহ ? ওসব তুচ্ছ মৃদু বেদনা বোধ করিবার শক্তি অমলার আর ছিল না। আর কি তার সন্দেহ আছে যে সূর্য্যকান্তর হঠাৎ পাটনা যাওয়া ও এত দেরী করিয়া বাড়ী ফেরা তাকে ত্যাগ করারই ভূমিকা ? রামধনুর অপর্ণাকে তার সাধারণ অনুপযুক্ত স্বামী যে কারণে ত্যাগ করিয়াছিল, তার ঠিক উল্টা কারণে। নিজের বিবাহিত জীবনকে ও বিবাহিত জীবনের বাছা বাছা ছোট বড় ঘটনাকে অমলা তার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সূর্য্যকান্ত তাকে বিবাহ করিয়াছিল, তাই গতবার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত তাকে সে ভালবাসে নাই, তার বুকে ভালবাসা জাগাইবার চেষ্টাও করে নাই, বরং বাধাই দিয়াছে। অমলার ভালবাসা তখন সে চাহিত না, আর একজনের স্মৃতি (উনিশ বছর বয়সে একটা ছেলেমানুষী ভুল করার কাহিনীতে সে যার নাম করিয়াছিল তারই স্মৃতি কি না কে জানে !) বুকে পুষিয়া রাখিয়াছিল, নিজেকে ধরা দেয় নাই। অথবা সে অপেক্ষা করিতেছিল যে তাকে জয় করিয়া অমলা নিজের উপযুক্ততার প্রমাণ দিবে : মাঝে মাঝে দেখা হইয়া নয়, দিবারাত্রি একসঙ্গে বাস করিয়াও অমলা যদি তার বুকে ভালবাসা না জাগাইতে পারে, কোন গুণে তবে সে তার মত দেশ-বিখ্যাত সাহিত্যিকের বৌ হইয়া থাকিবে ? তারপর তাকে বাপের বাড়ী পাঠানোর নামে ত্যাগ করিয়া বুঝি একটু মায়া হইয়াছিল সূর্য্যকান্তর, ভাবিযাছিল সবদিক দিয়া নিজেকে অমলার কাছে সঁপিয়া দিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে অমলা তাকে বাঁধিতে পারে কি না। তাও যখন সে

পারিল না, তখন আর পাটনা যাওয়ার ছলে তাকে ত্যাগ করা ছাড়া কি উপায় ছিল সূর্য্যকান্তর।

অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিয়া ত্যাগ হয়ত সে করিবে না, এখানে থাকিতে দিবে। আগের মত থাকিতে দিবে, গম্ভীর্য্য ও সহজ ব্যবহারের ব্যবধান রচিয়া। মৃদু একটু স্নেহ মমতা সে পাইবে, আর কিছুই নয়। এ জীবনে একটি রাত্রিও আর অমলার আসিবে না স্বামীর যখন সে নাগাল পাইবে, স্বামী যখন তাকে ভালবাসিবে।

আগে, বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার আগে, অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে এইসব কথা হয়ত অমলার মনে আসিত কিন্তু আসিত কল্পনার রথে। হাজার সে বিচলিত হোক তার নারী-মস্তিষ্কের স্বভাবত ও অপরিবর্ত্তনীয় হিসাব করার প্রবৃত্তি, যা বাস্তবতা ও বাস্তব লাভ-লোকসানের হিসাব ছাড়া আর কিছুই মানে না, তাকে কখন ভুলিতে দিত না যে তার এইসব উদ্ভট বিশ্লেষণ সাংসারিক রীতি নীতির বিরুদ্ধ, এ তার পাগলামী, তার নারী-জীবনের প্রকৃত সার্থকতাগুলির একটাও এইসব কারণে আসিতে বাধা পাইবে না। বরং এই উপলক্ষে একটা নূতন ধরণের মান অভিমানের পালা গাহিয়া আরও সে নিবিড়ভাবে বাঁধিতে পারিবে তার স্বামীকে। কিন্তু অস্বাভাবিক ও মারাত্মক ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে তার আত্মরক্ষার এই স্বাভাবিক ব্রহ্মাস্ত্রটি সূর্য্যকান্ত অব্যবহার্য্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।' যা ছিল অমলার শুধু কল্পনা ও হৃদয়োচ্ছ্বাস, কয়েক বছরের মধ্যে সংসারের ঢের বেশী গুরুতর ও ঢের বেশী প্রিয়তর ভাবনা-চিন্তার তলে যা কোথায় তলাইয়া যাইত, নিজের অপরিমেয় অস্থায়ী পাগলামী দিয়া সূর্য্যকান্ত তাকেই অমলার কাছে দিয়া গিয়াছে সত্য ও বাস্তবতার রূপ। জীবনে নভেলী আবহাওয়া থাকে না জানিত বলিয়াই নিজের জীবনকে একটু নভেলী করার জন্য অমলার অদম্য পিপাসা

জাগিয়াছিল, বিশেষতঃ সে যখন মনে করিয়াছিল যে সূর্য্যকান্তের মত নামকরা সাহিত্যিকের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় জীবনটাকে ওরকম করার একটা দুষ্প্রাপ্য ও বিশিষ্ট সুযোগ পাইয়াছে। জীবনটা কাব্যময় করার সুযোগ, কাব্যকে জীবন করার নয়। অমলা তো সামান্যা স্ত্রীলোক, কাব্য ও জীবনের এই পার্থক্য জানা থাকে বলিয়াই কবি পর্য্যন্ত এ জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সূর্য্যকান্ত সব ভণ্ডুল করিয়া দিয়া গিয়াছে। কবিত্ব করিতে গিয়া স্বামীর কাছে প্রশ্রয় না পাইয়া আগে কাঁদিয়াও সে সুখ পাইত, কারণ তাও ছিল এক ধরণের কাব্য। বাহুল্য কল্পনা ব্যাহত হইয়া বাহুল্য ব্যথা আসিয়া জীবনকে অমলার রঙিন তুলিতে বসালো। এখন বাহুল্যতা ঘুচিয়াছে, রস হইয়াছে বিষ। একটা বোঝাপড়া যদি করিয়া যাইত সূর্য্যকান্ত, ভাববার একটা নতুন খোরাক যদি সে দিয়া যাইত অমলাকে। শুধু এইটুকু যদি অমলা কোন রকমে ভুলিতে পারিত যে ইদানীং সূর্য্যকান্ত যখন তাকে অজস্র পরিমাণে স্বর্গের সুধা আনিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাকে সে সহ্য করিতে পারিত না, কাছে আসিতে ভয় করিত। হা ভগবান। সাধে কি স্বামী তার হাল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে।

সময়ে স্নানাহার হয় না, রাতে ভাল ঘুম হয় না, জীবনের গোড়াটাই যেন আলগা হইয়া গিয়াছে অমলার। কথা বলিতে কষ্ট হয়। মানুষ কাছে থাকিলে বোধ হয় বিরক্তি। শোক। কেউ কিছু বলিতে সাহস পায় না, এ বিরহিনী উন্মাদিনীকে কে ঘাটাইবে? নিজের মনে থাকে অমলা, অনেকটা স্বাধীনভাবেই নিজের মনের বিকারকে ব্যবহার করে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সহর হইতে সূর্য্যকান্তর চিঠি আসে, কখনও অমলার নামে—কখনও বাড়ীর অন্য কারো নামে। প্রত্যেকটি চিঠি অমলাকে আঘাত করে। অমলার বিকৃত জগতে যা কিছু দামী সে সব কোন

কথাই চিঠিতে থাকে না, শুধু বাজে অবান্তর কথা। সূর্য্যকান্তর কাছে অমলার তুচ্ছতাই শুধু প্রমাণ করে চিঠিগুলি, আত্মগ্লানির আলোড়ন তুলিয়া দেয় মনে। একদিন প্রায় সমস্ত রাত জাগিয়া অমলা একখানা চিঠি লেখে সূর্য্যকান্তকে, আর একবার সে তাকে সুযোগ দিক, আর একটিবার, এবার যদি অমলা তার উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী হইতে না পারে তবে বিষ খাইয়া হোক, গলায় দড়ি দিয়া হোক ইত্যাদি। দশ দিন পরে মাদ্রাজ হইতে এ চিঠির জবাব আসিল। অমলার চিঠি পাইয়া সূর্য্যকান্ত নাকি খুব খুসী হইয়াছে, তবে ওসব আবোল-তাবোল কথা কি ভাবিতে আছে, ছি। অমলা যে তার উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী নয় এ ধারণা তার কোথা হইতে আসিল ভাবিয়া সেই মাদ্রাজের একটা হোটেলের ঘরে বসিয়া সূর্য্যকান্ত এমন অবাক হইয়া যাইতেছে যে —

এদিকে আরও একমাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়াছে সূর্য্যকান্ত। আরও কিছুদিন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিবে। অমলা যেন খুব সাবধানে থাকে, কেমন ?

হাসিতে হাসিতে দম আটকাইয়া আসে অমলার, মুখ দিয়া ফেণা বাহির হয়, হাত-পা ছুঁড়িবার ভঙ্গী দেখিয়া ভয় হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বুঝি খসিয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িবে। পালিয়ে পালিয়ে কতকাল বেড়াবে ঠাকুরঝি—বলে, আর ধনুকের মত বাকা হইয়া অমলা হাসে। ব্লাউজের বোতামগুলি পট পট করিয়া ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া রাগে অমলা ব্লাউজটাই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, গায়ে আঁচলটুকু পর্য্যন্ত রাখিতে চায় না। বড়-জা চেঁচায়, ছোট ননদ কাঁদে, দেবর মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢালে, ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া পিসী যে কি বলে বোঝা যায় না, বাকী সকলে

ঝাকরে অথবা বলে—তার কোন মানে থাকে না। শেষে সকলে মিলিয়া চাপিয়া ধরে অমলাকে, অমলাও বড়-জার হাতে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দেয়। অতি কষ্টে কামড় ছাড়াইয়া দিবার পর এতজোরে তার দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায় যে শরীরের আর কোথাও বোধ হয় একটুও শক্তি অবশিষ্ট থাকে না, সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া যায়।

এই প্রথমবার। দ্বিতীয়বার হয়—জরুরি টেলিগ্রাম পাইয়া সূর্য্যকান্ত ফিরিয়া আসিবামাত্র। তবে এবার হাসি দিয়া আরম্ভ হয় না, আরম্ভ হয় কলহে। কার হুকুমে সূর্য্যকান্ত ফিরিয়া আসিল বলিয়া অমলা কলহ আরম্ভ করে, চীৎকার করিয়া গালাগালি দেয়, মুখে ফেণা তোলে, হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়, তারপর দাঁতে দাঁত লাগাইয়া হইয়া যায় শিথিল।

এবার সকলে ব্যস্ত হয় কম। এমন কি অমলার মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে তাকে এ বাড়ীতে গছানোর জন্য বড়-জা তার বাপ-দাদার নিন্দাও করে।

সূর্য্যকান্ত বলে, তিন বছর বয়েস যখন ভাঁড়িয়েছিল, এ রোগের কথা গোপন করবে তা আর বেশী কি। এ্যাদ্দিন হয়নি কেন তাই আশ্চর্য্য।

কথাগুলি অমলা শুনিতে পায় না। রাত্রে সে তাই চুপি চুপি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলছ তোমার মন কেমন করত? কেন তবে ফেলে পালিয়ে গেলে আমাকে? পাটনা থেকে কেন ফিরে এলে না?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কি হইবে? হিষ্টিরিয়া ভাবপ্রবণতা নয়, ও একটা রোগ।

বিপত্নীকের বৌ

প্রতিমার বাবা নেহাৎ গরীব নন, প্রতিমাকেও দেখিতে নেহাৎ খাবাপ বলা যায় না। আরও কিছুদিন চেষ্টা করিলে বিবাহের অভিজ্ঞতাবিহীন ভাল একটি কুমার বর তার জন্য অবশ্যই যোগাড় করা যাইত। তবু বিপত্নীক রমেশের হাতে তাকে সমর্পণ করাই বাপ মা ভাল মনে করিলেন। একবার বিবাহ হইয়াছিল এবং বছর ছয়েক বয়সের একটি ছেলে আছে এ দুটি খুঁত ছাড়া পাত্র-হিসাবে রমেশের তুলনা হয় না। মোটে একত্রিশ বছর বয়স, দেখিতে খুবই সুপুরুষ, তিনশ টাকা মাহিনার সরকারী চাকরী। উচ্চশিক্ষা, নম্রস্বভাব, সদ্বংশের গৌরব এ সবের অভাবও রমেশের নাই। এমন পাত্র হাতছাড়া করিবে কে ?

রমেশ নিজেই মেয়ে দেখিতে গিয়াছিল, বিবাহের আগে প্রতিমাও সুতরাং তাকে দেখিয়াছিল। দোজবরে শুনিয়া অবধি অদেখা ভাবী বরটির প্রতি প্রতিমার মনে যতখানি বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল, রমেশের সুন্দর চেহারা দেখিয়া তা কমিয়া যাওয়াই ছিল উচিত। তা কিন্তু গেল না। বিরুদ্ধভাবটা যেন বাড়িয়াই গিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত মনের বিরূপভাবটা ছিল একটি কাল্পনিক ব্যক্তির উপর, অতএব সেটা তেমন জোরালো হইয়া উঠিতে পারে নাই। রমেশকে দেখিবার পর, সে অসাধারণ রূপবান পুরুষ বলিয়াই

আর একটি মেয়ে যে চার পাঁচ বছর ধরিয়া তাকে ভোগ দখল করিয়াছিল, এ ব্যাপারটা প্রতিমার মনে ভয়ানক অশ্লীল হইয়া উঠিল। এর কারণটা জটিল। রমেশের আর কোন পরিচয় ত সে তখনো পায় নাই, শুধু বাহিরটা দেখিয়াছিল। আগের স্ত্রীর সঙ্গে বাহিরের এই রূপ সংক্রান্ত সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক কল্পনা করা প্রতিমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাবী বরের কথা ভাবিতে গেলেই লোকটা তার মনে উদিত হইত দেদীপ্যমান কামনার মত ঈষৎ স্থূলাঙ্গী এক রমণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়। বিতৃষ্ণায় প্রতিমার পবিত্র কুমারী দেহে কাঁটা দিয়া উঠিত।

স্বামীর সম্বন্ধে প্রতিমার এই অশুচিবোধ অনেকটা কাটিয়া গেল, স্বামীগৃহে মৃতা সতীনের একখানা বড়ো ফটো দেখিয়া। না, সেরকম মূর্ত্তি বৌটার ছিল না যাকে দেখিলেই টের পাওয়া যায় রূপবান স্বামীকে ক্লেদাক্ত বাহুতে দিবারাত্রি বাঁধিয়া রাখা ছাড়া আর কিছু সে জানে না। গোলগাল হাসি-হাসি মুখখানা, ভাসাভাসা চোখে সরল শান্ত দৃষ্টি, কোলে বছর দুয়েকের একটি ছেলে,—নড়িয়া যাওয়ায় ফটোতে মুখখানা ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে। কাপড় পরিবার ভঙ্গি, দাঁড়ানোর ভঙ্গি সব মিলিয়া প্রমাণ করিতেছে বৌটি ছিল নেহাৎ গোবেচারী, ভালমানুষ। রমেশের বৌ বলিয়া যেন ভাবাই যায় না।

ফটোখানা প্রতিমা দেখিল দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে গিয়া প্রথমদিন দুপুর-বেলা, রাত্রে রমেশের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই। বিবাহের পর প্রথম দফায় যে কদিন তাদের দেখাশোনা হইয়াছিল তার মধ্যে রমেশ একেবারেই স্ত্রীর কাছে ঘেঁসিবার চেষ্টা করে নাই তাই রক্ষা, সুন্দর স্বামী-টির উপর যে নিবিড় ঘৃণার ভাব প্রতিমার মনে তখন ছিল, একটা সে কেলেঙ্কারি করিয়া বসিতে পারিত। এবার মানসীর ফটোখানা দেখিয়া মন একটু সুস্থ হওয়ায় রাত্রে রমেশ আলাপ করিবার চেষ্টা করিলে

দু'চারটে প্রশ্নের জবাব দিতে প্রতিমা কার্পণ্য করিল না। রমেশের মৃদু কণ্ঠ, শান্তভাব ও উদাসীনের মত কথা বলিবার ভঙ্গি ভালই লাগিল প্রতিমার। কে জানে কি ভাবিতেছে লোকটা?—একেবারে অন্যমনস্ক! ভাবিতেও তাহা হইলে জানে? রং-করা সং-এর মত চেহারাটাই সর্ব্বস্ব নয়? গালে ওই দাগটা কিসের? আহা, দাড়ি কামাইতে গিয়া গালটা এতখানি কাটিয়া ফেলিয়াছে!

রাত বাড়ে, প্রতিমার ঘুম পায়, শয়নের কথা রমেশ কিছুই বলে না। খাটের এক প্রান্তে সে এবং অপর প্রান্তে প্রতিমা পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে তো বসিয়াই থাকে। কি রকম মানুষ? প্রতিমা যেরকম ভাবিয়াছিল সেরকম তো নয়! একটু যেন রহস্যের আবরণ আছে চারিদিকে। রমেশ এক সময় বলিল, আগে থেকে এ সব বলে নেওয়াই ভাল, কি বল? তুমি তাহলে আমাকে বুঝতে পারবে, আমিও তোমাকে বুঝতে পারব।

কি সব বলিয়া নেওয়া ভাল? প্রতিমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তবু ঘাড় কাত করিয়া সে সায় দিল। শোনাই যাক স্বামীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণটা কি রকম হয়!

রমেশ বলিল, কেন আবার বিয়ে করলাম বলি। সহজে করতাম না। পাঁচ বছর এক জনের সঙ্গে ঘরকন্না করে আবার আরেক জনের সঙ্গে,— তুমি নিশ্চয় আমাকে অশ্রদ্ধা করছ। করছ না?

প্রতিমা ভদ্রতা করিয়া বলিল, না! তা কেন করব?

রমেশ বলিল, করছ বৈকি। সব শুনলে কিন্তু তোমার মায়াই হবে। হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে ও যখন মরে গেল, শোকে আমি যেন কিরকম হয়ে গেলাম। বেঁচে থাকতে কখনো ভাবিনি এতখানি আঘাত পাব। সময়ে মনটা সুস্থ হবে ভেবেছিলাম, তাও হল না। কোন কাজে

মন বসে না, মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না, কর্ত্তব্যগুলি না করলে নয় তাই করে যাই, কিন্তু কি যে কষ্ট হয় তা কি বলব। কতদিকে আমার কত রকম দায়িত্ব আছে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারবে, আর কারো ওপর যে ওসব ভার দেব সে উপায়ও আমার নেই, আমি না দেখলে চারিদিকে অনিষ্ট ঘটবে। অথচ আমার মনের অবস্থা এরকম যে হাত-পা ছেড়ে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে বেশী। আগে বাড়ীতে সকলের ছিল হাসিখুসীর ভাব, এখন আমি মনমরা হয়ে থাকি বলে কেউ আর প্রাণখুলে হাসতে পারে না, বাড়ীতে কেমন একটা নিরানন্দের ভাব ঘনিয়ে এসেছে। মেজাজটাও গিয়েছে বিগড়ে, কথায় কথায় ধমকে উঠি, সেজন্যও বাড়াশুদ্ধ লোক কেমন ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। ছেলেটা পর্য্যন্ত সহজে আমার কাছে ঘেঁষতে চায় না। প্রথমে অত খেয়াল করিনি, তারপর কিছুদিন আগে টের পেলাম আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে সুন্দর জীবনট গড়ে তুলেছিলাম, আমার অবহেলায় তা ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছে। বড় অনুতাপ হল। আমার একার শোক আর দশজনের জীবনে ছায়া ফেলবে এতো উচিত নয়? এমন যদি হত যে সংসারে আমার কোন কর্ত্তব্য নেই, মনের অবস্থা আমার যেমন হোক কারো তাতে কিছু আসে যায় না, তাহলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু তা যখন নয়, শোক দুঃখ ভুলে আবার আমাকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। তাই ভেবে চিন্তে আবার তোমাকে—

এমন করিয়া বুঝাইয়া বলিলে শিশুও বুঝিতে পারে। প্রতিমা বুঝিতে পারিল, বিবাহ উপলক্ষে রমেশ যে ফ্যাশন করিয়া চুল ছাটিয়াছে, গোঁপ-দাড়ি কামাইয় মুখখানা চকচকে করিয়াছে ওসব কিছু নয়। হাতকাটা ছোট সার্টটি পরায় ওকে যতই কলেজের ছেলের মত দেখাক, আড়ালের মনটি সংসারী, হিসাবী, সতর্ক, উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতা কল্পনা প্রভৃতির বদলে সুবিবেচনায় ঠাসা। প্রথমা স্ত্রীকে ভুলিবার জন্য নয়, ভোলা প্রয়োজন

বলিয়া আবার সে বিবাহ করিয়াছে। পাঁচ বছর যার সঙ্গে ঘরকন্না করিয়াছিল তার জন্য শোক করিতে করিতে জীবনটা কাটাইয়া দিবারই প্রবল বাসনা, কিন্তু কি করিবে, আর দশজনের মুখ চাহিয়া শোকটা কমানো অপরিহার্য্য একটা কর্ত্তব্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং এতো জানা কথাই যে রমেশ বিশেষরূপে কর্ত্তব্যপরায়ণ।

কিন্তু তাকে করিতে হইবে কি? ভিজা ন্যাকড়ায় শ্লেটের লেখা মোছার মত রসালো ভালবাসায় স্বামীর মনের স্মৃতিরেখা মুছিয়া দিতে হইবে? ঘুমের ঘোরটা প্রতিমার কাটিয়া যায়। রমেশের গম্ভীর বিষণ্ণ মুখখানা এক নজর দেখিয়া সে ভাবিতে থাকে যে, এসব কথা তাকে বলিবার কি প্রয়োজন ছিল, এ কোন্‌দেশী বোঝাপড়া! তার যেটুকু রূপযৌবন আর মানুষ ভোলানোর ক্ষমতা আছে তার এক কণা কি সে বাপের বাড়ী ফেলিয়া আসিয়াছে? আস্ত মানুষটা সে আসিয়া হাজির, যে দরকারেই লাগাও বাধা দিতে বসিবে না। কে জানে রমেশ ভাবিয়া রাখিয়াছে কিনা যে মেয়েদের একটা গোপন রিজার্ভ ফণ্ড থাকে স্নেহ মমতা ও মাধুর্য্য-রচনা শক্তির, আগে হইতে বলিয়া রাখিলে ওখান হইতে প্রয়োজন মত আমদানী করিয়া বিশেষ অবস্থায় বিশেষ একটি মানুষের শোকের তপস্যা মেয়েরা ভঙ্গ করিতে পারে।

এও প্রতিমা বুঝিতে পারে না যে দশজনের মুখ চাহিয়া প্রথমা স্ত্রীকে ভুলিবার জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া অশ্রদ্ধার বদলে তার মায়া হওয়া উচিত কেন। আত্মীয়স্বজন, দায়িত্ব, কর্ত্তব্য এইসব যাকে শোক ভুলাইতে পারে নাই, একটি স্ত্রী পাওয়া মাত্র সে আনন্দে ডগমগ হইয়া আবার বাঁচিয়া থাকার স্বাদ পাইতে আরম্ভ করিবে, এতো শ্রদ্ধা জাগানোর মত কথা নয়! স্ত্রীর প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করার চেয়ে এ ঢের বেশী মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয়!

আরও অনেক কথা রমেশ সে রাত্রে বলিয়া গেল; রাত তিনটার আগে তারা ঘুমাইল না। বাড়ীর লোকে টের পাইয়া ভারি খুসী। এ পর্য্যন্ত নববধূর সঙ্গে সে ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত বলে নাই জানিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাড়ীতে অনেক লোক, অনেক কাজ, অনেক বৈচিত্র। হৃদয়ে হৃদয়ে রকমারি স্নেহের ফাঁদ পাতা আছে। প্রতিমাকে আটক করিবার চেষ্টার কেহ কসুর করিল না। বৌকে যে কোন বাড়ীতে এত খাতির করে প্রতিমার সে ধারণা ছিল না। সকলের কাছেই সে যেন অশেষরূপে মূল্যবান। কাজ তাহাকে করিতে দেওয়া হয় না, সংসারের গোলমাল হইতে তাহাকে তফাতে তফাতে রাখা হয়। রমেশের সৌখীন সেবাটুকু ছাড়া প্রতিমার কোন কর্ত্তব্য নাই। দিন রাত্রে সব সময় সে যাতে স্বামী-সন্দর্শনের সুযোগ পায় বাড়ীর ছেলেবুড়ো যেন তারই ষড়যন্ত্র করিয়া মরে। প্রতিমার বুঝিতে বাকী থাকে না সকলে কি চায়। এক বছর আগে মরিয়া যে বৌ আজও এ গৃহের জড়বস্তুতে ও বিভিন্ন চেতনায় অক্ষয় অমর হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাড়াতাড়ি তাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। সে যে বিপুল ফাঁকটা রাখিয়া গিয়াছে শীঘ্র ভরাট হইয়া ওঠা চাই। রান্না খাওয়া প্রভৃতি নিত্যকার তুচ্ছ সংসারিক কাজে নিজেকে একবিন্দু ক্ষয় করিবার প্রয়োজন প্রতিমার নাই, যা কিছু তার আছে একমনে সব সে ব্যয় করুক মৃতা সতীনের শূন্য সিংহাসনে আত্মাভিষেকের আয়োজনে। হাসি-গল্পে-গানে-বাজনায় উথলিয়া উঠিয়া রমেশকে সে ভাসাইয়া লইয়া যাক, তার ভাঙ্গা বুক জোড়া লাগিয়া দেখা দিক আনন্দ, উৎসাহ, প্রণয়ের প্রাচুর্য্য। হাসি চাই, হাসি! অম্লান, অপর্য্যাপ্ত হাসি!

হাসি প্রতিমার আসে না, মাধুর্য্য শুকাইয়া ওঠে। এমন ছিল নাকি তার সতীন, এই ক্ষুদ্র পারিবারিক সাম্রাজ্যে এতবড় প্রাতঃস্মরণীয়া সম্রাজ্ঞী? রমেশ হইতে বাড়ীর দাসীটির মন পর্য্যন্ত এমন ভাবে সে জুড়িয়াছিল? এমন অসহ্য বেদনা সে রাখিয়া গিয়াছে যে মুক্তিলাভের জন্য বাড়ীশুদ্ধ লোক এতখানি পাগল? সকলে যত ব্যাকুল হইয়া নীরবে তাহাকে প্রার্থনা জানায়, ভুলাও ভুলাও, সে মায়াবিনীকে ভুলাইয়া দেও, প্রতিমার তত মনে পড়ে সতীনকে। কি মন্ত্র না জানি জানিত সেই গোলগাল মুখওলা বৌটি।

ননদ নন্দা বলে, কেন মুখ ভার করে আছ, বৌদি ভাই? বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে? বলত আজকে তোমার যাবার ব্যবস্থা করে দিই, দুদিন থেকে মন ভাল করে এসো। তোমার শুকনো মুখ দেখলে আমাদের যে তাকে মনে পড়ে বৌদি? বাপের অসুখ শুনেও তাকে আমরা পাঠাই নি, দুদিন ধরে চোখের জল ফেলেছিল। তাই না আমাদের এমন শাস্তি দিয়ে চলে গেল!

এ আরেকটা দিক। প্রতিমা মুখ ভার করিলে তার কথা সকলের মনে পড়িয়া যায়, প্রতিমা হাসিলে সকলে অবাক হইয়া বলে, ওমা এযে অবিকল সেই আবাগীর হাসি গো? নানা লোকে মৃতা সতীনটির সঙ্গে প্রতিমার নানারকম সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। পিছন হইতে দেখিলে প্রতিমার চলন যে তার মত দেখায় এটা আবিষ্কার করে ছোট বৌ বিমলা। তার বালা আর তার চুড়ি যে আশ্চর্য্য রকম মানাইয়াছে প্রতিমার হাতে, এটা আবিষ্কার করে আরেক ননদ মন্দা। বিধবা একজন পিসী থাকেন বাড়ীতে, তার আবিষ্কারগুলি আরও ব্যাপক ও গুরুতর। প্রখর দৃষ্টিতে তিনি প্রতিমার প্রত্যেকটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করেন, বলেন, ও মন্দা, ও নন্দা স্থাখ্‌সে। বৌ-এর চিবুক স্থাখ, গলা স্থাখ, ছুঁচোলো কনুই

ত্থাখ্! বাঁকাও দিকি বৌ হাতখানা?—দেখলি নন্দা, ও মন্দা দেখলি!

কোমরের বঙ্কিম ভঙ্গি, আল্‌তা-পরা পায়ের গোড়ালি, ভ্রূ আর কানের মাঝখানের অংশটা সব প্রতিমা সেই একজনের কাছে ধার করিয়াছে! সমগ্রভাবে দেখিলে প্রতিমা অবশ্য অন্যরকম, সে ছিল দিব্যি মোটাসোটা রাজরাণীর মত জমকালো, প্রতিমা ক্ষীণাঙ্গী। তবু পিসীর মত শ্যেন দৃষ্টিতে প্রতিমার দেহটা নানা অংশে ভাগ করিয়া একবার সকলে মিলাইয়া ত্থাখোতো সেই হতভাগীর যে ছবি স্মৃতিপটে আঁকা আছে তার সঙ্গে! রমেশ যে এত মেয়ের মধ্যে প্রতিমাকেই পছন্দ করিয়াছে, সে কি এমনি? এই মিলের জন্য।

একদিন প্রতিমার হাত হইতে পাণ লইবার সময় রমেশ বলিল, জানো নতুন বৌ, তোমার আঙ্গুলগুলি ঠিক তার মত।

আঙ্গুলগুলি পর্য্যন্ত তার মত? রাগে প্রতিমার মন জ্বালা করিয়া উঠিল। রমেশের স্মৃতিময় আবেগকে রূঢ় আঘাত করিবার জন্য না-বোঝার ভাণ করিয়া বলিল, কার মত গো? আর কেউ আছে নাকি তোমার, ভালবাসার কেউ?

রমেশ চমক ভাঙ্গিয়া বলিল, কি বলছ? ছি! তোমার দিদির কথা বলছি।

আমার দিদিকে তুমি আবার দেখলে কোথায়? বিয়ের সময় সে তো আসে নি!

—সে নয়।—মানসী। তোমার নখগুলি যেমন ডগার দিকে ঢেউ তোলানো, মানসীরও এমনি ছিল।

এবার প্রতিমা মুখের কৌতুকোচ্ছলতার ছাপ মুছিয়া ফেলিল, বলিল, তোমার আগেকার বৌ? তাঁর নাম বুঝি মানসী ছিল?

রমেশ যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

—তুমি জানতে না? এ্যাদ্দিন এসেছ এখানে, তার নামটাও শুনে রাখ নি?

প্রতিমা ম্লানমুখে বলিল, কে বলবে বল? দিদির কথা কেউ আমাকে কিছু বলে না।

রমেশ সাগ্রহে বলিল, শুনবে নতুন বৌ? শুনবে তার কথা?

—শুনব, বল।

মানসীর কথা বলিতে বলিতে রমেশের গলা ধরিয়া আসে। প্রতিমার অপরিমিত ঈর্ষা হয়। মনে হয়, এ বাড়ীর সকলে তার সঙ্গে এক আশ্চর্য্য পরিহাস জুড়িয়াছে। মানসীকে ভুলিবার ছলে তাকে আনিয়া মানসীকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে তার মধ্যে। তার মৌলিকতা অচল এ বাড়ীতে, সে মানসীরই নূতন রূপ,—অচিন্ত্য অব্যক্ত দেবতার প্রতিকৃতির মত সেও সকলের নিরাকার ব্যাপক শোকের জীবন্ত প্রতিমা। মানসীর সঙ্গে সে সব দিক দিয়াই পৃথক, তবু মিলের তার অন্ত নাই। ব্যথায় পূজা নিবেদন করার জন্য সকলে তাকে মানসীর প্রতিনিধির মত খাড়া করিয়া দিয়াছে।

একদিন প্রতিমা স্বামীকে বলিল, খোকা কোথায় আছে?

রমেশ বলিল, বড় পিসীর ওখানে।

—আনবে না তাকে?

—তুমি বললেই আনব।

প্রতিমা অবাক হইয়া বলিল, আমার বলার জন্যই কি অপেক্ষা করছিলে? তোমাদের ব্যবহারে আমি সত্যি থ' বনে যাচ্ছি। কাউকে

একদিন খোকার কথা বলতে পর্য্যন্ত শুনলাম না এসে থেকে। কেন তা বুঝিনে কিছু।

রমেশ বলিল, আমি বারণ করে দিয়েছিলাম নতুন বৌ। এখানে তোমার মনটন বসলে তারপর—

—খোকার দিকে মন দেবার সময় পাব? কি চমৎকার বোঝ' তোমরা মানুষের মন!

দুদিন পরেই খোকা আসিল। বেশ মোটাসোটা লম্বাচওড়া ছেলে, কোলে করা কষ্টকর। তবু সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে দেখিয়া কোন রকমে প্রতিমা তাকে একবার কোলে করিল। বড় লজ্জা করিতে লাগিল প্রতিমার। প্রসব না করিয়াই সে এতবড় ছেলের মা? খোকাও নতুন লোকের কোলে উঠিয়া কাঠ হইয়া রহিল। পরের বাড়ীর ছেলের সঙ্গে ভাব করার মত করিয়া ছেলেকে যদি প্রতিমা আপন করিবার সুযোগ পাইত, মাতাপুত্রের প্রথম মিলনটা হয়ত এমন নীরস হইত না। কিন্তু সে যে মা এবং নতুন বৌ, হাসি আর ছেলে-মানুষী কথা দিয়া সুরু করিয়া দূর হইতে ধীরে ধীরে কাছে আগাইবার উপায় তো তার নাই, ছেলে কাছে আসিলে প্রথমেই বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া আধ ঘোমটার ফাঁকে তাকে চুমু খাওয়া চাই।

ছেলে তো আসিল, একটু মায়াও ওর দিকে প্রতিমার পড়িল, কিন্তু মৃতা সতীনের ছেলেও কম বিপজ্জনক পদার্থ নয়। একটা কঠিন সমস্যার মত। আদর যত্ন ভালবাসা সব সতর্কভাবে হিসাব করিয়া দিতে হয়, কম হইলে লোকে ভাবিবে, সতীনের ছেলে বলিয়া অবহেলা করিতেছে; বেশী হইলে ভাবিবে, সব লোক-দেখানো। আঠার বছর বয়সের ভাবপ্রবণ মনে এ ধরণের সতর্কতা বজায় রাখিয়া চলা কঠিন। হিসাবও সব সময় ঠিক হয় না: প্রাত্যহিক জীবনে পদে পদে এমনি

অভিনয় করিয়া চলিবার মত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সে পাইবে কোথায়। ছেলেকে ভাত খাওয়াইতে বসিয়া প্রতিমা যদি একটু সময়ের জন্য অন্য-মনস্ক হইয়া যায়, চমক ভাঙ্গিয়া সভয়ে সে চারিদিক লক্ষ্য করে, কেহ তাকে বিমনা দেখিয়াছে কিনা। খোকার অসংখ্য শিশুসুলভ অন্যায় আব্দার প্রতিমার অসংখ্য বিপদ। কি করিবে প্রতিমা ভাবিয়া পায় না। আব্দার রাখিলে খোকার ক্ষতি, তাতে নিন্দা হয়। না রাখিলে খোকা কাঁদে, তাতেও নিন্দা হয়। ভরা পেটে খোকার হাতে সন্দেশ দিয়া প্রতিমা শুনিতে পায়, শাশুড়ী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, ওর সে বিবেচনা কোত্থেকে হবে নন্দা যে বলছিস? নাড়ীর টান তো নেই।

পরদিন ভরা পেটে আবার সন্দেশের জন্য খোকা কাঁদে। প্রতিমা তাকে কাঁদায়, সন্দেশ দেয় না। মুখ ভার করিয়া পিসীমা আসিয়া খোকাকে কোলে নেন, ভাঁড়ার ঘরে খোকাকে সন্দেশ দেন, তারপর করেন স্থান ত্যাগ। প্রতিমার মুখ লাল হইয়া যায়।

খোকাকে উপলক্ষ করিয়া প্রতিমা বারে বারে ধরা পড়িতে থাকে, অতিরিক্ত স্নেহ যত্নের তলে তলে তার প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাবও সকলের আছে। এ বাড়ীর মনগুলি এতখানি তাকে [illegible] মত ব্যবহার করিতে পারে ততক্ষণ কৃতজ্ঞ ও সংযত হইয়া থাকে কিন্তু যখনি প্রতিমার একটি বিশিষ্ট [illegible] হইয়া ওঠে যাহা এ বাড়ীতে কারো কোন কাজে লাগিবার নয় প্রতিমাকে তখন সে আঘাত করে। তখন সে প্রতিমার সমালোচক।

দিন কাটে কিন্তু এর ব্যতিক্রম হয় না। প্রতিমার ঘোমটা কমিতে থাকে, চলা-ফেরায় স্বাধীনতা বাড়ে, সুখ-সুবিধার অতিরিক্ত কতগুলি ব্যবস্থা হয়, মানসীর সঙ্গে প্রতিমার মিল খুঁজিবার উৎসাহে সকলের ভাঁটা পড়ে, তবু না হয় প্রতিমার ব্যবহার কৃত্রিমতাহীন, না দেয় কেহ তাহাকে

বাঁচিবার জন্য একটি সহজ স্বাভাবিক জগৎ। আর একজনকে তার আসনে পাঁচ বছর বধূ জীবনের বিচিত্র তপস্যার ব্যাপৃত ছিল প্রতিমার জীবনকে এই সত্য অপ্রতিহতভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। একবার একমাসের জন্য বাপের বাড়ী ঘুরিয়া আসিল। খোকাকে সঙ্গে না আনা উচিত হইয়াছে কিনা ভাবিয়াই মাসটা কাটিল প্রতিমার। বাপের বাড়ীতেও মন খুলিয়া সকলের সঙ্গে সে মিশিতে পারিল না। একটা অদ্ভুত জ্বালাভরা আনন্দ উপভোগের জন্য সত্য মিথ্যা জড়াইয়া প্রাণপণে শ্বশুর-বাড়ীর নিন্দা করিল এবং সেজন্য সন্ত্রস্ত ও উন্মন হইয়া রহিল। কে কি ভাবিবে তাই ভাবিয়া ভাবিয়া কাজ করার অভ্যাসটা প্রায় স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল, বাপের বাড়ীতেও নিজের পাড়ার চেনাদের অনেকটা পরের ভাবনাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল, বিবাহের পর যেমন হয় প্রতিমা তেমনি হইয়াছে,—পর হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা আর সে প্রতিমা নাই।

তবু, সব প্রতিমার সহ্য হইত রমেশকে যদি সে ভালবাসিতে পারিত। ঘৃণার ভাব কোন কালে মুছিয়া গিয়াছিল, শ্রদ্ধা আসিতেও দেরী হয় নাই। রূপে গুণে মানুষটা অসাধারণ, সরল সহজ ব্যবহার, গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, রাগী কিন্তু সুবিবেচক। এ ধরণের পুরুষের সাহচর্য্য মেয়েদের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর, এদেরি তারা স্বেচ্ছাদাসী। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপালনে রমেশ খুব যে বেশী ত্রুটি করে তাও নয়, তবু স্বর্গীয়া সতীনের বিরুদ্ধে প্রতিমার অকারণ ঈর্ষা দাম্পত্য জীবনের সহজলভ্য সুখের পথেও কাঁটা দেয়। মানসীকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়া রমেশের পক্ষে এখনো সম্ভব নয়, আজও সে অন্যমনে তার কথা ভাবে, কণ্ঠলগ্না প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া আজও সে তারই কণ্ঠবেষ্টন করিতে যায়, যে কোথাও নাই। এক একদিন রমেশের চুম্বন পর্য্যন্ত অসমাপ্ত থাকিয়া

যায়, প্রতিমা স্পষ্ট অনুভব করে দাঁড়াইবার মত স্বামীর বাহুবন্ধন হঠাৎ শিথিল হইয়া গেল, নিভিয়া গেল চুম্বনের আবেগ। তা যাক, তাও হয়ত প্রতিমা গ্রাহ্য করিত না। হয়ত এই জন্যই সে স্বামীর মন জয় করিবার তপস্যা তীব্রতম করিয়া তুলিল, একটা মৃতা রমণীর কাছে হার মানিবার অপমান এ বয়সে সহ্য হয় না। কিন্তু জয় করিতেই অনেক বাধা, অনেক লজ্জাকর বেদনাদায়ক অন্তরায়। রমেশকে যখন সে মুগ্ধ করে, অতীতের দিক হইতে তার দৃষ্টি [illegible] বাহির [illegible] আনে নিজের দিকে, রমেশের প্রীতিপূর্ণ ভাষা ও স্নেহস্নিগ্ধ চাহনি [illegible] বদলে তাকে যেন অকথ্য লজ্জা দেয়। [illegible] এ চাহনি পুরাতন। [illegible] আজ সেই কথা সেই দৃষ্টি [illegible] পুরানো অভিনয়, অভ্যস্ত প্রণয় [illegible] এসব [illegible] ঘটিয়া গিয়াছে। [illegible] নয়।

আর জয় করিবার [illegible] প্রতিমা [illegible] যায়। [illegible] করিয়াছে। ক্ষোভে প্রতিমার চোখে [illegible] আসে, [illegible] অস্ত থাকে না। [illegible] ছিল সব পর্যবসিত হইয়াছে এক বিপন্ন বিস্বাদ [illegible] নয়, জীবনযাপনের অপরিচ্ছন্ন প্রয়োজনে।

[illegible] সময়ে স্বামী [illegible] ভাবটা পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য [illegible] আনে। [illegible] যদি অবিস্মরণীয় প্রেম তার মানসীর জন্য, এ কি [illegible] প্রতিমাকে সাময়িকভাবেও তার ভাল লাগিল? একজনের স্মৃতিপূজায় আত্মহারা অবস্থাতেও আর একজন যাকে মুগ্ধ করিতে পারে, শ্রদ্ধা করিবার মত কি আছে তার মধ্যে?

রমেশ জিজ্ঞাসা করে, এখানে তোমার মন টিঁকছে না কেন প্রতিমা?

প্রতিমা পাল্টা প্রশ্ন করে, আমার মনের খবর তোমাকে কে দিল?

—অন্যলোকের দিতে হবে কেন, আমি নিজে টের পাই না? মন খুলে যেন মিশতে পারছ না, কেমন ফুর্ত্তি নেই। কেউ কিছু বলে না তো তোমাকে? আদর যত্ন করে তো সকলে?

প্রতিমা হাসে, মাগো, তা আর করে না! আদর যত্নর চোটে হাঁপিয়ে উঠলাম: আমায় নিয়েই তো মেতে আছে সবাই।

রমেশ বলে, তুমি সবাইকে নিয়ে ওরকম মাততে পারলে বেশ হত! আমি তাই চেয়েছিলাম।

প্রতিমার ইচ্ছা হয় একবার জিজ্ঞাসা করে, আমার মন বসছে না বলছ, আমাকে কেন মনে ধরছে না তোমার? শুধু ভদ্রতা না করে ভালবাসা দিয়ে দ্যাখোনা মন বসে কিনা আমার!

সমস্ত বাড়ীতে মানসীর স্মৃতিচিহ্ন ছড়ানো, সেগুলি প্রতিমাকে পীড়ন করে। খান তিনেক বাঁধানো ফটোই আছে মানসীর। একখানা তার শয়নঘরে, একখানা রমেশ যে ঘরে কাজ করে সেখানে, আর একখানা শাশুড়ীর ঘরে। ফটোর মানসীকে দেখিয়া যদিও মনে হয় না সখ ও সৌখীনতার তার কোন বিশেষত্ব ছিল, হাতের যে রাশি রাশি শিল্পকর্ম্ম রাখিয়া গিয়াছে সেগুলি অবাক করিয়া দেয়। পাঁচ বছরে নানা কাজের ফাঁকে এত বাজে কাজের সময় সে পাইত কখন? বাড়ীর অর্দ্ধেকের বেশী আসবাবও নাকি তারই পছন্দ করিয়া কেনা। গান জানিত না, তবু সখ করিয়া সে অর্গান কিনাইয়াছিল, তাই বাজাইয়া আজ প্রতিমাকে গান গাহিতে হয়। মানসীর ড্রেসিং টেবিলে তার প্রসাধন, মানসীর কয়েকটি বাছা বাছা গহনা তার আভরণ, মানসীর ব্যবহৃত খাটে তার শয়ন। মানসীর জামাকাপড়ে বোঝাই বাক্স প্যাঁটরায় বাড়ী বোঝাই। আরও কত অসংখ্য খুঁটিনাটি সে যে রাখিয়া গিয়াছে!

বধূত্বের নতুনত্ব কমিয়া আসিলে মানসীর গয়না ক'খানা প্রতিমা খুলিয়া রাখিল। সকলে তা লক্ষ্য করিল, শাশুড়ী খুঁতখুঁত করিলেন তবে বিশেষ কেহ কিছু বলিল না। কিন্তু কয়েকটি গহনা খুলিয়া রাখিলে কি হইবে! ব্যবহার্য্য, অব্যবহার্য্য পদার্থ যত কিছু মানসী রাখিয়া গিয়াছে চারিদিকে, প্রকট হইয়া থাকা নিবারণ করিবে কে? মনের স্মৃতি, বাহিরের স্মৃতিচিহ্ন এ বাড়ীতে সে মৃতা রমণীকে অমরত্ব দিয়াছে।

নন্দা বলে, জান বৌদি, ওই যে আলমারিটা সাফ করে বাজে জিনিষ রাখছ, ওটা ছিল তার সখের সামগ্রী। ওপরের তাকে ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি সাজিয়ে রাখত, রোজ সকালে উঠে প্রণাম করত।

—ঠাকুর-দেবতারা গেল কোথায় ভাই?

—কে জানে দাদা কোথায় রেখেছে। মূর্ত্তিগুলোর ওপরে দাদা বড্ড রেগে গিয়েছিল সে স্বর্গে যাবার পর।

প্রতিমা বলে, সেই থেকে তোমার দাদার স্বভাবটা রাগী হয়ে গেছে, না ভাই?

নন্দা বলে, কেন, দাদা রাগারাগি করেছে নাকি তোমার সঙ্গে?

প্রতিমা হাসিয়া তার গাল টিপিয়া দেয়, বলে, বিয়ে হলে বুঝবে বরের রাগারাগিও কত মিষ্টি—শুধু মিষ্টি ব্যবহারের চেয়ে। একদিনও যদি রাগারাগি না হয় তবে বুঝবে বরের মনে কিছু গোলমাল আছে।

মৃতার জন্য স্বামীর মনের গোলমাল চিরস্থায়ী হইবে একথা প্রতিমা যে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিল সেটা আশ্চর্য্য নয়। স্বামী ভিন্ন যে কুলবধূর জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের পদার্পণ ঘটেনা, তার সরলতা অনিন্দ্য, সে বিশ্বাসী। বিবাহের পরেই স্বামীর ভালবাসার সুরুকে সে অনায়াসে ভালবাসার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে, প্রেমের পরবর্ত্তী অগ্রগতি তার জীবনের অফুরন্ত বিস্ময়। মানসীর

স্মৃতিতে রমেশকে মসগুল দেখিয়া কোন জ্ঞান আর অভিজ্ঞতায় প্রতিমা ভাবিতে পারিত মৃত্যু মৃত্যুই, স্মৃতি কর্পূরধর্ম্মী, জীবনে জীবিত ও জীবিতাদের আকর্ষণই সবচেয়ে জোরালো, যাকে মনে করিলে কষ্ট হয়, চিরকাল কেহ তাহাকে মনে করে না? ঈর্ষায় প্রতিমা যে মনের দল মেলিয়া ধরিল না তাতে রমেশের কাছে তার একটি রহস্যময় আবরণ রহিয়া গেল, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছোট বড় প্রকাশ রমেশকে তার সম্বন্ধে যত সচেতন করিয়া তুলিতে লাগিল, এই রহস্যের অনুভূতি তার মনের গোলমালের তত বেশী জোরালো প্রতিষেধক হইয়া উঠিতে লাগিল।

বছর ঘুরিয়া আসিতে আসিতে জন্মিয়া গেল কত অভ্যাস, সৃষ্টি হইল কত অভিনব রসাস্বাদ। মানসীর শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্য আসিয়া থাক প্রতিমা তো একটি নিজস্ব জগৎ সঙ্গে আনিয়াছে। মানসীর ফাঁকটাতে খাপে খাপে তাকে বসানো অসম্ভব। কোথাও প্রতিমা আঁটেন, কোথাও সে ছোট হয় মানসীর সঙ্গে তার যত বিরোধ, যত পার্থক্য সব দিনে দিনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। প্রতিমার দোষগুণ যে বিরক্তি ও ভাললাগা সৃষ্টি করে তার অভিনবত্ব বিচলিত করিয়া করিয়া সকলকে শেষে আর বিচলিত করে না, প্রতিমার দোষ গুণকে প্রতিমার দোষ গুণের মত করিয়াই সকলের মানিতে হয়। তা'ছাড়া মানসীর মত করিয়া পাইতে চাহিলে প্রতিমাকে কেহ পায় না, মানুষকে পাইতে চাহিয়া না পাইলে ভাল লাগিবার কথা নয়। অথচ প্রতিমার স্বকীয় আকর্ষণকে স্বীকার করিয়া কাছে গেলে বড় সুন্দর একটি হৃদয়ের পরিচয় মেলে।

যেভাবে মানসীর সঙ্গে সকলের অচ্ছেদ্য বন্ধনগুলি সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইভাবেই প্রতিমাও সকলকে বাঁধিতে ও বাঁধা পড়িতে থাকে। খোকা 'মা' বলিয়া ডাকিলে প্রতিমার আর একটা বিশ্রী অস্বস্তিকর অনুভূতি

জাগে না, মোটামুটি ভালই লাগে, যদিও ছেলেটার জন্য তার যে মায়া তাকে বাৎসল্য বলা যায় না। শাশুড়ী ননদ জা' এদের সঙ্গে বাড়ীর বৌএর যে সম্পর্ক আধখানা মন দিয়াই সুষ্ঠুভাবে তা বজায় রাখিতে পারা যায়, প্রতিমা সেটা দিতে পারে।

সবই যেন একরকম সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসে, শুধু রমেশকে প্রতিমা নিজের জীবনে মানাইয়া লইতে পারে না। প্রথম যেদিন সে বুঝিতে পারে, শীতের কুয়াশা কাটিবার মত রমেশের মন হইতে মানসীর শোক কাটিয়া যাইতেছে, তাহার ঈর্ষাতুর মনে সেদিন আনন্দের পরিবর্ত্তে গভীর বিষাদ ঘনাইয়া আসে। কেমন সে লজ্জা পায়। মনে হয়, নিজের তারুণ্য দিয়া এতকাল একটা অপবিত্র ব্রত পালন করিতেছিল, উদ্‌যাপনের দিন আসিয়াছে।

তাতো সে করে নাই? কতদিন মানসীর ফটোর সামনে দাঁড়াইয়া হিংসায় জ্বলিতে জ্বলিতে তার সাধ গিয়াছে ফটোখানা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, যেখানে যা কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে সে মানসীর, ভাঙ্গিয়া সব গুঁড়া করিয়া দেয়, কিন্তু যাচিয়া রমেশের মন হইতে তাকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা সে আর কতটুকু করিয়াছে?

দেবীপক্ষে প্রতিমার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের রাত্রি একদিন ঘুরিয়া আসিল। গোপনে রমেশ সেদিন ফুল আর সোনার উপহার কিনিয়া আনিল। গম্ভীর চাপা লোকটির মধ্যে একটা সুগভীর উত্তেজনা, আজিকার বিশিষ্ট রাত্রিটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার উৎসুক প্রত্যাশা সবই প্রতিমার কাছে ধরা পড়িয়া গেল। খুসী হইতে পারিল না। বোধ করিল মৃদু একটি বিস্ময়, একটা গ্লানিকর অস্বস্তি।

কি ভাবিয়া রমেশের-আনা ফুলের মালা একটি প্রতিমা মানসীর ফটো বেষ্টন করিয়া টাঙ্গাইয়া দিল। দীর্ঘকালের তীব্র উত্তপ্ত ঈর্ষায় প্রতিমার

মন জুড়িয়া ওর স্থায়ী স্থানলাভ ঘটিয়াছে। ওর কথা ভাবিতে ভাবিতে এমন হইয়াছে প্রতিমার যে, নিজের বিবাহ রাত্রেও ওকে ভুলিবার তার উপায় নাই। এমনি আশ্চর্য্য যোগাযোগ যে প্রতিমাকে চুম্বন করিয়া মুখ তুলিতেই মানসীর ফটোর দিকে রমেশের চোখ পড়িল। সে বলিল, ওর ফটোতেও মালা দিয়েছে? তুমি তো বড় ভাল প্রতিমা?

প্রতিমা অনুভব করিল, তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলায় দড়ি কাটিবার মত মানসীর স্মৃতি ক'মাস আগেও রমেশের যে বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া দিত, জীবন্ত সাপের মত সেই বাহু দুটি আরেও জোরে আজ তাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। রমেশের যে চুম্বন ছিল, শুধু ওষ্ঠের স্পর্শ, আজ তা প্রেমের আবেগে অনির্ব্বচনীয়।

সহসা প্রতিমা কাতর হইয়া বলিল, ছাড় ছাড়, শীগ্‌গির ছাড় আমায়!

কি হল?—রমেশ ভীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

দম আটকে গেল আমার। ছাড়ো।

স্বামীকে ঠেলিয়া দিয়া প্রতিমা খাট হইতে নামিয়া গেল। ঘরে পর্য্যন্ত থাকিল না। বিদ্যুতের আলো মানসীর ফটোর কাচে প্রতিফলিত হইয়া চোখে লাগিতেছিল, প্রতিমার মনে হইয়াছিল সে যেন মানসীর তীব্রোজ্জ্বল ভর্ৎসনার দৃষ্টি।

প্রতিমা ছাদে পালাইয়া গেল। ছাদ ছাড়া বৌদের আর তো যাওয়ার স্থান নাই। অপরিবর্ত্তনীয় আকাশ ছাদের উপরে, তারার আলো মেশানো অপরিবর্ত্তনীয় রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে। দুঃখে প্রতিমার কান্না আসিতে লাগিল। ভুলিয়া গিয়াছে? এমন মন তার স্বামীর যে এর মধ্যে মানসীকে ভুলিয়া গিয়াছে, তার মনোরাজ্যের সেই সর্ব্বময়ী সম্রাজ্ঞীকে?

তেজী বৌ

সুমতির একটা মস্ত দোষ ছিল—তেজ। দেখিতে শুনিতে ভালই মেয়েটা, কাজে কর্ম্মেও কম পটু নয়, দরকার হইলে মুখ বুজিয়া উদয়াস্ত খাটিয়া যাইতে পারে, স্নেহ মমতা করার ক্ষমতাটাও সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের চেয়ে তার কোন অংশে কম নয়,—খারাপ কেবল তার অস্বাভাবিক তেজটা। কারও এতটুকু অন্যায় সে সহিতে পারে না, তুচ্ছ অপরাধ মার্জ্জনা করে অপরাধীকে অপরাধের তুলনায় তিন গুণ শাস্তি দিয়া, কারও কাছে মাথা নীচু করিতে তার মাথা কাটা যায়। হুকুম দিবার অধিকার যার আছে তার কথা সবই সে শোনে—যতক্ষণ কথা গুলি হুকুম না হয়। যত জোর হুকুম, তত বড় অবাধ্য সুমতি।

সবচেয়ে বিপদের কথা, কোন বিষয়ে কারও বাড়াবাড়ি সুমতি সহ্য করিতে পারে না—গায়ে পড়িয়া তেজ দেখায়। বাঙ্গালী ঘরের বৌ, তার গায়ে পড়িয়া তেজ দেখানোর মানেই গুরুজনকে অপমান করা, সমবয়সীদের সঙ্গে ঝগড়া করা আর ছোটদের মারিয়া গাল দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দেওয়া।

দুঃখের বিষয়, সংসারে বাড়াবাড়ি করার বাড়াবাড়িটাই স্বাভাবিক এমন মানুষ কে আছে যে জীবনে অনেক বিষয়ে বঞ্চিত হয় না? অনেক

বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াটা কয়েকটা বিষয়েব বাড়াবাড়ি দিয়া পরিপূরণ করার চেষ্টা না করাটা রীতিমত সাধনা-সাপেক্ষ। সংসাবের লোক সাধনার ধার ধারে বা ইচ্ছা করিলেই ধারিতে পারে এরকম একটা ধারণা সাধু মহাত্মারা পোষণ করেন বটে, কিন্তু কথাটা সত্য নয়।

সুমতির তাই পদে পদে বিপদ। বিবাহের আগে গুরুজনদের মান না রাখিয়া, সমবয়সীদের সঙ্গে ঝগড়া কবিয়া আর ছোটদের বকিয়া মারিয়া ক্রমাগত হাঙ্গামার সৃষ্টি করা যদি বা চলে, বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ীতে এসব চলিবে কেন? প্রথম বছর দুই সুমতি প্রাণপণে তেজটা দমন করিয়া রাখিয়াছিল—দু'একবার সকলকে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করার বেশী ভয়ানক কিছু কবে নাই। অবস্থা বিপাকের কৃত্রিম সংযম আর প্রকৃতিগত স্বাভাবিক তেজের লড়াই-এ সংযমটা ক্ষয় পাইতে পাইতে নিঃশেষ হইয়া আসায় এখন সে পড়িয়াছে মুস্কিলে। শাশুড়ীকে একদিন বেলুনী নিয়া মারিতে উঠাইয়া ছাড়িয়াছে,—প্রথমবাব বলিয়াই শাশুডী মাবিতে উঠিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, একেবাবে মাবিয়া বসেন নাই। কিন্তু কতকাল না মারিয়া থাকিতে পাবিবেন? একে মেযেমানুষ, তায় শাশুড়ী—ধৈর্য্যেব সীমা তার স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ।

এতখানি তেজ সুমতি কোথা হইতে পাইল বলা কঠিন। তার বাবা সদানন্দ অতি নিবীহ গোবেচাবী মানুষ,—কখন মানুষকে চটাইয়া বসেন এই ভয়েই সর্ব্বদা শশব্যস্ত। মা চিররুগ্না—রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মেজাজটা তার বিগড়াইয়া গিয়াছে বটে, বলা নাই কওয়া নাই হঠাৎ রাগিয়া কাঁদিয়া মাথা-কপাল কুটিয়া যখন তখন অনর্থক বাধান বটে, কিন্তু সেটা তেজের লক্ষণ নয়। মানুষটা আসলে ভয়ানক ভীরু। বড় ভাই দুজনে কুড়ি বাইশ বছর বয়স হইতেই কেরাণী,—তাদের তেজ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বোনের সব অতিরিক্ত লজ্জাসরম আর ভাব-প্রবণতায়

ঠাসা,—চারজনেই অমানুষিক সহিষ্ণুতার বর্ম্মে গা ঢাকা দিয়া স্বামীপুত্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে।

এদের মধ্যে সুমতির আবির্ভাব প্রকৃতির কোন্ নিয়মে ঘটিল বলা যায় না,—কোন্ নিয়মের ব্যতিক্রমে ঘটিল তাও বলা যায় না। আগাগোড়া সবটাই দুর্ব্বোধ্য রহস্যে ঢাকা। লজ্জা সরম ও ভাব-প্রবণতা কিছু কম হওয়া আশ্চর্য্য নয়, প্রকৃতিতে কিছু অসহিষ্ণুতার আমদানীও বোধগম্য ব্যাপার, কিন্তু স্বামীপুত্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মধ্যে এতখানি তেজ বজায় রাখা যেমন খাপছাড়া তেমনি অবিশ্বাস্য।

পুত্র সুমতির মোটে একটি, এখনও দু'বছর পূর্ণ হয় নাই। আরেকটি যে কয়েক মাসের মধ্যে আসিয়া পড়িবে, আসিয়া পড়িবার আগে সে পুত্র অথবা কন্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে সুমতি আশা করে এটিও পুত্রই হইবে, দুটি পুত্রের পর একটি কন্যা হইলে মা হওয়ার আনন্দে একদিন সে কি পরিমাণ গর্ব্বই না মিশাইতে পারিবে!

এসব ভবিষ্যতের কথা, আপাততঃ প্রথমটির মত দ্বিতীয়টিকেও বাপের বাড়ীতে গিয়া ভূমিষ্ঠ করার সাধটা সুমতির অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠায় একটা ভারি গোলমালের সৃষ্টি হইল।

শাশুড়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'না, বাপের বাড়ী যেতে হবে না। এই না সেদিন এলে বাপের বাড়ী থেকে?'

সুমতি যুক্তি দিয়া বলিল, সে তো গিয়েছিলাম ছোড়দার বিয়েতে— তাও তো সাতটা দিনও থাকতে পেলাম না।'

মেজাজটা শাশুড়ীর ভাল ছিল না। সকালে খোকাকে দুধ খাওয়ানোর সময় খোকা ভয়ানক চীৎকার জুড়িয়া দেওয়ায় শাশুড়ি বিশেষ কোন অসন্তোষ বা বিরক্তি বোধ না করিয়াও নিছক শাশুড়ীত্ব খাটানোর জন্যই একবার বলিয়াছিলেন, 'না কাঁদিয়ে দুধটুকু পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারনা বাছা!'

আগে হইলে সুমতি চুপ করিয়া থাকিত, আজকাল সংযম ক্ষয় হইয়া আসায় মুখ তুলিয়া বলিয়া বসিয়াছিল, 'দুধ খাওয়াবার সময় ছেলেপিলে একটু কাঁদে।'

'কাঁদে না তোমার মাথা---বড় তো মুখ হয়েছে তোমার বৌমা আজকাল ?'

'মুখ হওয়া হওয়ি কি, যা বলেছি মিথ্যে তো বলিনি।'

'আমি মিথ্যে বলেছি ? আমি মিথ্যে বলি ? তুমি আমায় মিথ্যেবাদী বললে !' রাগে শাশুড়ীর কণ্ঠ ক্ষণকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, আরও জোরালো আওয়াজ বাহির হইবার জন্য। কিন্তু সুমতির অপূর্ব্ব-দৃষ্ট মুখভঙ্গি, তীব্র দৃষ্টি আর চালচলন দেখিয়া আওয়াজটা আর বাহির হইতে পারে নাই। ছেলেকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করিয়া সুমতি ধীর স্থির শান্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ছেলেকে শান্ত করিয়া শাশুড়ীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিল, 'আপনাকে মিথ্যেবাদী বলিনি, বলেছি দুধ খাওয়াবার সময় ছেলেপিলে একটু কাঁদে। কান্না থামিয়ে দিলাম, না কাঁদিয়ে খাওয়ান তো দুধ ?'

প্রথমটা থতমত খাইয়া শাশুড়ী অবশ্য বলিয়াছিলেন, 'তোমার হুকুমে নাকি ?' এবং তারপর এমন একটা প্রচণ্ড হৈ চৈ বাধাইয়া দিয়াছিলেন যে মোহনলাল সুমতিকে বকিয়া আর কিছু রাখে নাই।

স্বামীর অন্যায় বকুনিতে সুমতি অভিমান করিয়া সারাদিন কিছু খায় নাই, তবু শাশুড়ীর মেজাজটা খারাপ হইয়া আছে। মোহনলালের বকুনি শুনিতে শুনিতে সুমতি যদি অন্ততঃ একবারও ফোঁস করিয়া উঠিত, শাশুড়ীর হয়ত মেজাজটা এত খারাপ হইয়া থাকিত না। অকারণে শাশুড়ীকে তেজ দেখাইয়া স্বামীর বকুনি বৌ চুপচাপ হজম করিলে শাশুড়ীর সেটা ভাল লাগে না, মেজাজ বিগড়াইয়া থাকে।

'ফের মুখের ওপর কথা বলছ? বললাম বাপের বাড়ী যেতে হবে না, বাস্ ফুরিয়ে গেল, অত কথা কিসের? মোটে সাতদিনের জন্যে গিয়েছিলাম! সাতদিনের জন্যে যে যেতে দিয়েছিলাম এই তোমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি, তা জেনে রেখো।'

সুমতির নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

'গুরুজনের কি চোদ্দপুরুষ তুলে কথা বলা উচিৎ মা?'

শাশুড়ীর মেজাজ আরও খারাপ হইয়া গেল।

'গুরুজন! গুরুজন বলে কি মাথা কিনেছ! আর বকতে পারি না বাছা তোমার সঙ্গে, বলে দিলাম যেতে পাবে না—পাবে না, পাবে না, পাবে না।'

রাত্রে সুমতি পেট ভরিয়া খাইয়া ঘরে গেল। মোহনলাল আশা করিতেছিল সে একটু কাঁদিবে। গা ঘেঁষিয়া বসিয়া শাশুড়ীর ছেলেমানুষীতে উত্যক্ত হওয়া সত্তেও ক্ষমা করার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়া সুমতি বলিল, 'কি অন্যায় ছাখো তো মার! এসময় বাপের বাড়ী না গেলে চলে? আমায় নেবার জন্য বাবা চিঠি লিখেছেন, মা পষ্ট বলে দিলেন যেতে দেবেন না। কালকেই চিঠির জবাব লেখা হবে—সকালে মাকে তুমি একটু বুঝিয়ে বলো, কেমন?'

সুমতি একটু কাঁদিলে, বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া পায়ে না পড়ুক অন্ততঃ বুকে মুখ লুকাইয়া আত্মসমর্পন করিলে, মোহনলাল তা করিত। বুঝাইয়া বলা কেন, স্পষ্ট করিয়াই বলিত যে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হোক। সুমতির তেজ দেখিয়া সে রাগ করিয়া বলিল, 'আমি বলতে টলতে পারব না।'

'পারবে না? বেশ।'

'বেশ মানে? তোমার যখন ইচ্ছা হবে তখনি বাপের বাড়ী যেতে দিতে হবে নাকি?'

সুমতি সরিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, 'যখন ইচ্ছা বাপের বাড়ী আবার কবে গেলাম ?'

সুতরাং মোহনলাল রাগ করিয়া বলিল, 'বাপের বাড়ী যাওয়া না যাওযার মালিক তুমি নাকি ? যখন পাঠান হবে যাবে, যখন পাঠান হবে না যাবে না। অত মেজাজ দেখাচ্ছ কিসের ? বাড়ীর বৌ না তুমি ?'

'বৌ না হলে এমন অদৃষ্ট হয়। যেতে দেবে না ?'

'না।'

'কেন দেবে না ?'

'আমার খুসী।'

এতক্ষণ সুমতি তেজটা চাপিয়া রাখিয়াছিল, আব পাবিল না। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইতে লাগিল।

'হাড়িমুচিরাও তোমাদের মত বৌ-য়ের ওপর খুসী খাটায় না, তাদেবও দয়ামায়া আছে। তোমরা ভদ্দরলোক কিনা—'

ঘুমন্ত খোকাব পাশে আছড়াইয়া পড়িয়া চোখ বুজিযা সে অসমাপ্ত কথাটা শেষ কবিল অন্য কথা দিয়া, প্রতিজ্ঞা কবাব মত কবিয়া।

'আমি যাবই এবার।'

মোহনলাল রাগে আগুন হইয়া বলিল, 'মা যদিবা যেতে দেন, আমি দেবনা। তোমার মত বেয়াদব নচ্ছার মাগিকে ধরে চাবকান উচিত।'

সুমতি চোখ মেলিয়া বলিল, 'একমাসের মধ্যে যদি আমি বাপের বাড়ী না যাই, চাবুক কেন আমায় ধবে তুমি জুতিয়ো।'

এত কাণ্ড ঘটিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। শাশুড়ীব কাছে একটু নম্র হইয়া থাকিলে আব মাথা নীচু কবিয়া আবদাব ধবিলে প্রথমটা অরাজী হইলেও শেষ পর্য্যন্ত শাশুড়ী রাজী হইয়া যাইতেন। মোহনলালের কাছে একটু কাঁদিলেই কাজটা হইয়া যাইত। অপর-

পক্ষে, শাশুড়ী একটু মিষ্টিমুখে যদি বলিতেন যে এবার সুমতির বাপের বাড়ী না যাওয়াই ভাল, সুমতি ক্ষুণ্ন হোক, রাগ করুক, বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিত না। এমন কি শাশুড়ীর সঙ্গে কলহ করিয়া ঘরে যাওয়ার পর মোহনলাল যদি শুধু বলিত, 'মা যখন মানা করেছেন, এবার বাপের বাড়ী নাইবা গেলে?'—সুমতি হয়ত ফোঁস ফোঁস করিয়া একটু কাঁদিয়া বলিত,'আচ্ছা।' বাপের বাড়ী যাওয়ার সমস্যার চমৎকার মীমাংসা হইয়া যাইত। সুমতির তেজের জন্য সব গোলমাল হইয়া গেল।

এখান হইতে কর্ত্তৃপক্ষের চিঠি গেল, এবার বৌমাকে পাঠান হইবে না, পাঠান সম্ভব নয়, অনেক কারণ আছে। সুমতি নিজে বাবার কাছে লিখিয়া দিল, যত শীঘ্র সম্ভব কাহাকেও পাঠাইয়া দেন তাকে লইয়া যাওয়া হয়।

সদানন্দ অনেক বুঝাইয়া মেয়ের কাছে লম্বা চিঠি লিখিলেন। কেউ যখন তাকে পাঠাইতে ইচ্ছুক নন, তাকে নেওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি করা কি উচিত?

এ চিঠির এমন একটা জবাব সুমতি লিখিয়া দিল যে ভদ্রলোক স্বয়ং তিনদিনের ছুটি নিয়া মেয়ের শ্বশুর বাড়ী আসিয়া হাজির হইলেন। বুক তখন তার ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। মেয়েকে নেওয়ার জন্য প্রায় সজল চোখে কত যে কাকুতি মিনতি করিলেন, অন্ত হয় না। কিন্তু সুমতির শাশুড়ী গোঁ ছাড়িলেন না, ঘাড় নাড়িয়া কেবলি বলিতে লাগিলেন, 'না বেয়াই না, এবার বৌমাকে পাঠাতে পারব না।'

কাকুতি-মিনতিতে মন গলার বদলে শেষ পর্য্যন্ত শাশুড়ীকে রাগিয়া উঠিবার উপক্রম করিতে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সদানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। সদানন্দ নিজে আসিয়া এভাবে বলিলে অন্য অবস্থায় শাশুড়ীর মন হয়ত

গলিয়া যাইত, বাপের বাড়ী যাওয়া নিয়া প্রথমবার সুমতির সঙ্গে যে ঝগড়া হইয়াছিল তাও হয়তো তিনি আর মনে রাখিতেন না, কিন্তু ইতিমধ্যে সুমতি আরও অনেকবার তেজ দেখাইয়া বসিয়াছে। যেমন তেমন তেজ নয়, গা পুড়িয়া জ্বালা করার মত তেজ।

সুমতি বলিল 'আমি তোমার সঙ্গেই চলে যাব বাবা, আমায় নিয়ে চল।'

সদানন্দ মেয়েকে বুঝাইলেন। এ রকম অবস্থায় যত রকম উপায়ে মেয়েকে বোঝানো সম্ভব, তার একটাও বাদ দিলেন না। কিন্তু এ তো বোঝার কথা নয়, কথাটা তেজের। সুমতির মুখে সেই এক কথা, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমায় নিয়ে চল।'

শেষে সদানন্দের মত নিরীহ গোবেচারী মানুষটা পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এরা পাঠাবে না, তবু তুই যাবি কি রকম? আমি নিয়ে যেতে পারব না। এদের বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করতে পারিস, আমায় চিঠি লিখিস, এসে নিয়ে যাব। যাবার জন্য এত পাগলামিই বা কেন তোর? পরেই না হয় যাস?'

সদানন্দ ফিরিয়া গেলেন। এবার নিজের তেজের আগুনে সুমতি নিজেই পুড়িতে লাগিল। শারীরিক অবস্থাটা তার এতখানি মানসিক তেজ সহ্য করিবার মত ছিল না, এ অবস্থায় মনটা যত শান্ত আর নিস্তেজ থাকে ততই ভাল। হাতপাগুলি দেখিতে দেখিতে কাঠির মত সরু হইয়া গেল, শুষ্ক শীর্ণ মুখে কেবল জ্বল জ্বল করিতে লাগিল দুটি চোখ। কথা কমিয়া গেল, খাওয়া কমিয়া গেল, আলস্য কমিয়া গেল—নিজের মনে নীরবে যতটা পারে কাজে অকাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আর যতটা পারে কোন কাজ না করিয়া সে ছটফট করিতে লাগিল। তারপর সে একমাস সময়ের মধ্যে বাপের বাড়ী না যাইতে পারিলে চাবুকের বদলে স্বামীর

জুতা খাইতে রাজী হইয়াছিল, সেই সময়টা প্রায় কাবার হইয়া আসায়, একদিন শেষরাত্রে কিছু টাকা আঁচলে বাঁধিয়া একাই বাপের বাড়ী রওনা হইয়া গেল।

এ একটা মফস্বলের সহর। বাপের বাড়ীটাও মফস্বলের একটা সহরেই। কিন্তু সোজাসুজি যোগ না থাকায় কলিকাতা হইয়া যাইতে একটু সময় লাগে।

সুমতির আরও অনেক বেশী সময় লাগিল। কারণ কলিকাতায় পৌঁছাইয়া বাপের বাড়ী যাওয়ার বদলে তাকে যাইতে হইল মেয়েদের একটা হাসপাতালে। খবর পাইয়া সদানন্দও আসিলেন, মোহনলালও আসিল এবং মোহনলাল বিনা বাক্যব্যয়ে মেয়েকে বাপের বাড়ী লইয়া যাইবার অনুমতিও সদানন্দকে দিয়া দিল। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার একমাস তাকে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে দিলেন না।

এক মাস পরে বাপের বাড়ী গিয়া তিন মাস পরে অনেকটা সুস্থ হইয়া সুমতি স্বামীগৃহে আসিল। আর কোন পরিবর্তন হোক বা না হোক, সুমতির একটা পরিবর্তন অতি স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়িয়া গেল। দেখা গেল, তার সবটুকু তেজ কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে।

ক্ষয়রোগীর বৌ

কোন নৈসর্গিক কারণ থাকে কিনা ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে মানুষের কথা আশ্চর্য্য রকম ফলিয়া যায়। সমবেত ইচ্ছাশক্তির মর্য্যাদা দিবার জন্যও ভগবান বিনিদ্র রজনী যাপন করেন না, মানুষের মর্ম্মাহত অভিশাপের অর্থও জ্বালাময় অক্ষমতা ঘোষণা করার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। তবু মাঝে মাঝে প্রতিফল ফলিয়া যায়, বিষাক্ত এবং ভীষণ!

এ কথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জ্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড় লোক হওয়া? পকেট হইতে চুপি-চুপি হারাইয়া গিয়া যেটি পথের ধারে আবর্জ্জনার তলে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে সেটি ছাড়া নারীর মত মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই। কম এবং বেশী অর্থোপার্জ্জনের উপায় তাই একেবারে নির্দ্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের সয়তানি। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জ্জন কর: সকলে পিট চাপড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্ব্বনাশ কর। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা

মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে।

ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।

সুতরাং বলিতে হয় যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল। সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনো করিত না। তাই, জীবনের আনাচে-কানাচে তাহার যে অভিশাপ ও ঈর্ষার বোঝা জমা হইয়াছিল সেজন্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না। তবু সংসারে চিরকাল পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমা করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ঘটিল।

লোকে যা বলিয়াছিল অবিকল তাই। একেবারে কুষ্ঠব্যাধি।

মহাশ্বেতা একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল: 'তোমার আঙ্গুলে কি হয়েছে?'

'কি জানি। একটা ফুস্কুরির মত উঠেছিল।'

মহাশ্বেতা আঙ্গুলটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিল: 'ফুস্কুরি নয়। চারদিকটা লাল হয়েছে।'

'আঙ্গুলটা কেমন অসাড়-অসাড় লাগছে শ্বেতা।'

'একটু টিনচার আইডিন লাগিয়ে দেব? নয়তো বলো একটা চুমো খেয়ে দিচ্ছি, এক চুমোতে সেরে যাবে।'

আঙ্গুলটা চুম্বন করিয়া মহাশ্বেতা হাসিল।

'পুরুষ মানুষের আঙুল তো নয়, উর্বশী মেনকার কাছ থেকে যেন ধার করেছো। বাবা, মানুষের আঙুলের রঙ পর্যন্ত এমন টুকটুকে হয়! রক্ত যেন ফেটে পড়ছে!'

আঙুলটি যে হাতে লাগানো ছিল স্বামীর সেই হাতটি মহাশ্বেতা নিজের গলায় জড়াইয়া দিল। জীবনে যে-কথা সে বহুবার বলিয়াছে আজ আর একবার সেই কথাই বলিল।

'এ তোমার ভারি অন্যায় তা জান? তুমি এ্যাতো সুন্দর বলেই তো আমার ধাঁধা লাগে! তোমাকে ভালবাসি, না, তোমার চেহারাকে ভালবাসি বুঝতে পারি না। শুধু কি তাই গো? হুঁ, তবে আর ভাবনা কি ছিল! দিনরাত কি রকম ভাবনায়-ভাবনায় থাকি তোমার হলে টের পেতে। ঈর্ষায় জ্বলে মরি যে!'

তারপর আরও কিছুকাল বোঝা গেল না। শুধু অঙ্গুল নয়, যতীনের হাতে দু'তিন যায়গায় তামার পয়সার মত গোলাকার কয়েকটা তামাটে দাগ যখন দেখা দিল, তখনো নয়। মহাশ্বেতার শুধু মনে হইল, যতীনের শরীরটা বুঝি ভাল যাইতেছে না, গায়ের রঙটা তাহার রক্ত খারাপ হওয়ার জন্য কি রকম নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। একটা টনিক খাওয়া দরকার।

'ন্যাখো, তুমি একটা টনিক খাও।'

'টনিক খেয়ে কি হবে?'

'আহা, খাওনা। শরীরটা যদি একটু সারে!'

যতীন টনিক খাইল। কিন্তু টনিকে এ ব্যাধির কিছু হইবার নয়। ক্রমে আরও কয়েকটা আঙুলে তাহার ফুস্কুরি দেখা দিল। শরীরের চামড়া আরও কর্কশ, আরও মরা মরা দেখাইতে লাগিল। চোখের কোল এবং ঠোঁট কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর মৃত মাংসের রূপ লইয়া অল্প-অল্প ফুলিয়া উঠিল। স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি তাহার ক্ষীণ হইয়া

আসিল। চিমটি কাটিলে তাহার যেন আর তেমন ব্যাথা বোধ হয় না। দিবারাত্রি একটা ভোঁতা অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি তাহাকে বিষণ্ণ ও খিটখিটে করিয়া রাখিল। এবং সকলের আগে যে আঙ্গুলের ছোট একটি ফুস্কুরিকে মহাশ্বেতা চুম্বন করিয়া টিনচার আইডিন লাগাইয়া দিয়াছিল সেই আঙ্গুলেই তাহার পচন ধরিল প্রথম।

ষোল টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন: 'আপনাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি। আপনার কুষ্ঠ হয়েছে।'

বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন: 'টাইপটা খারাপ। একেবারে সেরে উঠতে সময় নেবে।'

'সেরে তা'হলে যাবে ডাক্তার বাবু?'

'যাবে না? ভয় পান কেন? রোগ যখন হয়েছে সারতেও পারে নিশ্চয়।'

এমন করিয়া ডাক্তার কথাগুলি বলিলেন, আশ্বাস দিবার চেষ্টাটা তাহার এত বেশী সুস্পষ্ট হইয়া রহিল যে কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না যতীনের এ মহাব্যাধি কথনো সারিবে না।

একশ'টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন: যতটা সম্ভব লোকালাইজড করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। তার বেশী এখন কিছু করা অসম্ভব। জানেন তো রোগটা ছোঁয়াচে সাবধানে থাকবেন। আপনাকে তো বলাই বাহুল্য যে ছেলেমেয়ে হওয়াটা...বোঝেন না?'

বোঝে না? যতীন বোঝে, মহাশ্বেতা বোঝে। কিন্তু ছ'মাস আগে যদি এই বোঝাটা বোঝা যাইত!

মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে। অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে অকথ্য যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য-সদ্য মরিয়া গিয়াছে। বিমূঢ় আতঙ্কে বিহ্বলের মত হইয়া সে বলিল: 'তোমার কুষ্ঠ হয়েছে? ও ভগবান, কুষ্ঠ!'

যতীন তখনো মরে নাই, মরিতেছিল। সাধারণ কথার সুর তাল লয় মান সমস্ত বাদ দিয়া সে বলিল : 'কি পাপে আমার এমন হ'ল শ্বেতা ?'

'তোমাব পাপ কেন হবে গো ? আমার কপাল।'

নিজের বাড়ীতে আত্মীয় পরিজনের মধ্যে যতীন হইয়া রহিল অস্পৃশ্য। গৃহের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার সাধ থাকিলে বাধা অবশ্য কেহই তাহাকে দিতে পারিত না। কিন্তু সে গোপনতা খুঁজিয়া লইল। বাড়ীর একটা অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সেখানে নিজেকে সে নির্ব্বাসিত ও বন্দী কবিয়া রাখিল। মহাশ্বেতা ছাড়া আর কাহারো সেদিকে যাইবার হুকুম রহিল না। বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিয়া বাহির হইতে ফিবিয়া গেল, সামনাসামনি মৌখিক সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করিয়া আত্মীয়স্বজন হইয়া গেল ব্যর্থ। যতীন নিজের পচনধরা দেহকে কারো চোখের সামনে বাহির করিতে রাজী হইল না। নিজের ঘরে সে রেডিও বসাইল, স্তুপাকার বই আনিয়া জমা কবিল, ফোন বসাইয়া বাড়ীব অন্য অংশ এবং বাহিরের জগতের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চাপা শব্দের সংযোগ স্থাপিত করিয়া লইল। জীবনযাপনের প্রথায় আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও বিপর্য্যয়ের সীমা পরিসীমা রহিল না।

পৃথিবীব সমস্ত মানুষকে বর্জ্জন করিলেও মহাশ্বেতাকে সে কিন্তু ছাড়িতে পাবিল না। নিকটতম আত্মীয়ের দৃষ্টিকে পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া বাঁচিয়া থাকার মত মনের জোর সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল বলা যায় না কিন্তু মহাশ্বেতার সম্বন্ধে সে শিশুর মতই দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া রহিল। আপনার সংক্রামক ব্যাধিটিকে আপনার দেহের মধ্যেই সংহত করিয়া রাখিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া চিতার আগুনে

ভস্ম করিয়া ফেলিবার যে অনমনীয় প্রতিজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিল, মনে হইল, মহাশ্বেতাকে সে বুঝি তাহার সেই আত্ম-প্রতিশ্রুতির অন্তর্গত করে নাই। আত্মীয় পর সকলের জন্য সাবধান হইতে গিয়া মহাশ্বেতার বিপদের কথাটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবনটা এতকাল ভাগাভাগি করিয়া আসিয়াছে বলিয়া দেহের এই কদর্য্য রোগের ভাগটাও মহাশ্বেতাকে যদি আজ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার যেন কিছুই বলিবার নাই।

স্ত্রীকে সে সর্ব্বদা কাছে ডাকে, সব সময় কাছে রাখিতে চেষ্টা করে। কাছে বসিয়া মহাশ্বেতা তার সঙ্গে কথা বলুক, তাকে বই পড়িয়া শোনাক। রেডিওতে ভাল একটা গান বাজিতেছে, পাশাপাশি বসিয়া গানটা না শুনিলে একা যতীনের শুনিতে ভাল লাগে না। কোনে সে কার সঙ্গে কথা বলিবে নম্বরটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া কানেকশন্ লইয়া রিসিভারটা মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক। আর তা না হয়তো সে শুধু কাছে বসিয়া থাক, যতীন তাহাকে দেখিবে।

মহাশ্বেতা এসব করে। খানিকটা কল বনিয়া-যাওয়া মানুষের মত যতীনের নবজাগ্রত সমস্ত খেয়ালের কাছে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যতীন যা বলে নির্ব্বিকার চিত্তে সে তাহাই পালন করিয়া যায়। যতীনের ইচ্ছাকে কখনো সংশোধিত অথবা পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করে না। তাহার নিরবচ্ছিন্ন স্বামীর কথা শুনিয়া চলিবার রকম দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না তাহার নিজেরও স্নানাহারের প্রয়োজন আছে, সুস্থ মানুষের সঙ্গলাভের প্রয়োজন আছে, কিছুক্ষণ আপন মনে একা থাকিবার প্রয়োজন আছে। যতীন খেয়াল করিয়া ছুটি দিলে সে খাইতে যায়, যতীন মনে করাইয়া দিলে বিকালে তাহার একটু বাগানে বেড়ানো হয়। তা না হইলে নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া

যতীনের পরিবর্ত্তনশীল ইচ্ছাকে সে অক্লান্ত তৎপরতার সহিত তৃপ্ত করিয়া চলে।

অথচ যাচিয়া সে কিছুই করে না। যতীনের দরকারী সুখসুবিধা-গুলির জন্য ধরাবাঁধা যে সব নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলি যথারীতি পালিত হয় কিনা এ বিষয়ে সে নজর রাখে কিন্তু যতীনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য, যতীনকে তাহার নিজের খেয়ালে সৃষ্টি করিয়া লওয়া আনন্দের অতিরিক্ত কিছু দিবার জন্য, স্বকপোলকল্পিত কোন উপায় দিন ও রাত্রির চব্বিশটা ঘণ্টার মধ্যে মহাশ্বেতা একটিও আবিষ্কার করে না।

তাহাদের সহযোগ রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে।

জীবনের তাহাদের একটি সমবেত গতি ছিল। জীবনের পথে পাশাপাশি চলিবার কতগুলি রীতি ছিল। সে গতিও এখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে-সব রীতিও গেছে বদলাইয়া। পুরানো ভালবাসা, পুরানো প্রীতি, পুরানো কৌতুক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইয়াছে। বিবাহের চার বছর পরে পরস্পরের সঙ্গে আবার তাহাদের একটি নবতর সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বতন বোঝাপড়াগুলি আগাগোড়া বদলাইয়া ফেলিতে হইয়াছে।

প্রথমদিকে যে মুহ্যমান অবস্থাটি তাহাদের আসিয়াছিল সেটুকু কাটিয়া যাওয়ার আগে আপনা হইতে এমন কতগুলি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে—যাহা খেয়াল করিবার অবসরও তাহাদের থাকে নাই। চিকিৎসার বিপুল আয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া রোগী ও সুস্থ মানুষের শয্যা গিয়াছে পৃথক হইয়া। কথা বলিবার সময় শুধু হাসিয়া কথা বলিবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ বাতিল হইয়া গিয়াছে। যার নাম দাম্পত্যালাপ এবং যাহা নয়টির মধ্যে প্রায় সবগুলি উপভোগ্য

রসেই সমৃদ্ধ দুটি পৃথক শয্যার মাঝে চিড় খাইয়া তাহা নিঃশব্দে মরিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রির মধ্যে একটি চুম্বনও আজ আর পৃথিবীর কোথাও অবশিষ্ট নাই। চোখে-চোখে যে ভাষায় তাহারা কথা বলিত সে ভাষা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সবটুকু নয়। এখন চোখের দৃষ্টিতে একটি বিহ্বল শঙ্কিত প্রশ্ন তাহারা ফুটাইয়া তুলিতে পারে। চোখে-চোখে চাহিয়া এখন তাহারা শুধু দেখিতে পায় একটা অবিশ্রান্ত অপ্রকাশিত বেদনা এই জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়া আছে : একি হল ?

মহাশ্বেতা দিনরাত বোধ হয় এই কথাটাই ভাবে। তাহার ঠোঁট দুটি পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া অহরহ কঠিন হইয়া থাকে, ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এক-এক সময় সে শুধু বেশী বাতাসের প্রয়োজনে জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। দীর্ঘশ্বাসের মত শোনায়, অদৃষ্টকে অভিশাপ দিবার মত শোনায়।

যতীন অনুযোগ করিয়া বলে : 'দিনরাত তুমি অমন কর কেন ?'

মহাশ্বেতা ঠোঁট নাড়িয়া উচ্চারণ করে : 'কেমন করি ? কিছু করি না তো !'

যতীন হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলে : 'এমনিতেই আমি মরে আছি, তারপর তুমিও যদি আমার মনে কষ্ট দাও'—

যতীন ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া গিয়া সে মহাশ্বেতার হাত চাপিয়া ধরে। প্রথম দিকে তাহার ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইত, আজকাল আলো ও বাতাস লাগাইবার জন্য খুলিয়া রাখা হয়। ডাক্তার দিনে পাঁচ ছয় বার ধুইয়া যতক্ষণ সম্ভব রোদে ঘাগুলি মেলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যাণ্ডেজ শুধু রাত্রির জন্য।

মহাশ্বেতা তাহার তিনটা চামড়া-তোলা ফাটিয়া-যাওয়া আঙ্গুলের দিকে চাহিয়া থাকে। আঙ্গুলগুলি তাহার হাতে লাগিয়া আছে বলিয়া বারেকের জন্যেও সে শিহরিয়া ওঠে না। মনে হয় যতীন অনুরোধ করিলে তাহার হাতে কনুইএর অল্প নীচে টাকার মত চওড়া যে ক্ষতটি ছোট ছোট রক্তাভ গোটায় উর্ব্বর হইয়া আছে, মহাশ্বেতা সেখানে চুম্বন করিতে পারে।

যতীন হাত সরাইয়া লয়। রাগ করিয়া বলে: 'তুমি আমায় ঘেন্না করছ শ্বেতা ?'

মহাশ্বেতা একথা অনুমোদন করিবার সুরে রাগিয়া বলে: 'কখন আবার ঘেন্না করলাম ?'

'তবে অমন করে তাকাও কেন ?'

'কেমন করে তাকাই ?'

এরকম অবস্থায় এধরণের পাল্টা প্রশ্ন মানুষের সহ্য হয় ? যতীন উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বেলা বারোটার কড়া রোদে পাতিয়া-রাখা ঈজিচেয়ারটিতে কাত হইয়া এলাইয়া পড়ে। বৈশাখী সূর্য্যের এ অম্লান কিরণ ভালমানুষের হয়ত পাঁচ মিনিটের বেশী সহ্য হয় না। কিন্তু যতীনের অনুভব শক্তি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই রোদে নিজেকে মেলিয়া রাখিয়া পড়িয়া থাকে। রোদ সরিয়া গেলে ঈজিচেয়ারটাও সে সরাইয়া লইয়া যায়। ডাক্তারের কাছে সে সূর্য্যা-লোকের মধ্যে অদৃশ্য আলোর গুণের কথা শুনিয়াছে। সে আলোককে যতীন প্রাণপণে কাজে লাগায়। অপচয় করিতে পারে না।

ক্ষানিক পরে ডাকিয়া বলে: 'এদিকে শোন শ্বেতা।'

মহাশ্বেতা আসিলে বলে: 'এইখানে বোসো।'

মহাশ্বেতা যতীনের কাছে ছায়ায় বসে। নিকটবর্ত্তী রোদের ঝাঁঝে তাহার ঘর্ম্মাক্ত দেহ শুকাইয়া উঠিয়া জ্বালা করিতে থাকে। কিন্তু

সে উঠিতে পারে না। জ্যোতির্ময়ী পতিব্রতার মত স্বামীর কাছে বসিয়া ঝিমায়।

যতীন বলে : 'আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

মহাশ্বেতা তাহাকে জল আনিয়া দেয়।

যতীন বলে : 'আমার আর একটা বালিশ চাই।'

মহাশ্বেতা তাহাকে আর একটা বালিশ আনিয়া দেয়।

যতীন বলে : 'এনে দিলেই হ'ল বুঝি ? মাথার নিচে দিয়ে দাও!''

মহাশ্বেতা বালিশটা তাহার মাথার নীচে দিয়া দেয়।

যতীন রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে : 'কি ভাবছ শুনি ?'

মহাশ্বেতা বলে : 'কি ভাব্‌বো ?'

বৈশাখী দুপুরটি গুমোটে জমিয়া ওঠে।

রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া মহাশ্বেতা দেখিতে পায় যতীন তার বিছানায় উঠিয়া আসিয়াছে। দেখিয়া মহাশ্বেতা চোখ বোজে। সারারাত্রি আর সে চোখ খোলে না।

এজগতে সবই যখন ভঙ্গুর, মনুষ্যত্বের ভঙ্গুরতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বভাবও ভাঙ্গে গড়ে। আজ যে রাজা ছিল কাল সে ভিখারী হইলে যদি-বা এটুকু বোঝা যায় যে লোকটা চিরকাল ভিখারী ছিল না, তার বেশী আর কিছুই বোঝা যায় না।

সঙ্কীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকিয়া যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। বীভৎস রোগটা তাহার না কমিয়া বাড়িয়াই চলিল, তার সুশ্রী রমণীয় চেহারা কুৎসিৎ হইয়া গেল। বাহিরের এই কদর্য্যতা তাহার ভিতরেও

ছাপ মারিয়া দিল। তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকাও মুহ্যমানা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মেজাজটা যতীনের একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। মাথায় রক্ত চলাচলের মধ্যে তাহাব কি গোল বাধিয়াছে বলা যায় না, চোখ দুটী মেজাজের সঙ্গে মানাইয়া দিবারাত্রি আরক্ত হইয়া আছে। গলাব আওয়াজ তাহাব চাপা ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুলগুলি অর্দ্ধেকের বেশী উঠিয়া গিয়া পাতলা হইয়া আসিয়াছে। নাকেব রঙটা তাহার তামাটে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মুখের ও দেহের মাংস দেখিলে মনে হয় কত কালের বাসি হইয়া ভিতব হইতে পচন ধবিয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছে। কোণঠাসা হিংস্র জন্তুব মত উগ্র ভীতিকব ব্যবহাবে মহাশ্বেতাকে সে সর্ব্বদার জন্য সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে সুরু কবিযাছে।

মানুষের স্তবে আব যে তাহাব স্থান নাই যতীন তাহা বুঝিতে পারে। মানুষেব শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা পাওযাব আশা এ-জীবনের মত তাহাব ঘুচিযা গিয়াছে। সে কাছে আসিতে দেয় না বলিযা কেহ তাহার খোঁজ খবব নেয় না। এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে সে বাজী নয়। মহাশ্বেতাব নির্ব্বাক ও নির্ব্বিকাব আত্মসমর্পণকে সে অসাধারণ ঘৃণাব অস্বাভাবিক প্রকাশ বলিযা চিনিতে পাবিয়াছে। মানুষকে দিবার যতীনেব আব কিছুই নাই। সে তাই মানুষের উপর রাগিয়াছে। সে তাই স্বার্থপব হইতে শিখিয়াছে। ব্যথা পাইয়াছে বলিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে কুণ্ঠিত নয়।

নাগাল সে পায় শুধু মহাশ্বেতার। মহাশ্বেতাকেই তাহার ব্যাধি ও ব্যাধিগ্রস্ত মনের ভাব বহন কবিতে হয়।

সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তার অবসন্ন শিথিল ভাবটাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। মনে হয়, আত্মরক্ষার ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলি আর তাঁহার

ঘুমাইয়া নাই। এবার সে একটু বাঁচবার চেষ্টা করিবে। চিরটাকাল সহমরণে যাইবে না।

যতীনকে সে বলে: 'কোথাও যাবে?'

যতীন বলে: 'না।'

'সমুদ্রের জল লাগালে হয়তো কমত।'

যতীন কুটিল সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে: 'কমত? তোমার মাথা হ'ত! ডাক্তার ওকথা বলেনি।'

মহাশ্বেতা রাগ করিয়া বলে: 'ডাক্তারের কথা শুনে তো সবই হচ্ছে।'

খানিক পরে সে আবার বলে: 'ঠাকুর দেবতার কাছে একবার হত্যা দিয়ে দিয়ে দেখলে হ'ত। হয়তো প্রত্যাদেশটেশ কিছু পেতে।'

যতীন আরক্ত চোখে মহাশ্বেতার সুস্থ সবল দেহটির দিকে চাহিয়া থাকে।

'নিজের ছেলে খেয়ে ঠাকুর দেবতার অত ভক্তি কেন? প্রত্যাদেশ! তোমার মত পাপিষ্ঠার স্বামীকে ঠাকুর প্রত্যাদেশ দেন না।'

ব্যাপারটা মাসখানেকের পুরানো। যতীন ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়াছে। কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সে বিশ্বাস করে নাই। মহাশ্বেতাকে সন্দেহ করিয়াছে, সন্দেহটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে নিজের তাহাতে প্রত্যয় জন্মাইয়াছে এবং উগ্র উত্তেজনায় একটা পুরাদিন পাগল হইয়া থাকিয়াছে।

মহাশ্বেতা কিছু প্রকাশ করে না। জেরার জবাবে এমন সব কথা বলে যে যতীন বিশ্বাস করিতে পারে না। জোড়াতালি দিবার চেষ্টাটা তাহার ধরা পড়িয়া যায়। তাছাড়া মহাশ্বেতা এমন এমন ভাব দেখায় যেন এটা সম্পূর্ণভাবে তাহারই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। এমনও যদি হয় যে এ ব্যাপারে তাহার হাত ছিল, দৈবের চেয়ে সেই বেশী দায়ী,

বলিবার অধিকার যতীনের নাই। সে তাহার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা তুলিয়া অনর্থক উদ্বিগ্ন হইতেছে। মহাশ্বেতার কপালে দুঃখ ছিল, সব দিক দিয়া বঞ্চিত হওয়ার বিধিলিপি ছিল, সে দুঃখ পাইয়াছে, বঞ্চিত হইয়াছে। যতীনের কি? সে কেন ব্যস্ত হয়?

তার স্বামী বলিয়া যতীন দেবতার প্রত্যাদেশও পাইবে না একথাটা মহাশ্বেতার সহ্য হয় না। সে বলে: 'ছেলে-ছেলে করে তো মরছ। গুণে জেনেছ ছেলে?'

যতীনের চোখে প্রত্যাদেশকারীর দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে।

'ছেলে নয়? ওরা যে বলল ছেলে?'

'আমার চেয়ে ওরা যে বেশী জানে।

যতীন তখন আর কিছু বলে না। চুপচাপ ভাবিতে থাকে। পরদিন দুপুরে যতীনের রোদটুকু হরণ করিয়া আকাশ ভরিয়া মেঘ জমিলে মহাশ্বেতাকে কাছে, খুব কাছে আহ্বান করে। বাহিরে ব্যাকুল বর্ষণ সুরু হইলে হঠাৎ সে বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া অভিমানের সুরে বলে: 'মেয়ের বুঝি দাম নেই?'

মহাশ্বেতা অবাক হইয়া বলে: 'তুমি এখনো সেকথা ভাবছ?'

যতীন বলে: 'কি করেছিলে? গলা টিপে তুমি তাকে মারতে পারনি শ্বেতা। না, তাও পেরেছিলে?'

মহাশ্বেতা বলে: 'আবোল-তাবোল কথার কত জবাব দেব? যা বোঝ না তাই নিয়ে কেবল বকবক করবে। বেঁচে থাকলে কত দুঃখ পেত ভেবে আমি মন ঠাণ্ডা করেছি। তুমি পার না?—কি বৃষ্টিটাই নামল। দেখি একটু!'

মহাশ্বেতা উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়ায়। বাহিরে অবিশ্রান্ত জল পড়ে আর ঘরে যতীন অবিরত গাল দেয়। মহাশ্বেতা চোখ দিয়া বর্ষা ত্মাখে আর কান দিয়া স্বামীর কথা শোনে। যতীন যখন বলিতে থাকে যে একাজ যে মেয়েমানুষ করিতে পারে সে যে আর কোন অন্যায় করিতে পারে না, একথা স্বয়ং ভগবান তাহাকে বলিলেও সে বিশ্বাস করিবে না, তখন মহাশ্বেতা একটু হাসে।

একদিন তাহাদের এই কথোপকথন হইয়াছিল :

'কি পাপে আমার এমন হ'ল শ্বেতা ?'

'তোমার পাপ কেন হবে ? আমার কপাল।'

আজ কথার বলিবার ধারা উল্টিয়া গিয়াছে। যতীন আজ প্রাণপণে চেঁচাইয়া বলে : 'তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলেখেকো রাক্ষসী। তুমি মরতে পারনি ? না, সাধ-আহ্লাদ এখনো মেটেনি ? এখনো বুঝি একজন খুব ভালবাসছে ?'

এই সন্দেহটাই এখন যতীনের আক্রমণ করার প্রধান অস্ত্রে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মহাশ্বেতার মুখ দেখিলে কারো একথা মনে হওয়া উচিত নয় যে সে সুখে আছে। যতীনের দেখিবার ভঙ্গি ভিন্ন। মহাশ্বেতার মুখের ম্লানিমা তার চোখে রূপৈশ্বর্য্যের মত লাগে, ওর চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সেটা তার মনে হয় পরিতৃপ্তি। ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা। তার দৃষ্টির আড়ালে ওর নেপথ্য জীবনটির পরিসর বাড়াইয়া তোলা যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাকে একা ফেলিয়া সমস্ত দুপুরটা সে কাটায় কোথায় ? অন্য ঘরে বিশ্রাম করে ? যতীন বিশ্বাস করে না। বিশ্রামের জন্য অন্য ঘরেরই যদি তার প্রয়োজন যতীনের পাশের ঘরখানা কি দোষ করিয়াছে ? নির্জ্জন দুপুরে

নীচের তলায় কোণার একটা ঘর ছাড়া ওর বিশ্রাম করা হয় না, বাহির হইতে যে ঘরে সকলের অগোচরে মানুষ আসা যাওয়া করিতে পারে ?

'অত বোকা নই আমি, বুঝলে ?'

পাল্টা প্রশ্ন করার অভ্যাসটা মহাশ্বেতার এখনো একেবারে যায় নাই। সে বলে : 'তোমাকে বোকা কে বলেছে ?'

যতীন গোঁ ধরিয়া বলে : 'ওসব চলবে না। আমার বাড়ীতে বসে ওসব তোমার চলবে না, এই তোমাকে আমি বলে দিলাম ! এখনো মরিনি আমি !'

'কি সব বলছ ?'

'বলছি তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। ওরে বাপরে, চাদ্দিক দিয়ে আমার একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল যে !'

যতীন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মহাশ্বেতা ছবির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বিকৃত ক্রন্দন চাহিয়া ছাখে। যতীনের আকুলতা যত তীব্র হইয়া ওঠে সে যেন ততই শান্ত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে সন্তর্পনে তাহার চোখে পলক পড়ে, ঘরের দেওয়ালে ঝাপসা ছবিগুলি মন্থরগতিতে তাহার চারিদিকে পাক খায়। বাহিরের শব্দগুলি তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে, সে একটু একটু করিয়া তাহা অনুভব করে। তাহার মনে হয়, কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে।

পাগলামী মহাশ্বেতারও আসিয়াছে বৈকি। তাহা অপরিহার্য্য। সাধারণ অবস্থায় মানুষ যাহা করে না সে সব করার নাম পাগলামী। সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যাহার জীবন, ওসব তাহাকে করিতে হয়। মস্তিষ্কের কতগুলি অভিনব অভ্যাস জন্মিয়া

যায়। বন্ধুকে কারো মনে হয় শত্রু, প্রিয়কে কারো মনে হয় অপ্রিয়, জীবনকে কারো মনে হয় সীমান্তোলিত কৌতুক। দুঃখ দেখিলে কেহ কাঁদিয়াই মরিয়া যায়, কেহ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবে বিকালে চা পান করা হয় নাই বলিয়া মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে, আকাশে কি আশ্চর্য্য একটা পাখী উড়িয়া গেল?

মহাশ্বেতা রাত্রে এ ঘরে থাকে না। পাশের ঘরে সে বিছানা পাতে।

যতীন প্রশ্ন করে, কেন? সে মুখে কিছু বলে না, ঘরে ঢুকিয়া খিল তুলিয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি জবাবটা সুস্পষ্ট করিয়া রাখে। যতীন রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলে: 'রিভলবারে গুলি ভরে রাখলাম। কাল সকালে ঘর থেকে বেরুলেই তোমাকে গুলি করব।'

বলে: 'এ অপমান সহ্য হয় না শ্বেতা! তুমি আমাকে এমন করে ঘেন্না করবে?'

এ ঘরে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত যতীন জাগিয়া থাকে, ও ঘরে মহাশ্বেতা শূন্য বিছানায় নিষ্পন্দ অনুসন্ধানে জীবনের অবলম্বন খোঁজে। কত কথা সে ভাবিবার চেষ্টা করে কিন্তু ভাবিতে পারে না, কত কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারে না; সব গোলমাল হইয়া যায়। কুমারী জীবনের স্মৃতি একটা অচিন্তনীয় অনুভূতির মত মস্তিষ্কের বাহিরে-বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, বিবাহের পর যে চারটা বছর যতীন সুস্থ ছিল, সুরূপ ছিল, সে সময়ের কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করা মাত্র মহাশ্বেতার চিন্তাশক্তি অসাড় হইয়া যায়। জীবনের সেই আদিম নিষ্পাপ উৎসব হইতে সে একেবারে উপস্থিত হয় যতীনের গলিত দেহ ও বিকৃত জীবনকে কেন্দ্র করা পচা ভাপসানো জীবনে, যেখানে একটি নবজাত

শিশু, একটি পরিপুষ্ট বিস্ময়, জন্মিয়া মরিয়া যায়। বার বার জন্মিয়া বার-বার মরিয়া যায়।

যতীনের মনে যত আলো ছিল সব নিভিয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে তাহার মনে এককালীন হাস্যকর কত কুসংস্কারের যে জন্ম হইয়াছে, সংখ্যা হয় না। কয়েক দিন ভাবিয়াই প্রত্যাদেশে তাহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। দেবতা একদিন যার কাছে ছিল অলস কল্পনা, ধর্ম্ম ছিল বার্দ্ধক্যের ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান ছিল অনমনীয় যুক্তি, আজ সে আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়ত আবার সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দিবেন।

কিন্তু কোন্ দেবতা? তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কামাখ্যা, কোথায় তাহার প্রত্যাদেশ আসিবে?

যতীন নিজে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। মহাশ্বেতাকে সে পরামর্শ করিতে ডাকে। 'কোথায় গিয়ে হত্যে দেওয়া ভাল শ্বেতা?'

মহাশ্বেতা সব চেয়ে দূরবর্ত্তী একটি পীঠস্থানের নাম স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলে: 'কামাখ্যায় যাও।'

'আমি যাব?' যতীন স্তম্ভিত হইয়া যায়: 'এ অবস্থায় আমি কি করে যাব?'

মহাশ্বেতা বলে: 'কে যাবে তবে?'

'কেন তুমি যাবে। স্বামীর অসুখ হলে স্ত্রী গিয়েই হত্যে দেয়, প্রত্যাদেশ নিয়ে আসে।' মহাশ্বেতা বলে: 'আমি? আমি গেলে প্রত্যাদেশ পাব না। ঠাকুর-দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই।'

'বিশ্বাস নেই?' মন্তব্যটা যতীনের অবিশ্বাস্য মনে হয়।

'একফোঁটাও নয়। হত্যে দেবার কথা ভাবলে আমার হাসি আসে।'

যতীন রাগিয়া ওঠে।

'তা পাবে না? হাসি তো পাবেই। হাসি নিয়েই যে মেতে আছ। এদিকে স্বামী মরছে, ওদিকে আরেকজনের সঙ্গে হাসির হররা চলছে। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ।'

মহাশ্বেতা বলে: 'কার সঙ্গে হাসির হররা চলছে?

'তাই যদি জানব তুমি তবে এখনো এ বাড়ীতে আছ কি করে?' যতীন পচন-ধরা নাক দিয়া সশব্দে নিশ্বাস গ্রহণ করে, গলিত আঙ্গুলগুলি মহাশ্বেতার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া আর্তনাদের মত বলিতে থাকে: 'ভেবো না, ভেবো না, তোমারও হবে। আমার চেয়ে আরও ভয়ানক হবে। এত পাপ কারো সয় না।'

হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙ্গুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরে জোরে ঘষিয়া দেয়। আগুন দিয়া আগুন ধরানোর মত সংক্রামক ব্যাধিটাকে সে যেন মহাশ্বেতার দেহে চালান করিয়া দিয়াছে এমনি একটা উগ্র আনন্দে অভিভূত হইয়া বলে: 'ধবল বলে, তোমাকেও ধবল বলে। আমাকে ঘেন্না করার শাস্তি তোমার জুটল বলে। আর দেরী নেই।'

এই অভিশাপ দেওয়ার পর মহাশ্বেতা যতীনকে একরকম ত্যাগ করিল। সেবা সে প্রায় বন্ধ করিয়া আনিয়াছিল, এবার কাছে আসাও কমাইয়া দিল। সকালে একবার যদি কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া যতীনকে সে দেখিয়া যায়, সারাদিন আর তাহার দেখা মেলে না। রাত্রে শোয়ার আগে একবার শুধু উঁকি দিয়া যায়। মুহূর্তের জন্য। পরিহাসের মত।

যতীন ক্ষেপিয়া উঠিয়া মহাশ্বেতাকে শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী হইতেই তাড়াইয়া দিত কিনা বলা যায় না, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সে নিজেই প্রত্যাদেশ আনিতে কামাখ্যায় চলিয়া গেল। যতীনের পীড়াপীড়িতে, ক্রুদ্ধ আদেশ ও সকরুণ মিনতিতে, মহাশ্বেতা সঙ্গে যাইতে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু যাত্রা করার সময় তাহাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। যতীনের এক পিসী বলিল : মহাশ্বেতা কালীঘাটে গিয়াছে। যতীনের চাকরকে সঙ্গে করিয়া যতীনের মোটরে এই খানিক আগে মহাশ্বেতা কালীঘাটে চলিয়া গিয়াছে।

গোড়াপত্তন কালীঘাটেই হইয়াছিল। মহাশ্বেতা যে যতীনকে বলিয়াছিল, ঠাকুর দেবতায় সে বিশ্বাস করে না একথাটা তাহার সত্য নয়! সত্য হইলে যতীনের কামাখ্যা যাওয়ার দিন অত টাকা খরচ করিয়া সে পূজা দিত না, একধামা পয়সা ভিখারীদের বিতরণ করিত না।

এ কাজটা মহাশ্বেতা নিজেই করিয়াছিল। মন্দিরে ঢুকিবার পথে দুদিকে সার দিয়া ভিখারী বসিয়া ছিল। চাকর আর মোটরচালকের হাতে পয়সার ধামাটা তুলিয়া দিয়া আগে আগে চলিতে চলিতে মহাশ্বেতা দুদিকে মুঠা মুঠা পয়সা বিলাইয়াছিল। সে হইয়াছিল এক মহাসমারোহের ব্যাপার। শুধু ভিখারী নয়, ভিক্ষা দেওয়া দেখিতে রাস্তায় লোক জমা হইয়া গিয়াছিল অনেক।

ভিখারীদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীও ছিল বৈকি! হাতে পায়ে কারো ছিল চট বাঁধা, কারো নাক গলিয়া গিয়া একটা গহ্বরে পরিণত হইয়াছিল, কারো সমস্ত মুখের ফাঁপানো মাংস বড় বড় গোটায়

ভরিয়াছিল, কারো কব্জির কাছ হইতে দুটি হাত বহুকাল আগে খসিয়া গিয়া ঘা শুকাইয়া হইয়াছিল মসৃণ। এদের পয়সা দিবার সময় মহাশ্বেতার একটি মুষ্টিতে কুলায় নাই! এদের দিয়া এক ধামা পয়সায় কুলানো যায় নাই।

বাড়ী ফিরিয়া সেই দিন বিকালে মহাশ্বেতা কুষ্ঠাশ্রম খুলিয়াছে।

চাকর সেদিন পথ হইতে পাঁচজন ভিখারীকে ধরিয়া আনিয়াছিল। তাদের মধ্যে দু'জন হাজার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভেও এখানে থাকিতে রাজী হয় নাই। বাকী তিনজন সেই হইতে আরাম করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। খায়-দায়-ঘুমায় আর মহাশ্বেতাকে ক্ষণে ক্ষণে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করায়, আর তাদের কাজ নাই। সাতদিনের মধ্যে মহাশ্বেতার আশ্রমবাসীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে একুশজন।

আত্মীয়-স্বজন সকলকে সে ভিন্ন বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিয়াছে। মাহিনা-করা কয়েকজন চাকর দাসী মেথর আর বাড়ী-ভরা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে সে এখানে বাস করে একা। সকালে বিকালে এদের দেখিয়া যাওয়ার জন্য সে একজন ডাক্তার ঠিক করিয়াছে। দু'জন অভিজ্ঞ নার্সের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার বলিয়াছে: 'এখানে আপনাকে কুষ্ঠাশ্রম খুলতে দেবে না।

'কেন?'

'সহরের মাঝখানে এধরণের আশ্রম কি খুলতে দেয়?'

মহাশ্বেতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছে: 'ওরা তো সহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি বাড়ীর মধ্যে ভরে বিপদ আরও কমিয়েছি'।

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিয়াছে: 'তবু দেবে না। তবে কি জানেন, এসব হ'ল সৎকাজ। সহজে কেউ বাধা দিতে চায় না।

পাড়ার লোকে নালিশ করবে, সে নালিশের তদ্বির হবে, তারপর আপনার কাছে নোটিশ আসবে। তখনও দু'মাস আপনি চুপ করে থাকতে পারবেন। ফের আর একটা নোটিশ এলে তখন ধীরে-সুস্থে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন।'

ডাক্তারের এত কথার জবাবে মহাশ্বেতা বলিয়াছে: 'কুষ্ঠ কি ভয়ানক রোগ ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তার তাহার বিপুল অভিজ্ঞতায় আবার অল্প একটু হাসিয়াছে: 'এরকম কত রোগ সংসারে আছে! মানুষকে একেবারে নষ্ট করে দেয়, বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে থাকে এমন রোগ একটা নয়, মিসেস দত্ত।'

বংশ! পুরুষানুক্রম! কে জানে ডাক্তার কতখানি টের পাইয়াছিল? যতীন শুধু সন্দেহ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাকেই মহাশ্বেতা বঞ্চনা করিয়াছে। ডাক্তার জানিয়াও নির্ব্বিকার হইয়া আছে। হয়ত মনে-মনে ডাক্তার সমর্থনও করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে একটু পার্থক্য থাকিবেই।

নার্স ঠিক হওয়ার আগেই যতীন ফিরিয়া আসিল। সে ঠিক প্রত্যাদেশ পায় নাই, কেমন একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে যে কুণ্ড হইতে একটি সাদা ফুল আনিয়া মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে সে নিরোগ হইতে পারে। বাড়ী ফেরার আগেই যতীন মাদুলি ধারণ করিয়াছে।

বাড়ীর ব্যাপার দেখিয়া তাহার চমক লাগিয়া গেল।

'এসব কি করেছ শ্বেতা?'

মহাশ্বেতার মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসায় বুদ্ধিটাও তাহার বেশ পরিষ্কার ছিল। সে বলিল: 'তোমার কল্যাণের জন্যই করেছি। কালীঘাটে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম, অমন তেজালো সন্ন্যাসী আমি জীবনে কখনো দেখিনি। চোখ যেন আগুনের মত আলো দিচ্ছে। তিনি বললেন: কুষ্ঠাশ্রম কর, তোর স্বামী ভাল হয়ে যাবে।'

মাদুলি ধারণের প্রভাব তখনও যতীনের মনে প্রবল হইয়া আছে। সে অভিভূত হইয়া বলিল : 'সত্যি ?'

'তোমার কাছে মিছে বলছি ? তুমি সে সন্ন্যাসীকে দ্যাখোনি। দেখলে তোমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত। আমাকে কথাগুলি বলে কোনদিকে যে চলে গেলেন কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

যতীন আপশোষ করিয়া বলিল : 'একটা ওষুধ-টষুধ যদি চেয়ে নিতে শ্বেতা !'

বাড়ীর যে অংশ যতীনের ছিল সে আবার সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাদুলি আর সন্ন্যাসীর ভরসায় মেজাজটা সে অনেকখানি নরম করিয়াই রাখিল।

কিন্তু মহাশ্বেতা কাছে ভেড়ে না। কামাখ্যা যাওয়ার আগে যেমন ছিল তেমনি দূরে দূরে থাকে। কুষ্ঠাশ্রম লইয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে। একুশটি অধিবাসীর সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছিলে তার যেন আনন্দের সীমা থাকে না। দিবারাত্রি সে পথে-কুড়ানো এই বিকৃত গলিত মানুষগুলির সেবা করে। মায়ের মত তাহার মমতা, মায়ের মত তাহার সেবা। এই পঁচিশটি অসুস্থ পচা পাঁজর দিয়া যেন তাহার বুক তৈরী হইয়াছে, তার হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা ওরা পায়।

যতীন একদিন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল : 'তুমি খালি ওদেরি সেবা কর শ্বেতা। আমার দিকে তাকিয়েও দ্যাখো না।'

মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।

সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠ-রোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্ত-গুলিকে ভালবাসে।

এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ বুদ্ধির অনায়াসবোধ্য কথা। মহাশ্বেতা দেবী তো নয় ? সে শুধু কুষ্ঠ-রোগীর বৌ।

পূজারীর বৌ

বাহিরে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত পৃথিবীকে এত রাত্রে শুধু কয়েকটী রহস্যময় শব্দের সাহায্যে চিনিতে হয়। কাদম্বিনীর চোখে ঘুম নাই। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কান পাতিয়া সে রাত্রির প্রত্যেকটী দুর্ব্বোধ্য ভাষা শুনিতে থাকে।

ঝিঁঝিঁর শব্দ এমনি একটানা বিরামহীন যে থাকিয়া থাকিয়া আপনা হইতে তাহার শুনিবার অনুভূতি বিরাম নেয়। চেষ্টা করিয়াও আর যেন ডাক শোনা যায় না। ঘরের পিছনে নিমগাছটার পাতায় সহসা বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যায়, শুকনো আমপাতাগুলি উঠানের এক পাশ হইতে অন্য পাশে উড়িয়া যাওয়ার সময় যেন তাহারা প্রতিধ্বনি করে। দূরে শিয়াল ডাকিয়া ওঠে। তাদের আর্ত্তকণ্ঠ নীরব হইবার পর বহুক্ষণ অবধি গ্রামের কুকুরগুলির চীৎকার থামিতে চায় না। কাছেই কোথায় একটা প্যাঁচা বীভৎস চীৎকারে রাত্রিকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কদর্য্য করিয়া তোলে। খানিক পরে অদূরে বড় রাস্তায় গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ওঠে, গরুর গলার বাঁধা ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়।

এবং অতি অকস্মাৎ রাত্রির এই সব নিজস্ব শব্দকে ছাপাইয়া উঠিয়া, কাদম্বিনীর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ তুলিয়া দিয়া, প্রতিবেশী রমেশ হাজরার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া ওঠে।

কাদম্বিনী থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করে, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যায়। রমেশ হাজরার বৌ ছেলে মানুষ, তার ঘুম ভাঙ্গিতে দেরী হয়। ছেলেটা অনেকক্ষণ কাঁদে। শুনিতে শুনিতে কাদম্বিনীর মাথার মধ্যে তার চেতনা নির্ভরহীন হইয়া যায়। একটা অদ্ভুত সমতলতার অনুভূতি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়া তাকে একপাশে টলাইয়া ফেলিয়া দিতে চায়। কাদম্বিনী সভয়ে চৌকীর প্রান্ত দুই হাতে প্রাণপণে চাপিয়া ধরে।

প্রকৃতপক্ষে রমেশ হাজরার ছেলেটার কান্না শুনিবার আশঙ্কাতেই বাসন্তী অমাবস্যার রাত্রিটি কাদম্বিনীর কাছে বিনীদ্র ও শব্দময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। রমেশের বৌ ছেলে হওয়ার সময় এখানে ছিল না। বাপের বাড়ী গিয়াছিল। মাসখানেক আগে চার মাসের ছেলে কোলে সে ফিরিয়া আসিয়াছে। তার কয়েক দিন পরেই তার ছেলের কান্না কাদম্বিনী গভীর রাত্রে প্রথম শুনিতে পায়।

আপনার অসহ্য মনোবেদনা নিয়া কাদম্বিনী সেদিন ঘরের বাহিরে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুপদ অনেক বলিয়াও তাহাকে ঘরের মধ্যে নিতে পারে নাই। শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া খানিকক্ষণ তামাক টানিয়া কাদম্বিনীর পাশে বসিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

এমন সময় রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে মাটির প্রাচীরের ওপাশে শোনা গিয়াছিল ক্ষীণ কণ্ঠের কান্না।

কাদম্বিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আতঙ্কে উত্তেজনায় দিশেহারার মত স্বামীকে সজোরে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

'ওগো, খোকা কাঁদছে। শুনছ? ওগো তুমি শুনছ!'

শুকপদ বলিয়াছিল, রমেশের ছেলে কাঁদছে কাদু। অমন করোনা। ভয় কি।'

কাদম্বিনী অনেকক্ষণ তার কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বিস্ফারিত চোখে দু'বাড়ীর মাঝখানে প্রাচীরটার পাশে আনারস গাছের ঝোপের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বার বার শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল 'ওগো, না, আমার খোকা কাঁদছে। আমি স্পষ্ট শুনছি আমার খোকার গলা, ওই ঝোপের মধ্যে কাঁদছে। ওই শোন, শুনছ? আমার খোকার গলা নয়?'

তারপর হঠাৎ উন্মাদিনীর মত উঠানে নামিয়া গিয়া সে আনারসের ঝোপটার দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। শুকপদ ধরে রাখবা রাখে। সহজে কি তাকে আটকানো গিয়েছিল। [illegible] ধার। আসিয়া খোকা তার উঠানের [illegible] ঝোপের মধ্যে কান্না আরম্ভ করিয়াছে মনে করিয়া শোকাতুরা শীর্ণা মেয়েটির দেহে কোথা হইতে বিস্ময়কর শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল কে জানে।

'ছাড়ো, নিয়ে আসি। ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও। নদীর ধার থেকে খোকা আমার এতদূর এগিয়ে এসেছে, এটুকু ও তো আসতে পারবে না।'

ছাড়া পাওয়ার জন্য বেশীক্ষণ স্বামীর সঙ্গে সে যুঝিতে পারে নাই। সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া শুকপদর বুকে এলাইয়া পড়িয়াছিল। সেই তার প্রথম মূর্চ্ছা। শেষ রাত্রির আগে সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই।

রমেশ হাজরার বৌকেই ছেলে কোলে উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর সেবা করিতে হইয়াছিল। অচৈতন্য স্ত্রীর শিয়রের কাছে বিছানায় পা গুটাইয়া বসিয়া ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে শোয়াইয়া তাকে হাতের চুড়ি

বাজাইয়া পাথা নাড়িতে দেখিয়া গুরুপদর কি মনে হইয়াছিল বলা কঠিন। ঘরের আলোটা যে শুধু তার চোখেই নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল এটা ঠিক।

গ্রামের জমিদার মহীপতি বসাক। গুরুপদ তার পিতার আমলে প্রতিষ্ঠিত দেব মন্দিরের পূজারী। মন্দিরে রাধাশ্যামের মূর্তি আছে। মূর্তির সৌন্দর্য্য অপরূপ। নিকষ কালো পাথর কুঁদিয়া এ মিলন মূর্তি কোন শিল্পী গড়িয়াছিল আজ আর তাহা জানা যায় না। কিন্তু তার প্রতিভা বিগ্রহের মধ্যে আজো বাঁচিয়া আছে। দিনের পর দিন পাথরের দেবতা গুরুপদর চিত্তহরণ করিতেছিল। মন্দিরে যথারীতি পূজা ও আরতি করিয়া, ভোগ দিয়া তার সাধ মিটিত না। মন্দিরের দুয়ার বন্ধ করিয়া যখন তার বাড়ী যাওয়ার অবকাশ, টাকার বিনিময়ে দেবসেবার সাময়িক বিরতি, তখনও অনে[illegible] সে বহুক্ষণ বসিয়া বিগ্রহের সামনে চুপচাপ বসিয়া থাকিত। সেদিন [illegible] সময় যে দেবতাকে বিনামন্ত্রে বিনা গন্ধ পুষ্পে বিনা ধূপ-চন্দনে পূজা ক[illegible]র মা[illegible]

পরদিন মন্দিরে যাইতে তার দেরী হইয়া গিয়াছিল। মহীপতির বিধবা বোন ভাবিনী একটু পূজা পাগলা। জাতিতে তাঁতিনী বলিয়া বিগ্রহের কাছে ঘেঁষিবার অধিকার তার ছিল না। মন্দিরের একটা চাবি কিন্তু সে আঁচলে বাঁধিয়া নিয়া বেড়াইত। বিগ্রহকে সেও বোধ হয় ভালবাসিয়াছিল। কাছে না যাইতে পাক মধ্যে মধ্যে মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া চুরি করিয়া দূর হইতে রাধাশ্যামকে দেখিবার সাধ সে দমন করিতে পারিত না। ভোরে মন্দিরে আসিয়া গুরুপদর প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে সেদিন সে এমনি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে দেরী হওয়ায় কৈফিয়তটা আগাগোড়া শুনিয়াও প্রথমে তার একবিন্দু সহানুভূতি হয় নাই।

পূজা শেষ হইলে কিন্তু বলিয়াছিল, 'কথাটা ভাল নয় ঠাকুর মশায়,

দুটো শ্লোক মনে পুষে রেখেছে, তারপর ভাবি মাসে মুচ্ছোটা হ'ল। শুনে থেকে মনটা কেমন করছে। আপনি এক কাজ করুন, কাদুদিদির নামে সঙ্কল্প করে দু'টো ফুল দেবতার পায়ে ছুঁইয়ে সঙ্গে নে যান। কাদুদিদির কপালে ঠেকিয়ে তুলে রাখবেন।'

কাদুর কোল শূন্য হইয়া যাওয়া বন্ধ করার জন্য, কাদুকে শান্তি দিবার জন্য, দেবতার সাহায্য গুরুপদ অনেকবারই চাহিয়াছিল। দেবতা তাহার কামনা পূর্ণ করেন নাই। তবু, ভাবিনীর কথায় গুরুপদ ব্যাকুল আগ্রহে পুনরায় মনের কামনা নিবেদন করিয়া দেবতার পায়ে ফুল ছোঁয়াইয়া নিয়া গিয়াছিল।

মনে মনে কোন দেবতাকেই কাদম্বিনী আর ভালবাসিত না। ঘর খালি-করা, কোল খালি করা, বুক খালি করা শোক যারা দেন তাদের কাদম্বিনী ভালবাসিবে কেমন করিয়া? তবু ফুল হয় তাহার উপকার কম হয় নাই। বিকালের দিকে উঠিয়া সে গুরুপদকে খাইতে দিয়াছিল, ও পাড়ার কানুর মার সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় পা ধুইয়া কিছুক্ষণ আহ্নিক করিতেও বসিয়াছিল। রাতে সকাল সকাল শুইয়া সেই যে ঘুমাইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি একবারও তার ঘুম ভাঙ্গে নাই।

তারপর কয়েকদিন তার নিস্তেজ শান্ত ভাবটি বজায় ছিল। পাশের গ্রামে গুরুপদর এক মাসী থাকিত, গুরুপদ নিজে গিয়া মাসীকে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিল। দু'বেলা রান্নার কাজকর্ম মাসীই করিত কিন্তু গো সেবা, স্বামী সেবা আর ঘর দুয়ার সাফ করার কাজে কাদম্বিনী তাকে হাত দিতে দিত না।' মাঝে মাঝে পুকুরঘাটে গিয়া সে বাসন মাজিত। কলসী ভরিয়া জলও আনিত। বাগান দিয়া যাওয়া আসার সময় চকিত সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দুপাশে চাহিয়া দেখিত। তার যেন মনে হইত বাড়ীর

আনাচে-কানাচে, বাগানের গাছের আড়ালে তার হারাণো ছেলে ছুটিকে সে হঠাৎ এক সময় দেখিতে পাইবে।

মাসী বলিত—ভারি কাজ নাই-বা করলে বোমা? পোড়া গতর নিয়ে আমি তবে রয়েছি কি জন্যে! টুকি টাকি কাজ করতে চাও কর, আর নয় বসে বসে কাথা সেলাই করে যাও। কম কাথা চাই কি! শেষে দেখো কাথার জন্যে কত ভুগতে হয়। ক্ষেমির মেয়ে হবার আগে ওকে কত বললাম, বললাম, ও ক্ষেমি, শুয়ে বসে দিন কাটাসনে মা, এই বেলা দু'খানা পারিস সেলাই করে নে। তা মেয়ে কথা শুনলে না,—ওমা অমন হু হু করে কেঁদে উঠলে কেন বোমা? কেঁদো না বাছা, কেঁদো না, কাঁদতে নেই। অমঙ্গল হয়।

কাদম্বিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, কাথা দিয়ে কি হবে মাসিমা? কাঁথায় কে শোবে? কাথা যে আমার একবারও পুরোণো হতে পেল না মাসিমা?

মাসী অবশ্য তাকে যথারীতি আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়াছিল, কিন্তু কাদম্বিনীর আশ্বাস পাওয়ার অবস্থা নয়। চোখের সামনে সূর্য্য ওঠে, চোখের সামনে অস্ত যায়। জগতের সর্ব্বোত্তম বিষয় সূর্য্যের উদয়াস্তে মানুষ বিশ্বাস করে। দু'দুবার কাদম্বিনীর জীবনের সমস্ত অবলম্বন তারই মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিয়াছে, আসিবার সম্ভাবনা পার হইয়া যাইবার পর, অনেক তৃষ্ণাতুর দিবারাত্রি যাপনের শেষে, অকালে। দুবারই তার চোখের সামনে জীবনের আনন্দ তার চোখের পলকে অস্ত গিয়াছে। উদয়াস্তের এই একত্র সমাবেশেই কাদম্বিনী বিশ্বাস করে। সে বুঝিয়াছে ছেলে তার বাঁচিবে না। ছেলের জন্যে তপস্যা করিয়া অসময়ে সে মাতৃত্বের বর পাইয়াছে। তার মাতৃত্ব আসিবে, সন্তান থাকিবে না, একি আর কাদম্বিনীর বুঝিতে বাকী আছে।

তারপর এক সময় রমেশের ছেলের একটানা কান্নার মাঝে মাঝে বিরাম পড়িতে লাগিল। খানিক পরে কান্না একেবারেই থামিয়া গেল। এতক্ষণে তার মায়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

কাদম্বিনীর জগতে আর লেশমাত্র শব্দ রহিল না। আপনার চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ার স্তব্ধতা তার চারিদিকে ঘেরিয়া আসিল। মধ্যে মধ্যে কেবল গুরুপদর নিঃশ্বাস ফেলিবার শব্দ তাকে ক্ষণিকের জন্য সচেতন করিয়া দিতে লাগিল।

বসন্তকালের জোরালো বাতাস এক জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া অন্য জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কাদম্বিনীর মনে হইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া তার শীত করিতেছিল। কাঁথাটা সে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া নিল। রমেশ হাজরার ছেলে আজ রাতে আবার কখন কাঁদিয়া উঠিবে ঠিক নাই। কয়েকদিন আগে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও ছেলেটাকে কাদম্বিনী মধ্যরাতে একবারের বেশী কাঁদিতে শোনে নাই। তবু প্রতি মুহূর্তেই কাদম্বিনী তার কান্না শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ঘুমের ঘোরে গুরুপদ পাশ ফিরিয়া শুইল। বাহিরে নিমগাছের ডালে প্যাঁচাটা আবার কর্কশ স্বরে ডাকিয়া উঠিল। হঠাৎ স্বামীর উপর কাদম্বিনীর অভিমানের সীমা রহিল না। দুটি সন্তানকে বিসর্জন দিয়া প্রতিবারে মানুষ সে কেমন করিয়া এমন শান্তভাবে ঘুমাইতে পারে সে ভাবিয়া পাইল না। তার মনে হইল, গুরুপদ হয়তো কোনদিন স্বপ্নেও দ্যাখে না। হয়ত ওর ঘুমের দেশেও তার খোকারা আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যও উঁকি দিয়া যায় নাই। হয়ত সোনার জ্যোতি ভরা সুখের স্বপ্ন ওর চোখে মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিয়াছে।

কাদম্বিনীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। এতকাল স্বামীকে সে দেবতার মতই পূজা করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি সজ্ঞান মুহূর্ত্ত স্বামীর সুখ সুবিধার চিন্তায় ব্যয় করিয়াছে। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই তার দুর্ব্বিসহ মর্ম্মবেদনা যেন নিমেষে লঘু হইয়া আসিয়াছে। ধার্ম্মিক সংযত দেবপূজক স্বামীর ভালবাসা পাইয়া চিরদিন সে নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে। তার বারো বৎসর ব্যাপী বিবাহিত জীবনে এক-দিনের জন্য স্বামীর প্রতি সমালোচনার ভাব তার মনে জাগে নাই। তবু আজ কাদম্বিনী সহসা তার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করিল। তার কণ্টকশয্যায় সুখনিদ্রায় নিদ্রিত মানুষটার উপর অশ্রদ্ধায় তার মন পূর্ণ হইয়া গেল।

তার এই সংস্কার-বিরুদ্ধ অভূতপূর্ব্ব মানসিক বিদ্রোহকে বাধা দিবার কোন চেষ্টাই সে করিল না। দিনের আলোয় সুস্থ মনে যে চিন্তার ছায়াপাত হইলে সে শিহরিয়া উঠিত, এখন রাত্রির অন্ধকারে সেই চিন্তাকেই তার উদ্বেগমথিত মন সযত্নে পোষণ করিয়া রাখিল। গুরুপদকে তার মনে হইল নির্ম্মম, স্বার্থপর। মনে হইল, যে দুঃখ ভগবানের দান বলিয়া এতদিন সে জানিয়া রাখিয়াছিল ভগবান তাহা দেন নাই, গুরুপদই তার জীবনে বার বার এই সর্ব্বনাশ আনিয়া দিয়াছে। দু'বার তাকে শেলাঘাত করিয়াও গুরুপদর সাধ মিটে নাই, পুনরায় সেই একই অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছে।

শয্যা ছাড়িয়া কাদম্বিনী মেঝেতে নামিয়া গেল। দু'হাতের কনুই মেঝেতে স্থাপন করিয়া করতলে মুখ রাখিয়া সে যেন একটা শারীরিক যন্ত্রণাই সহ্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইখানে, এই কঠিন মেঝের উপরে বিছানা পাতিয়া তার ছেলে দু'টিকে সে শোয়াইয়া রাখিত, চৌকিতে গুরুপদ করিত শাস্ত্রপাঠ। কাজে তার মন বসিত না, দশ

মিনিট পর পর ঘুমন্ত ছেলেকে না দেখিয়া গিয়া সে স্থির থাকিতে পারিত না, ঘুম ভাঙ্গিয়া কখন ছেলে তার কাঁদিয়া ওঠে শুনিবার জন্য সারাক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। শাস্ত্র পাঠান্তে গুরুপদ যাইত মন্দিরে। মন্দির হইতে ফিরিয়া রমেশ হাজরার সঙ্গে বসিত দাবা খেলিতে। অনেক রাত অবধি হয় মন্দিরে বসিয়া থাকিয়া নয় কারো বাড়ী আড্ডা দিয়া বাড়ী আসিত। তার ছেলের প্রাপ্য সময় ব্যয় করিয়া যে খাদ্য সে প্রস্তুত করিয়া রাখিত তাই আহার করিয়া এমনি নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় রাত কাটাইয়া দিত।

তার ছেলে মরিয়া গেলে তাকে সান্ত্বনা দিত গুরুপদ। নিজের দু'ফোঁটা লোকদেখানো চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া তাকে বুঝাইত, উপদেশ দিত, তার চোখের জলও মুছিয়া দিবার চেষ্টা করিত। ছেলের মরণে এতটুকু দুঃখ হইলে একি গুরুপদ পারিত?

এই স্মৃতিই কাদম্বিনীর চিত্তকে দহন করিতে লাগিল সব চেয়ে বেশী। তার মত তার স্বামীও যদি পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত, আজ যদি সে স্বামীর শোকাতুর মূর্ত্তি কল্পনায় আনিতে পারিত, মনের জ্বালা বোধ হয় তার অনেকখানি জুড়াইয়া যাইত। কিন্তু সন্তানকে নদীতীরে বিসর্জ্জন দিয়া আসিবার পরেও গুরুপদকে বারেকের তরে আত্মহারা হইতে দেখিয়াছিল বলিয়া কাদম্বিনী স্মরণ করিতে পারিল না। তার মনের মধ্যে গুরুপদ মায়া-মমতাহীন অত্যাচারীর রূপ গ্রহণ করিয়া রহিল।

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। গুরুপদর ঘুমন্ত মুখখানি একবার দেখিবার ইচ্ছা সে দমন করিতে পারিতেছিল না। কুলুঙ্গির উপর দিয়াশলাই ছিল। কাদম্বিনী প্রদীপ জ্বালিল।

আলো প্রথমে তার চোখে সহিল না। দুচোখ টন টন করিয়া উঠিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া দিল। বাতাসে নিভিয়া যাওয়ার

উপক্রম কবিতেছিল। কাদম্বিনীব রুদ্ধ চোখেব পাতায় আলোব রক্তিম সংবাদ এমনি একটা বিবক্তিকব চাঞ্চল্য হইয়া বহিল যে, তাব মনের জ্বালা আবও বাড়িযা গেল। চোখ মেলিযা স্বামীব বারো বছবেব দেখা মুখে এই আলোতে যে কি দেখিতে কি দেখিবে ভাবিযা তাব একটু ভয়ও যেন কবিতে লাগিল।

চোখ মেলিযা চাহিবাব পবেও কিছুক্ষণ কাদম্বিনীর এ ভয় কাটিযা গেল না। ঘবেব চাবিদিকে সে তাকাইযা দেখিল, কিন্তু যাব মুখ দেখিবাব জন্য প্রদীপ আনিযাছিল তাব দিকে সহসা দৃষ্টিপাত কবিতে পাবিল না। ঘবেব কোণে কাঠেব সিন্দকটাব উপব কাদম্বিনী ছেলেকে দুধ খাওয়াই-বাব পিতলেব ঝিনুকটি তুলিযা বাখিযাছিল। ব্যবহাবেব অভাবে ঝিনুকটি মলিন হইযা গিযাছে। শোকাচ্ছন্ন এই জড় বস্তুটিকে আজ যেন কাদম্বিনী প্রথম আবিষ্কাব কবিল এমনি ভাবে অনেকক্ষণ সে ঝিনুকটিব দিকে চাহিযা বহিল। তাব বুকেব মধ্যে স্বামীব বিরুদ্ধে মর্ম্মাহত অভিযোগ আবাব যেন নতুন কবিযা উথলিযা উঠিল। গুরুপদ এমনি পাষাণ যে ওই ঝিনুকটি ছাড়া তাব খোকাদেব একটি জিনিষ ঘবে বাখিতে দেয নাই। সে পাগলামী কবে বলিযা, খোকাব [illegible], খোকাব বিছানা-বালিশ বুকে চাপিযা ভগবানেব কাছে তাবস্ববে মৃত্যু প্রার্থনা কবে বলিযা, সব গুরুপদ নদীতে ভাসাইযা দিযা আসিযাছে।

দুটি আবক্ত চোখে একটা অশুভ জ্যোতি নিযা প্রদীপ উঁচু কবিযা ধবিযা কাদম্বিনী সমালোচক শকুব মত গুরুপদব মুখেব দিকে চাহিযা স্থাণুব মত দাঁড়াইযা বহিল। স্বামীব মুখ সে দেখিল না, দেখিল শুধু আপনাব দৃষ্টিব বিকাব। তাব মনে হইল, সমস্ত মানুষটাব মুখে বেখায় বেখায় তাব স্বামীব অত্যাচাবী প্রকৃতি রূপ নিযাছে। তাকে নিযা খেলা কবিবাব কৌতুককব সাধ মুখব ভাবে সুস্পষ্ট ফুটিযা আছে।

কাদম্বিনীর হাত হইতে প্রদীপটা পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। প্রদীপের তেল চলকাইয়া তার হাত বাহিয়া বাহুমূল পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিল। স্বামীর মুখে আপনার বিনাশ চিত্তের আবিষ্কার তাহাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দিতেছিল, তবু সে তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পৃথিবীতে তার বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অবলম্বনকে অন্ধ আবেগের সঙ্গে ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল।

বুঝিতে তাহার আর বাকী রহিল না যে, বাকী জীবনটা তাহার এমনি ভাবে কাটিবে। এক মাসের মধ্যে শূন্য কোল তাহার আবার ভরিয়া উঠিবে, ছয় মাসের মধ্যে কোল খালি করিয়া ছেলেকে তাহার গুরুপদ নদীতীরে রাখিয়া আসিবে। মেঝেতে লুটাইয়া মনের সাধে [illegible] কাঁদিবার অবসরও সে পাইবে না। তার চোখ [illegible] গলা ঝাড়িয়া গুরুপদ তাকে এই শয্যায় [illegible] নদীতীরে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য তার খোকাদের প্রত্যাবর্তন সে [illegible] পারিবে না।

কাদম্বিনীর মনে তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের এই ভয়ঙ্কর ছবি ক্রমে এমনি স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে গুরুপদর মুখ তার চোখের সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল। নিজেকে সে, দেখিতে পাইল এই ঘরের মৃত্যুশীতল আবহাওয়ায় স্বামীর [illegible] পুত্রঘ্নী রাক্ষসীর রূপে। শিশুর ক্রন্দনে মুখরিত রাত্রিতে সে এক একটি শিশুকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে আর গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেছে।

জীবনে আর তার কাজ নাই, উদ্দেশ্য নাই। কাদম্বিনী সরিয়া আসিয়া পিলসুজের উপর প্রদীপ নামাইয়া রাখিল। [illegible] কান্নাকে উপলক্ষ্য করিয়া পর পর অনেকগুলি রাত্রি সে আপনার মৃত সন্তান দুটির সাহচর্য্যে কাটাইয়াছে, তবু বাঁচিবার [illegible]

রাত্রিতেও তার মধ্যে ছিল। এবার ছেলেটি তার বাঁচিতেও পারে এ আশা সে একেবারে ছাড়িতে পারে নাই। আজ আর আশা করিবারও তার সাহস রহিল না। ছেলে হয়ত তার বাঁচিতে পারে। ভগবানের রাজ্যে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আর ভাগ্য পরীক্ষার শক্তি কাদম্বিনী নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যদি না বাঁচে? পলকে পলকে হারাণোর ভয় বুকে পুষিয়া ছ'মাস একবছর মানুষ করার পর যদি মরিয়া যায়? বাঁচিয়া থাকিয়া কাদম্বিনী তাহা সহ্য করিবে কেমন করিয়া?

সিন্দুকের উপর পিতলের ঝিনুকটীর দিকে শেষ বারের মত তাকাইয়া লইয়া কাদম্বিনী ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল। গুরুপদর দিকে চাহিবার সাধ আর তাহার ছিল না। স্বামীর সান্নিধ্য তার কাছে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। তার বারো বছরের-ঘর-কন্না, তার বারো বছরের স্বামী-পূজা আর তার বারো বছরের সুখ দুঃখের স্মৃতি ভরা এই নীড় অতিক্রম করিয়া সে যেন কোন সুদূরতম অন্ধচেতনার দেশে চলিয়া গিয়াছিল, যেখানে আপনার অসহায় একাকীত্বের অনুভূতি ছাড়া মানুষের আর কোন জ্ঞানই থাকে না। পূর্ণ চেতনার বাস্তব জগতে বহুবার পরিত্যক্ত ইচ্ছায় মানুষ সেখানে চালিত হয়।

মন্দিরের চাবী গুরুপদ কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিত। চাবিটি হাতে নিয়া দুয়ার খুলিয়া কাদম্বিনী বাহিরে চলিয়া গেল। উঠানে দাঁড়াইয়া একবার শুধু সে ক্ষণিকের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর আগাইয়া গিয়া সদরের দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিয়া গেল।

এ পাড়ার মানুষ ভিড় করিয়া নীড় বাঁধিয়াছে। রাস্তার দুপাশে স্তব্ধ নিঝুম গৃহগুলি একটির পর একটি অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সময় কাদম্বিনীর কান্না আসিতে লাগিল। এই সব গৃহের অধিবাসী প্রত্যেকটী

পরিবারকে সে চেনে। কোন বাড়ীতে তার মত অভিশপ্ত একটি নারীকে খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে না। পুত্রশোক এ পাড়ায় অজ্ঞাত নয়, হয়ত কোন বাড়ীর অন্ধকার কক্ষে পুত্রশোকাতুরা জননী এখন অশ্রুপাত করিতেছে। কিন্তু তার ছেলের মত অজ্ঞাত কারণে, ঈশ্বরের দুর্ব্বোধ্য অভিশাপে কার ছেলে আজ পর্য্যন্ত মরিয়া গিয়াছে? গর্ভে সন্তান আসিলে ওদের মধ্যে তার মত কোন অভাগিনী জানিতে পারিয়াছে, সুস্থ সবল সন্তান তাহার একদিন তারই কোলে সহসা শুকাইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিনের মধ্যে ধনুকের মত বাঁকিয়া মরিয়া যাইবে?

মন্দিরের সামনে প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির জলে অমাবস্যা রাত্রির উজ্জ্বলতর তারাগুলি ঝিক ঝিক করিতেছে। মন্দিরের সোপানে দাঁড়াইয়া কাদম্বিনী কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দীঘির বিস্তারিত শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তার মনে হইল, মরিবার মত প্রয়োজন ছাড়া এ দীঘিকে যেন ব্যবহার করিতে নাই। অপরাধ হয়।

মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া কাদম্বিনী ভিতরে প্রবেশ করিল। মন্দিরের কোথায় কোন বস্তু রাখা হয় কিছুই তার অজানা ছিল না। অন্ধকারে অল্প একটু হাতড়াইয়াই পিতলের সবচেয়ে বড় কলসীটি কাদম্বিনী আবিষ্কার করিতে পারিল।

কলসীতে জল ভরা ছিল। কাত করিয়া কাদম্বিনী জল ঢালিয়া ফেলিল। কলসী কাঁধে তুলিয়া আন্দাজে রাধাশ্যামের মূর্ত্তির দিকে মুখ করিয়া সে মনে মনে বলিল, তুমি আমার দুটি ছেলে চুরি করেছ। আমি শুধু তোমার একটা কলসী নিলাম। তোমার ক্ষমা চাইনা।

রাজার বৌ

কুড়ি বছর বয়স হইতে যামিনী রাণী।

যামিনীর স্বামী ভূপতির রাজ্য ... জমিদারী মাত্র। বছরে লাখ দেড়েক টাকার বেশী আয় হয় না। ... শুধু উপাধির জোরে। যামিনীও সুতরাং অভিধান ... রাণী। উপাধি ... রাজার বৌ।

... তিন পুরুষের রাজা।

নে আ ... গুণে অপ্রশস্ত ... তাদের ...

জের খয়া ... একটি ... ভবশঙ্কর ...

মাসি ... আড়াইশত টাকা ...

বাস করে ... সন্ধ্যার পর ... তাদের মজলিসে

পূর্ব ... পুরুষদের প্রায় ভারতবর্ষের সমান একটি

শোনা য ... গল্পের ... জমিদারীর তিনটি

দসাম্রাজ্য।

টিয়াছিল ... ভূপতির প্রপিতামহ মহীপতির আমলে।

বশঙ্করের ... রাজার ... জমিদার—পূর্বপুরুষের প্রধান নায়েব।

লত দেওয় ... অস্বর্গ। ... কিন্তু কর্তা ডাকিতেন নায়েব মশাই

বলিয়া। সেই রাগেই কি না বলা যায় না, তবে তারপর কি বড়যন্ত্রই যে মহীপতি করিল, জমিদারী অর্দ্ধেক গেল বিক্রী হইয়া আর অর্দ্ধেক আসিল তাহার কবলে। ভূপতির পিতামহ যদুপতির আমলে বিক্রীত অর্দ্ধেকটা আবার ফিরিয়া আসিল, জমিদারীর প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হইল এবং মরিবার তিন বছর আগে সে হইয়া গেল রাজা যদুপতি রায় চৌধুরী (সরকার), অবন্তীপুব বাজ-এষ্টেট।

তার ছেলে গণপতির শেষ বয়সে একটা সাধ জাগিল যে শুধু রাজা নয়, সে মহারাজা হইবে। বংশানুক্রমে অগ্রগতি প্রয়োজন এমনি একটা কর্ত্তব্য বুদ্ধিব প্রেরণা বোধ হয় তাহাব আসিয়াছিল। জমিদারী হইতে তখন বেশ আয় হইত। মহারাজা হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় গণপতি এত টাকা ঢালিয়া দিয়া গেল যে তাহাতে জমিদারী কিনিলে ছেলেকে হয়ত সে বাজাব উপযুক্ত একটা ছোট খাট রাজ্য দিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু বাড়ানোব পরিবর্তে রাজ্যকে সে ছোটই করিয়া দিয়া গেল।

তার ফলে মুস্কিল হইয়াছে ভূপতির। জমিদ[illegible] র রাজা সাজিয়া থাকা সহজ ব্যাপার নয়। আয়-ব্যয়ের [illegible] চলিতে বত্রিশ বছর বয়সেই ভূপতির মাথায় একটু টাক [illegible]

যামিনীর বিবাহের সময় টাকটা অব[illegible] মাথায়। ভূপতি তখন তেইশ বছরের যুবক। মাথা-[illegible] [illegible]ল সে তখন চাকরের সাহায্যে সযত্নে সীঁথিই কাটিত [illegible]

যামিনী রূপসী। রাজার বৌ বলিয়া [illegible] রূপসী বলিয়াই রাজার বৌ।

সকল রূপের মত যামিনীর রূপও [illegible] রূপের ইতিহাস ব্যাপারটা এই রকম। চার[illegible] পুরুষ [illegible]

বংশের প্রত্যেকটি নরনারীর গায়ের রং ছিল সাঁওতালদের মত কালো এবং চেহারা ছিল চীনাদের মত কুৎসিৎ, চারপুরুষ ধরিয়া সে বংশের সিন্দুক যদি টাকায় ভরা থাকে তবে দেখা যায় চারপুরুষেই বংশের কালিমা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া রূপ ও শ্রীর স্তূপ জমিয়া গিয়াছে। যামিনী রাজার মেয়ে নয় কিন্তু বনেদী ঘরের মেয়ে, অনেক পুরুষ ধরিয়া তাদের লোহার সিন্দুকে অনেক টাকা। অনেক পুরুষের জমা করা রূপ তাই যামিনীকে রূপকথার রাজকুমারীর বাস্তব প্রতিনিধির মত সুন্দরী করিয়াছে। পার্থিব তিলোত্তমার মত বহুকাল ধরিয়া বহু বিভিন্ন রূপসীর রূপ তার মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে। তার বঙ্কিম ভ্রু হইতে পায়ের গোলাপী নখর পর্যান্ত বিচিত্র রূপরেখা ও বিমিশ্র বর্ণ লালিত্যের সমাবেশ।

বিবাহের পূর্ব্বে রাণী হওয়ার আশীর্ব্বাদ যামিনী অনেক শুনিয়াছিল। কিন্তু রাণীর মানুষের ঠিক কি ধরণের অস্তিত্ব সে বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকায় রাণী হওয়ার স্বপ্নও সে দেখিত না, একদিন যে তাকে সত্য সত্যই রাণী হইতে হইবে এ ধারণাও রাখিত না। রাজবধূ হইয়া প্রথম বছরটা তার তাই একটু বিহ্বলতা ও ভয়ের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছিল।

ধরণ-ধারণ চালচলন কিছুই তার শিখিতে বাকী ছিল না। বনেদী মুন্সিয়ানার সঙ্গে জটিল জীবনকে ঠিক মত বুনিয়া চলিবার শিক্ষা তাহার জন্মগত। কিন্তু রাজার বনেদী ঘরের মেয়ে হোক, রাজারাজড়ার বাড়ীতে ঠিক রক্ত-মাংসের মানুষই থাকে কিনা এবিষয়ে তার মনে একটা ক্ষীণ সংশয় বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল। তার কুমারী জীবনের রাজারা সকলেই ছিল উপকথা রামায়ণ মহাভারত ও ইতিহাসের অন্তর্গত। অবন্তীপুর রাজ-এষ্টেটের রাজপুরের সঙ্গে

তার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে একথা যেদিন সে শুনিয়াছিল সেদিন তার কল্পনায় ভাসিয়া আসিয়াছিল রহস্যস্তব্ধ মর্ম্মর-প্রাসাদ, ময়ূর ও হরিণভরা পুষ্পবন, চামর-সেবিত স্বর্ণ সিংহাসন, এবং একদল বিচিত্র উজ্জ্বল বেশধারী গম্ভীর সমুন্নত নর-নারী।

আর কোমরে তরোয়াল-ঝোলানো উষ্ণীষধারী অশ্বারোহী একজন রাজকুমার!

অবন্তীপুরে পা দিয়া এ কল্পনাকে সে আবার তাহার মনের কল্পলোকে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল বটে, অল্প অল্প ভয় তবু তার মনে রহিয়া গেল। বৌরাণীর পদমর্য্যাদা কি, তাকে কি বলিতে ও কি করিতে হয়, কোথায় সরলতার সীমা টানিয়া তাকে কতখানি অভিনয় করিয়া চলিতে হয়—এসব জানা না থাকায় প্রথম বছরটা তার দুর্ভাবনার মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছিল।

স্বামীকে সে বার বার জিজ্ঞাসা করিত,—'দোষ করচি না তো? ভুল হচ্ছে না গো আমার?'

ভূপতি বলিত—'না গো না, দোষও তোমার হচ্ছে না ভুলও তুমি করছ না। সবাই শতমুখে তোমার প্রশংসা করছে।'

'ত্রুটি হ'লে বোলো। শুধরে দিও। শিখিয়ে নিও।'

'তোমার কিছুই শেখবার নেই, মিনি।'

যামিনী ভাবিত, তাই হবে। একথা হয়ত মিথ্যা নয়; আমি অনর্থক বিচলিত হই, ভাবি। রাত্রিটা সে বেশ আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়া কাটাইয়া দিত। কিন্তু পরদিন চারিদিকে জীবনের অরাজক সমারোহে আবার সে অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিত।

তার এই অস্বস্তিকর ভীরুতার কিন্তু কোন রকম কটু অভিব্যক্তি ছিল না। তার প্রকৃতির একটি অপরূপ নম্রতার মতই ইহা প্রকাশ

পাইত। পাড়ার এমনি একটি অ-বনেদী মেয়েদের আবেষ্টনীর মধ্যে যামিনীকে মানুষ হইতে হইয়াছিল যে নিজের অজ্ঞাতেই তার মধ্যে একটা অহঙ্কার প্রশ্রয় পাইয়াছিল। না বুঝিয়া সে তার চেয়ে ছোট ঘরের মেয়েদের মনে ব্যথা দিয়ে বসিত। তাদের অভিমান আন্দাজ করিতে পারিলে মনে মনে হাসিয়া ভাবিত, ছোট মনে ছোট মানেটাই এসেছে আগে। আমি হলে এই নিয়ে রাগ করে নিজেকে ছোট করে ফেলতে লজ্জায় মরে যেতাম। তার কথার ব্যবহারে এই অহঙ্কারটুকু বাড়ীর লোক ছাড়া আর সকলেরই চোখে পড়িত। অবন্তীপুরে আসিয়া নববধূসুলভ লজ্জা ও সঙ্কোচের তলে এটুকু চাপা পড়িয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু গর্ব্ব লয় পাইলেই স্বভাবের একটি মসৃণ ও মার্জ্জিত মাধুর্য্য মানুষের সঞ্চিত হইয়া যায় না। কেবল এই সংস্কারটুকু হইলে তার রূপে সকলে অবাক হইয়া যাইত, তার গুণের প্রশংসা করিত এবং তাব প্রাপ্য ভালবাসাও সে পাইত। তবে যে রকম পাইয়াছে সে বকম পাইত না। কিন্তু আপনার মৃদু ভীরুতায় সে এমনি মিষ্টি হইযা উঠিল যে বিনা-চেষ্টাতেই সে সকলের চিত্তকে সাধারণ জয় কবাব একস্তর উর্দ্ধে যে জয় করা আছে তাহাই করিয়া ফেলিল। তাদের চেয়ে সামান্য একটু বড় বাড়ীতে তাদের চেয়ে সামান্য একটু বেশী বড়লোক পবিবারে আসিয়া শুধু একটি রাজা শব্দকে সমীহ করিয়াই নিজের জন্য পবের বুকে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি জাগাইবার দুর্লভ রমণীয়তা যামিনীর অভ্যাস হইয়া গেল।

বিজিত চিত্তগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপরাজেয় ছিল গণপতির স্ত্রী নগেন্দ্রবালার চিত্ত। সে ছিল মোটা আর ঝাঁঝালো, কুইন এলিজাবেথেব মত দুর্দ্ধর্ষ। স্বামী পুত্রকে বশে রাখিতে সে ভাল-

বাসিত। দাস দাসী ও আশ্রিত পরিজনের প্রতি শাসনের তাহার অন্ত ছিল না। নিজেকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত সংসারটাকে পাক খাওয়াইতে না পারিলে তাহার সুখ হইত না। অধিকারের সীমার মধ্যে নিজেকে সে এত বড় করিয়া রাখিত যে তার পায়ে তেল দিয়া দিয়া কোন রকমে তাহার অনুমতি সংগ্রহ করিতে পারিলে বাড়ীর যে কেহ যে কোন অন্যায় করিতে পারিত।

বৌ এর রূপ দেখিয়া নগেন্দ্রবালা প্রথমে একটু চটিয়াছিল। তাহার এই ঈর্ষাতুর রাগ প্রথম দিকে কিছু কিছু প্রকাশ করিতেও তাহার বাকী থাকে নাই। গোল বাধিত দেবপূজা উপলক্ষে। চিরদিন সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া একটি বৃহত্তর মহত্তর শক্তির কাছে মাথা নত করার জন্য নগেন্দ্রবালার নারী-হৃদয়ের চিরন্তন দুর্ব্বলতা অতৃপ্ত থাকিয়া গিয়াছিল। বেশী বয়সে গৃহ-দেবতার প্রতি ভক্তি তার তাই উথলিয়া উঠিয়াছিল। দেবতার ভোগ ও আরতি তাহার জীবনে একটা মহা সমারোহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বাড়ীর বৌকেও সে এইদিকে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। যামিনীর ইহাতে মুস্কিলের সীমা থাকে নাই। তার বাপের বাড়ীতেও দোল দুর্গোৎসব হয়, কিন্তু নিত্য পূজার ব্যবস্থা সেখানে নাই। পূজা পার্ব্বনের উৎসবের দিকটার সঙ্গেই তাহার পরিচয় ছিল বেশী, ঠাকুর পূজায় ফুল বেলপাতা কোশাকুশি আর নৈবেদ্য লাগে এবং কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া মন্ত্র পড়িতে হয় এর বেশী জ্ঞান তাহার ছিল না। কিন্তু নগেন্দ্রবালার দাবী নিষ্করুণ। এ বাড়ীর যে বধূ, ভবিষ্যতের রাজরাণী, ঠাকুরপূজা যদি সে না শিখিয়া থাকে আর সব শিক্ষাই জীবনে তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। না, অবন্তীপুরের রাজপরিবারে নাস্তিকতা চলিবে না।

'সে কি বৌমা, সে কি কথা? ঠাকুর-সেবা না শিখলে মেয়েমানুষ

স্বামী-সেবার কি জানবে ? আসনের কোন্ দিকে কোশাকুশি রাখতে হয় তাও কি তুমি শেখোনি বাছা ? আর আতপ চালের নৈবিদ্যি কি ওমনি চ্যাপটা করে করতে হয় ?'

নগেন্দ্রবালা এমনি করিয়া বলিত, আঘাত ও লজ্জা দিয়া।

সে আরও বলিত—'না, ভাড়া করা লোকের কাজ এসব নয়। দেবতার কাছে বড়লোকী চলবে না। পরকে দিয়ে স্বামীসেবা হয় না, ঠাকুরের সেবা হবে পরকে দিয়ে। সব করতে হবে নিজেকে। মেঝে ধোয়ার কাজ পর্য্যন্ত।'

যামিনীর হইত ভয়, চোখে আসিত জল। নগেন্দ্রবালা পাইত তৃপ্তি।

কিন্তু রূপেগুণে যে বড়, তার নিরীহ আনুগত্য যদি আন্তরিক হয়, বকিয়া যদি তার চোখে জল আনিয়া দেওয়া যায়, নিজস্ব একটা দামী সম্পত্তির মত ক্রমে ক্রমে তার প্রতি মায়া জন্মে। দেবসেবায় অনভিজ্ঞতা নগেন্দ্রবালার কাছে গুরুতর অপরাধ। কিন্তু নিজেকে শাশুড়ীর ভীরু ও উৎসুক শিষ্যা করিয়া নিজের এ অপরাধকেও যামিনী লঘু করিয়া দিল।

তাহাকে বকিবার ক্ষমতা নগেন্দ্রবালার আর রহিল না। বৌকে সে ভালবাসিয়া ফেলিল।

স্বামীর সঙ্গে যামিনীর যে সম্পর্কটি স্থাপিত হইল তাহা অতুলনীয়। যামিনীকে ভূপতি তাহার সুস্থ মনের নিবিড় কামনা দিয়া জড়াইয়া ধরিল। নারীকে ভালবাসিবার জন্য মানুষের দেহমনে যতগুলি ধর্ম্ম আছে তার সবগুলি দিয়া অপ্রমেয় আবেগের সঙ্গে যামিনীকে সে ভাল বাসিল। সে পড়া ছাড়িয়া দিল। মাসে এক বোতল মাত্র শ্যাম্পেন খাওয়াও সে

ছাড়িয়াছে দেখিয়া গণপতি কিছু বলিল না। নগেন্দ্রবালা একটু ঈর্ষা বোধ করিয়াছিল, কিন্তু সেও বৌএর জন্য ছেলের পড়া ছাড়িয়া-দেওয়ায় বাধা দিল না। ভাবিল, তাই হোক, বৌ নিয়ে মেতে এ বয়সটা ভালয় ভালয় পার হয়ে যাক।

যামিনী প্রথম যেবার বেশীদিনের জন্য অবন্তীপুর আসিল তখন শরৎকাল। শুক্লপক্ষের কয়েকটা রাত্রিতে আকাশের ওই পুরানো চাঁদটির কাছ হইতে এমন জ্যোৎস্নাই পৃথিবীতে ভাসিয়া আসে যে দেখিলে মানুষের মন কেমন করে। এমনি জ্যোৎস্না উঠিলে অনেক রাত্রে নিদ্রিত রাজপুরীর নিশীথ রহস্যকে অতিক্রম করিয়া ভূপতি আর যামিনী উঠিত ছাদে। আলিসা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া তাহারা পৃথিবীকে দেখিত। এদিকে আধা সহর আধা গ্রামখানি নিঃসাড়ে ঘুমাইয়া আছে। হয়ত শুধুই দেখা যায় একটি আধ-ভেজানো জানালায় নিঃসঙ্গ একটি আলো। যামিনী ভাবিত, ওখানে হয়ত তাদেরই মত ভালবাসার জাগরণ এখনো আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছে। ওদিকে দীঘির জলে থাকিত সোনালী রংয়ের চমকিত চাঞ্চল্য। দীঘির ওই তীর দিয়া দুপাশে গাছের সারি বসানো নির্জ্জন পথটি কোথায় কতদূরে চলিয়া গিয়াছে।

যামিনী স্বামীর বুক ঘেঁসিয়া আসিত। ওই স্তব্ধ পথটি ধরিয়া পৃথিবী ছাড়িয়া গ্রহতারার কোন একটা জগতে চলিয়া যাওয়া যায় এমনি একটা কথা ভাবিয়াই সে বোধ হয় ভূপতির দুটি হাত দিয়া নিজেকে বাধিয়া ফেলিত।

বলিত—'পৃথিবী কতকাল আগে সৃষ্টি হয়েছিল বলনা।'

পৃথিবী কত কাল ধরিয়া এমন সুন্দর এমন অপার্থিব হইয়া আছে এই ছিল যামিনীর জিজ্ঞাসা। এমনি স্তিমিত জ্যোতির্ম্ময়ী

রাত্রে ভূপতির উদাত্ত প্রেমকে অনুভব করিতে করিতে সে প্রায়ই এই ধরণের প্রশ্ন করিত। ভূপতি ইহার জবাব দিত তাহার কানে কানে। বলিত—'অনেক দিন আগে গো অনেক দিন আগে। কোটি বছর আগে। প্রথমে সব অন্ধকার ছিল, তারপর ভগবান বললেন আলো হোক, অমনি আলো হ'ল। তিনি তারপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন।' শুনিয়া নিজেকে যামিনীর এত বেশী ছেলেমানুষ মনে হইত যে সে অসহায়ের মত প্রশ্ন করিত, 'আচ্ছা সত্যি ভগবান আছেন?'

বিকালে চাকর গালিচা রাখিয়া গিয়াছে। বিছাইয়া ভূপতি তাহাতে বসিত। তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইত যামিনী। যামিনীর মুখে পড়িত জ্যোৎস্না আর ভূপতির মুখের পিছনে থাকিত আকাশের পটভূমিকা। ব্যাকুল অন্বেষণের দৃষ্টিতে তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। পরস্পরের মুখের সঙ্গে তাহাদের পরিচয়ের যেন শেষ নাই, কোন দিন এ রহস্য তারা যেন বুঝিবে না। যামিনী পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিত, ভূপতি চুল সরাইয়া তাহার কপোলে আবৃত অংশটুকু আবিষ্কার করিত। যামিনী চিবুক ধরিয়া স্বামীর মুখ উঁচু করিয়া সে মুখে ফেলিত জ্যোৎস্না। যামিনীর ঘুম আসিলে তাহার অর্দ্ধনিমীলিত চোখের গাঢ় অতল রহস্যকে ভূপতি চুম্বন করিত, যামিনী তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিত বুকে!

আঠার বছরের কচি মেয়ে সে, সে বলিত—'জানো আমি এখন মরে যেতে পারি।' হাল্কা হাসি তামাসা তাদের বিশেষ ছিল না। তারা খেলা করিত কম। অতর্কিতে যামিনীর খোঁপা যে ভূপতি কখন খুলিয়া দিত না এমন নয়, নিদ্রিত স্বামীর কপালে বড় করিয়া সিঁন্দুরের ফোঁটাও যে যামিনী আঁকিত না তাও নয়

কিন্তু ভূপতির টেরী নষ্ট না করিয়া খোঁপা খোলার প্রতিশোধ যামিনীর লওয়া হইত না। ঘুম ভাঙ্গিয়া যামিনীর আঁচলে কপালের সিন্দুর ভূপতির মোছা হইত না। তাদের সহিত অকাল মরণ ঘটিত। তারা বুঝিতেও পারিত না কখন তারা গভীর অলৌকিক ভাবাবেগে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া গিয়াছে। যে বয়সে প্রেম বহিবস্তুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে বেশী, প্রেমকে লইয়া দুজন মানুষ যে-বয়সে শিশুর মত অর্থহীন খেলা খেলে, ধরা দেওয়ার চেয়ে পলাইয়া বেড়ানোই যখন বেশী মজার ব্যাপার, পূর্ণপরিণত বয়স্ক মানুষের মত তখন তারা সাগরের মত অতল উদ্বেলিত ভালবাসার বিপজ্জনক স্তব অভিনয় করিয়া চলিত।

বিপজ্জনক এই জন্য। মনের পরিণতি তাদের কারো হয় নাই। মনে প্রাণে ছেলে মানুষ ছাড়া তারা আর কিছুই ছিল না। যে অভিজ্ঞতার স্তূপ সারের মত মানুষের মনকে উর্ব্বরা করে, বৃহৎ আবেগকে ধারণক্ষম করে, সে অভিজ্ঞতা তাদের জোটে নাই। বেদনাদায়ক মর্ম্মান্তিক প্রেমের আতিশয্যকে সহ্য করিবার জন্য মনের শক্ত হওয়া দরকার, শক্তি থাকা দরকার। এদের মন সে ভাবে শক্ত হইবার সুযোগও পায় নাই, সে রকম শক্তিও তাদের ছিল না। অথচ তাদের একজন রাজার ছেলে আর একজন বনেদী সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। ওই বয়সেই তারা গম্ভীর হইতে জানিত, জীবনকে একটা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া মনে করিত, পাকা সাজিতে পারিত।

খোলা ছাদে জ্যোৎস্নালোকে তাদের প্রেম-গত অলৌকিক ঝোঁক' সেটাও বয়সের নয়। কিন্তু তাদের উপায় ছিল না। জীবন তাদের হাল্কা হইতে শেখায় নাই, অথচ জীবনের কোন গুরুভার আনন্দ

ও বেদনাকে বহন করিবার উপযুক্তও করে নাই। পরস্পরের মুখে যখন তাদের হাসি ফুটাইয়া রাখা উচিৎ ছিল তখন তারা ভাই স্তব্ধ বিস্ময়ে পরস্পরের ওষ্ঠে অনুচ্চারিত ভাষা শুনিত, যখন তাদের লুকো-চুরি খেলার কথা তারা তখন আত্মহারা পুলকবেদনায় পরস্পরের আরো কাছে ঘেঁসিয়া আসিত।

দুটি লিরিক কবিতা পরস্পরের আশ্রয়ে হইয়া উঠিত মহাকাব্য। জীবন-কাব্যের ধরা বাঁধা ছন্দ ও নিয়মাধীন কাব্য রূপের হিসাবে যাহা অসঙ্গতি, যাহা অনিয়ম।

যামিনীর বিবাহের তিন বছর পরে অবন্তীপুর রাজবাড়ীতে দুটি বিশেষ ঘটনা ঘটিল, গণপতির মৃত্যু ও ভূপতির পুত্র লাভ। এক মাসের মধ্যে নগেন্দ্রবালা হইল রাজমাতা, ভূপতি হইল রাজা আর যামিনী হইল রাণী ও ছেলের মা।

রাণীত্ব যামিনী এমনিই পাইল, কিন্তু ছেলে তত সহজে মিলিল না। ব্যাপার এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে তার এবং তার ছেলের বাঁচিবার কথা নয়। কলিকাতার তিনজন বড় বড় ডাক্তার কি এক অদ্ভুত উপায়ে তাদের দুজনকে বাচাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে কানের কাছে এ কথাও বলিয়া গেলেন যে এই প্রথম এব এই শেষ। যামিনীর আর ছেলে মেয়ে হইবে না।

না হোক রাজ বংশটি রক্ষা পাইয়াছে। ছেলেটা শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে ভূপতির আর একবার বিবাহ না করিলেও চলিবে।

বংশ-রক্ষা পাওয়ার সান্ত্বনাটি নগেন্দ্রবালার এবং অন্যান্য সকলের,

ভূপতির আবার বিবাহ করিতে হইবে না। এ আশ্বাস যামিনীর নিজস্ব, আর কারো নয়।

ভূপতির মনোভাব সঠিক জানিবার উপায় ছিল না। রাজা হওয়ার আগেই সে একটু একটু করিয়া বদলাইয়া যাইতেছিল। রাজা হইয়া সে আরও বদলাইয়া গেল।

না, শ্যাম্পেন অথবা নারী নয়। রাজা হইলেই যে ওসব আপদ আসিয়া জুটিবে এমন কোন কথা নাই। ভূপতির পরিবর্ত্তন কাব্যের প্রতিশোধ।

কেবল অন্তরের আশ্রয় করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারেনা। যামিনীর সঙ্গে সীমাত্তোলিত ভালবাসার খেলা খেলিতে খেলিতে ভূপতি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বাহিরে আশ্রয় খুঁজিতেছিল। আশ্রয়ের অভাবও ছিলনা তার, যামিনীর জন্য এতদিন বরং সে ইহাকে চলিতেছিল এড়াইয়া। যামিনীর মত বৌ পাইলে হৃদয়ের অনেক প্রয়োজন মিটিয়া যায়, কিন্তু জীবনের দাবী থামে না। ভূপতির কাছে সংসারের দাবী ছিল বিপুল। তার জন্ম মুহূর্ত্তে রাজ বাড়ীর শতাধিক নরনারী ও দেড় লাখ টাকা আয়ের জমিদারীর ভবিষ্যৎ ভার তাহাকেই বাহক বলিয়া দাবী করিয়াছিল। শৈশব হইতে জীবন তাহার বাহিরের সমারোহের ভাবাক্রান্ত। তার কাব্যের কোন দিন শেষ থাকে নাই।

সন্তানের আবির্ভাবে যামিনী ও তাহার মধ্যে যে সাময়িক ছেদ পড়িল সেই সুযোগে ভূপতি তার নিজস্ব জগৎটী তৈরী করিয়া লইল। পশুপতির মৃত্যুতে জমিদারীর সমস্ত ভার লইতে হওয়ায় অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যের খাতিরে এই জগৎ তার কায়েমী হইয়া গেল। যামিনীর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ারও প্রয়োজন রহিল না।

অনাবশ্যক উৎসাহের সঙ্গে সে তার জমিদারী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। আজ এই বন্ধুর সঙ্গে শিকারে গেল, কাল অমুক গ্রামে বসাইল মেলা, পরশু এক বড় রাজকর্ম্মচারীর সম্মানে মস্ত একটা ভোজ দিল। গণপতির সে পরের যুগের মানুষ, ঘরে বাহিরে অনেকগুলি সংস্কার সাধনেও তার খুব উৎসাহ দেখা গেল।

মরিতে মরিতে বাঁচিয়া ওঠার ধাক্কায় আর এক ছেলে পাওয়ার আহ্লাদে যামিনী প্রথমটা বেশ ভুলিয়া রহিল। ভূপতির তখন কিছুকালের জন্য—তার প্রয়োজনও ছিল না, সুতরাং সে অভাবও বোধ করিল না। কাঁচা বুকে পাকা ভালবাসা পুষিয়া রাখিতে রাখিতে সেও হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, সেও অন্য আশ্রয় খুঁজিতেছিল।

কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়। ছয় মাসের মধ্যেই তার শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল। মাতৃত্ব লাভের অভিনবত্বও আসিল কমিয়া। ছেলে একরকম সেই আঁতুর হইতেই তার ছিল না। সে রাজার ছেলে—রাজপুত্র। তার সুস্থ ও সবল দুধমা ও ঘুমপাড়ানো মাসিপিসী ভাড়া করা হইয়াছে। সখ করিয়া ছেলেকে কখনো যদি যামিনী কোলে নেয়, সেটা বাহুল্য মাত্র। প্রয়োজন নয়।

তা হোক সেজন্য যামিনীর বিশেষ কোন আফ্‌শোষ ছিল না। সে কলম-পেষা কেরাণীর বৌ নয় যে ছেলে মানুষ করার ঝামেলা তাহাকে সহিতে হইবে, এবং সেই বিরক্তি দিয়াই আপনার স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া লইবে। বড়লোকের ছেলেরা এমনি ভাবেই মানুষ হয়। এ প্রথাকে যামিনী অনুমোদন করে। তা ছাড়া ছেলেকে লইয়া সারাদিন মাতিয়া থাকিলে তার যদি চলিত, এ যদি তার কাম্য হইত যে সন্তানের পিছনে নিজেকে সে ঢালিয়া দিবে, বাধা দিবার কেহ ছিল না। নগেন্দ্রবালা

হয়তো একটু খুঁত খুঁত করিত, ভূপতি হয়তো একটু বিরক্ত হইত, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিবার উপায়ের মত ছেলেকে আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রয়োজন হইলে এই সামান্য বাধা যামিনীকে ঠেকাইতে পারিত না। ছেলেকে সে অমন করিয়া চাহিল না। চাহিল ভূপতিকে।

তার দিনগুলিকে একেবারে অচল করিয়া দিবার মত দূরেই যে ভূপতি বসিয়া গিয়াছে এটা বুঝিতে যামিনীর সময় লাগিল। কিন্তু বুঝিল সে ভাল করিয়াই। কারণ যে অসহ্য প্রেমকে এড়াইয়া ভূপতি কাজ আর অকাজ দিয়া জীবনটা ভরিয়া রাখিতে পারিল, সেই প্রেম ছাড়া যামিনীর আর কোন অবলম্বন ছিল না।

ব্যাকুল উন্মাদনাময় ভালবাসা বহিয়া বহিয়া তার হৃদয় শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া যাক্, ভূপতির সান্নিধ্য সহিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে তার ছুটিয়া পালাইতে ইচ্ছা হোক, কবিতা লিখিবার পর কবি যেমন মরিয়া যায় রাত্রি প্রভাতের পর সারাদিন সে তেমনি ভাবে মরিয়া থাকে, ভূপতিকে সে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না। সে নারী, সে বন্দিনী, তার মুক্তি নাই ; তার কামনার বিবর্ত্তন চিরদিনের জন্য অসম্ভব হইয়া গিয়াছে।

সে একবার ভালবাসিয়াছে, প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত মূহুর্ত্তের বিরাম না দিয়া সে ভালবাসিবে।

অথচ সাধারণ হিসাবে ধরিলে ভূপতি যে তাকে বিশেষ অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তা বলা যায় না। প্রাথমিক মিলনোচ্ছ্বাস কমিয়া আসিলে যে কোন সুখী দম্পতির পরস্পরের প্রতি যে পরিমাণ স্বাভাবিক উদাসীনতা আসে, ভূপতির তার বেশী আসে নাই। বাড়ী থাকিলে এবং কাজ না থাকিলে যামিনীর সঙ্গই সে খুঁজিয়া লইত। বিদায় নেওয়ার সময় যামিনী তাকে আরো একটু থাকিতে বলিলে খুসী হইয়াই

সে আর একটু তার কাছে থাকিত। যামিনী অনুরোধ করিলে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিতেও তাহার বাধিত না। বিনিদ্র যামিনীর সঙ্গে সমানে সে রাত জাগিত না বটে, কিন্তু রাত্রি দশটার মধ্যেই ঘরে আসিত, যামিনীর সঙ্গে গল্প করিত, তাকে আদর করিত, ভালবাসিত। শান্তিপ্রিয় সুখী দম্পতির শান্ত স্বামীর চেয়ে হয়তো এসব সে বেশীই করিত।

কিন্তু গোড়াতে তাদের কিনা সুখী দম্পতির সম্পর্ক ছিল না, ভূপতিকে তাই যামিনীর আগাগোড়া স্তিমিত, অন্যমনস্ক, সুদূর মনে হইত। তার বুক করিত জ্বালা। তার চোখে আসিত জল। স্বামীর নিঃশ্বাসের শব্দটী কাণ পাতিয়া শুনিয়া শিহরিয়া সে নিজের মৃত্যু কামনা করিত।

এবং এমনি অপরিবর্ত্তনীয় এই পৃথিবী আর আকাশের গ্রহতারার বিবর্ত্তন যে প্রতি পূর্ণিমা ও পূর্ণিমার আগে পিছে কতগুলি রাত্রি জ্যোৎস্নায় আলো হইয়া থাকিত। অবন্তীপুর রাজ-এষ্টেটের রাজার বৌ তখন বিছানায় উঠিয়া বসিত। ব্যাকুল হইয়া ভাবিত, আমার সবই আছে, কিন্তু কি নাই ?

স্তরে স্তরে সাজান তার জীবন, তার রাজ্য আছে, রাজা আছে, প্রেমিক আছে, ছেলে আছে, শতাধিক হৃদয়ের প্রীতি আছে, অতীত ভবিষ্যৎ সবই আছে, পরকাল পর্য্যন্ত। তবু কি চায় সে ? স্বামীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া একবার ছাতে যাইতে চায় ? শুধু এই কামনা তার ? এইটুকু পাইলেই সে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইবে।

যামিনী স্বামীর গায়ে হাত রাখিত। কিন্তু তাকে ঠেলিয়া তুলিতে পারিত না। তার কান্না আসিত। তার সীমাহীন দুঃসহ প্রেমের মত ক্রন্দনবেগে সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত।

সকালে বলিত 'কাল কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছিল।'

ভূপতি বলিত,—দেখেছি। রাত্রে একবার উঠেছিলাম।'

যামিনী তখন হাই তুলিয়া বলিত—'জানো গো, কাল রাতে আমার ভাল ঘুম হয়নি।'

ভূপতি বলিত—'আমায় ডাকলে না কেন? গল্প করে তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিতাম।'

গল্প? হায় ভগবান, রাত জাগিয়া গল্প! যামিনীর মনের ভাবটা হইত এই রকম।

সংসারে রাজার বৌকে কম কর্ত্তব্য পালন করিতে হয় না। যামিনীরও অনেক কাজ ছিল। গণপতির মৃত্যুর পর নগেন্দ্রবালা অল্পে অল্পে রাণীত্বের বোঝা বৌএর কাঁধে নামাইয়া দিতেছিল। ইহলোকে কর্ত্তৃত্ব করিবার সাধ বোধ হয় তার মিটিয়াছিল, এবার পরলোককে আয়ত্ত না করিলেই নয়। এই চেষ্টা করিতে করিতে বছর দুই পরে সে ঐখানে চলিয়া গেল। যামিনীর কাজের আর অন্ত রহিল না।

বিচিত্র সে কাজ। ঠাকুরের নৈবিদ্য সাজানো ছাড়া নিজের হাতে কিছুই করিবার নাই, চারিদিকে শুধু নজর রাখা, হুকুম দেওয়া, আর এর নালিশ, ওর তোষামোদ, তার প্রার্থনা শোনা। রাজ সিংহাসনের যেমন এক দিনের জন্যও রাজহীন হওয়া চলে না, রাজ-অন্তঃপুরেরও তেমনি অহরহ কেন্দ্র চাই। যামিনীর কিছুই ভাল লাগিত না, কিন্তু সে ছিল নিরুপায়। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে চাহিয়া নয়, নিজের প্রয়োজনেই রাজ-সংসার তাকে ঘিরিয়া পাক খাইতে লাগিল।

তারপর ছিল প্রসাধন। দু'জন দাসীর সাহায্যেও প্রত্যেক দিন প্রসাধনে যামিনীর অনেক সময় লাগিয়া যাইত। গন্ধতেলে খোঁপা বাঁধিলেই শুধু চলিত না, চুলে তেল বেশী না পড়ে আবার কমও না হয় এটা খেয়াল রাখিয়া একটু একটু করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তেল মাখিতে

হইত। চোখে অদৃশ্য কাজল-পরানোর কাজটা এমন সুক্ষ্ম যে বিস্তারিত ভুমিকা না করিয়া দাসী তুলি তুলিতে সাহস পাইত না। দুধের সর-ভিজান জলে চার পাঁচ বার মুখ ভিজাইতে, বাহুতে চন্দন মাখাইয়া মুছিয়া তুলিতে, পায়ে আলতা পরিতে এবং এমনি সব আরও অনেক কিছু করিতে আকাশের কত উঁচুর সূর্য্যটি গাছের শিয়রে নামিয়া যাইত!

এও পদ্ধতি নিয়ম, অভ্যাসও যামিনীর ছিল। কিন্তু এখন তার বিরক্তির সীমা থাকিত না। ভিতরে ভিতরে মানুষ যখন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইতেছে, বাহিরে তখন এত ঢং কেন?

খোকা এখন একটু বড় হইয়াছিল। দুধ-মা ও মাসীপিসীর ব্যূহ অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যামিনীর ছেলে আবার ক্রমে ক্রমে সরিয়া আসিতেছিল যামিনীরই কাছে। তার হাসি-কান্নার 'মা'কে তার প্রয়োজন হইতেছিল। রাশি রাশি পুতুল লইয়া একা সে খেলিবে না, যামিনীর যোগ দেওয়া চাই। খেলায় শ্রান্তি আসিলে যামিনীর কোলে বসিয়াই সে গম্ভীর মুখে উদাসীন চোখে ছড়ানো পুতুলগুলির দিকে চাহিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িবে। মা চাহিয়া না দেখিলে বাগানে সে ছুটাছুটী করিবে না। মা'র পিঠ ছাড়া আর কারো পিঠে সে আচম্কা ঝাঁপাইয়া পড়িবে না, মা তোষামোদ না করিলে দুধ তাকে কেহ খাওয়াইতে পারিবে না। দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে যামিনী উঠিয়া তার কাছে না গেলে কান্না তার থামিবে না। শিশুর চেয়ে স্বার্থপর জীব জগতে নাই। ওদের মানুষের মূল্য যাচাই নির্ভুল। এই বৃহৎ সংসারে কোন মানুষটার দাম সকলের চেয়ে বেশী কারো বলিয়া দিবার অপেক্ষা না রাখিয়া খোকা নিজেই তাহা স্থির করিয়া লইয়াছিল।

যামিনী। মন্দ লাগিত না। আরও বেশী ভাল যাতে লাগে সেজন্য প্রাণ-

পণ চেষ্টাও সে করিত। কিন্তু অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। স্বামীর উত্তাল ভালবাসার জন্য তীব্র অপূরণীয় ক্ষুধা তার অস্তিত্বের স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন আর তাকে বদলানো যায় না, বিকৃত করা চলে না। স্বামীর অনায়াত্ত স্পর্শকে শুধু কল্পনায় অনুভব করিয়া তার চলিতে পারে কিন্তু তার বদলে খোকাকে বুকে চাপিয়া সাধ মেটান যায় না।

কল্পনাকে যামিনী বিস্ময়কর পটুতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নিজেকে সে যেন দুটি ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিল। এক ভাগ দিয়া সে তাহার সাধারণ জীবনটা যাপন করিয়া যাইত, রাণী সাজিয়া থাকিত, স্ত্রী ও মাতার কর্ত্তব্য পালন করিত, দৈনন্দিন জীবনের ছোটবড় সুখদুঃখের নিজস্ব অংশটি গ্রহণ করিত। অন্য ভাগ দিয়া সে করিত কল্পনা। নিয়মে বাঁধা সচল জীবনের আড়ালে অবসর রচনা করিয়া লইয়া আপনার অচল জীবনকে মনে মনে সে গতি দিত। তার সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, চোখে ফুটিয়া উঠিত উজ্জ্বল অপার্থিব জ্যোতি, একটা উত্তেজিত উল্লাসে তার রক্তের গতি চঞ্চল হইয়া উঠিত। কোথায় পড়িয়া থাকিত এই রাজবাড়ী আর রাজা আর রাজপুত্র, দিনের পর দিন ধরিয়া নিঃসঙ্গ বিরহী মুহূর্ত্তগুলিতে তিল তিল করিয়া সৃজিত বাস্তব-ধর্ম্মী কল্প-লোকে যামিনীর বিবাহের প্রথম বৎসরটীর বারংবার আবর্ত্তন চলিত।

জ্যোৎস্নারাতে যামিনী একাই উঠিত গিয়া ছাদে।

প্রথমে আলিসা ঘেঁসিয়া সে নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। হয় তো বা কোন দিন প্রথম দিকে তার দু'চোখ জলে ভরিয়া আসিত। ঘুমন্ত স্বামীকে, নিস্তেজ বাস্তব জীবনকে সদ্য সদ্য পিছনে ফেলিয়া আসিয়া সহসা সে কল্পনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতে পারিত না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল ভাবিত। তার বিরহ বিধুর জগতে জাগিয়া

থাকিত শুধু কাছের একটি নিঃসঙ্গ বটগাছ, দূরের একটি আলো, আকাশের একক চাঁদ। আজও সুপারি গাছের মাঝখানে সেই জনহীন পথটা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন দিন ঐ পথটার সঙ্কেতও যামিনীর কাছে ভাষার মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। পথের গোড়া হইতে সুরু করিয়া ধীরে ধীরে সে দৃষ্টিকে লইয়া যাইত দূরের অস্পষ্টতায়, থামিত সেইখানে। সঙ্কিত সন্দেহে ঐখানে সে অনেকক্ষণ থামিয়া থাকিত।

তার পর এক সময় সুরু হইত তার কল্পনা। ভূপতির একটি অবিচ্ছিন্ন নিবিড় আলিঙ্গন তাকে ঘিরিয়া নামিয়া আসিত, তার শ্বাসরোধী প্রেমকে অনুভব করিয়া যামিনীর হৃদয় অধীর আগ্রহে স্পন্দিত হইতে থাকিত।

একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বত্রিশ বছর বয়সে ভূপতির মাথায় একটু টাক দেখা দিয়াছিল। শুধু তাই নয়। মাথার মধ্যেও এই সময় তার অল্প অল্প যন্ত্রণা বোধ আরম্ভ হইল। ডাক্তার ছয় মাস দার্জ্জিলিংএ বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন।

ভূপতি ঠাণ্ডা দেশ পছন্দ করে না। বাহির হইতে মৃদু উত্তাপ পাইতেই তার ভাল লাগে। দার্জ্জিলিং-এর বদলে সে বম্বে যাওয়া ঠিক করিল। বোম্বে অনেক দূর। ভূপতি দূরেও যাইতে চায়।

যামিনীকে তার সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না।

ওকে সে এখনও ভয় করে। ওকে উপলক্ষ্য করিয়া তার সেই আদিম উন্মত্ততা ভূপতি এখনো ভোলে নাই।

কিন্তু যামিনী বলিল—'আমিও যাব।'

ভূপতি আপত্তি করিয়া বলিল—'তুমি গিয়ে কি করবে?'

যামিনী সজল চোখে বলিল—'তোমার কাছে থাকব। আমায় না নিয়ে গেলে আমি মরে যাব।'

শুনিয়া ভূপতি অবাক হইয়া গেল। জীবনের কি একটা বিস্মৃত রহস্য প্রভাতের কুয়াশা হইতে মধ্যাহ্নের আকাশে দেখা দিয়াছে।

বোম্বে গিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ভূপতির ভারি মাথা হাল্কা হইয়া গেল। দিনগুলি এখানে অলস, বৈচিত্র্যহীন। এখানে উকিল মোক্তার নাই, রাজ্য বিস্তার নাই, প্রজা-শাসন নাই। প্রভুত্ব এখানে হ্রস্ব, বিরক্তি স্বল্প, বৈচিত্র অপ্রতুল। সে আর যামিনীর মধ্যে এখানে আড়াল কম। খোকা যতদিন রহিল তাকে একরকম মাঝখানে খাড়া করিয়া রাখা গেল। কিন্তু সে এখন বড় হইয়াছে। নামকুমের স্কুলে সে বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়ে। নিজেদের প্রয়োজনে শিক্ষায় ব্যাঘাত দিয়া তাকেও বেশীদিন আটকাইয়া রাখা গেল না।

ভূপতি নিরাশ্রয় অসহায় হইয়া পড়িল।

তাই একদিন সে যামিনীকে বলিল—'তুমি এখনো তেমনি আছ মিনি, প্রায় তেমনি আছ।'

যামিনী বলিল—'তাই কি কেউ থাকে? আমি কতো বদলে গিয়েছি।

তারা পরস্পরের চোখের দিকে চাহিল। কিন্তু পরস্পরকে তারা আর খুঁজিয়া পায় না।

না শীত, না গ্রীষ্ম। বোম্বের আবহাওয়া ধর্ম্মহীন, নিরপেক্ষ। বোম্বের পথ দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের লোক চলাচল করে। বোম্বে সহর ঘুমায় এবং জাগে, বোম্বের আকাশে চাঁদ উঠিতে ছাড়ে না। অবন্তীপুরের রাজা জীবনের যে স্তরগুলি দেশে নামাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে তার তলাকার স্তরগুলি ধীরে ধীরে প্রাণসঞ্চার করে, ইঁটের সমাধিমুক্ত মুমূর্ষু সাদা ঘাসের মত।

ভূপতির ভয় করে, ইচ্ছাশক্তির নীচে আবার সে এই প্রাণকামী কামনাগুলিকে চাপা দিতে চায়, অবন্তীপুরে ফিরিয়া যাওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বড় যার দাবী তাকে ঠেকানো যায় না। জাগরণকে একদিন হয়ত ঘুমের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু ঘুম যখন ভাঙিতে থাকে জাগিয়া ওঠাকে তখন আর কিছুতেই এড়ানো যায় না।

প্রথমে ভূপতি বুঝি ভাবিয়াছিল, যামিনী আজো তেমনি আছে। ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতে শিখিয়া এ ভুল তার ভাঙিয়া যায়। যামিনীকে এখনো চাহিলেই পাওয়া যায় সেই সঙ্গে কি যেন পাওয়া যায় না। স্বামীর বহুবেষ্টনের মধ্যেও যামিনীর একাদন যেমন তাকে স্তিমিত, সুদূর অন্যমনস্ক মনে হইত এবং এখনো খেয়াল করিলে হয়, আজ যামিনীকেও ভূপতির তেমনি নিস্তেজ তেমনি ঘুমন্ত মনে হইতে থাকে।

স্বামীর নবজাগ্রত প্রেমকে যামিনী গ্রহণ করিতে পারে না। সে তার কল্পনাকে লইয়া দিন কাটায়। তার অর্দ্ধনিমীলিত চোখে ভূপতি যখন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাব পূর্ব্ব-পরিচিত অতল রহস্যকে সন্ধান করে যামিনী তখন অন্য একজন ভূপতির স্বপ্ন ছাখে, অন্য একজন ভূপতির দুচোখ ভরা ব্যগ্র উৎসুক প্রেমকে যাচিয়া লয়।

নিশীথ রাত্রে ভূপতি বিনিদ্র চোখে বসিয়া থাকে বিছানায়। যামিনী মৃদু মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া ঘুমায়।

সকালে ভূপতি বলে—'কাল ভাল ঘুম হয়নি মিনি।'

যামিনী বলে—'মাথা ধবেছিল? আমায় ডাকনি কেন? আজ আবার ওষুধটা তা'হলে খাও।'

একদিন অপরাহ্নে তারা ভেহার লেকে বেড়াইতে গিয়াছিল। এই লেক হইতে বম্বে সহরের জলার্থীদের জল সরবরাহ করা হয়। দৃশ্য ভারি সুন্দর! অনেকে লেকের ধারে পিক্‌নিক্ করিতে যায়।

ভূপতির পাশে বসিয়া তাকে যামিনী ভুলিয়া গিয়াছিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেই তার ভাল লাগিতেছে, ভূপতির সান্নিধ্য অনুভব করিবার তার অবসর ছিল না। চারিদিকে কত গাছপালা, সবগুলির নামও সে জানে না। কাছের কতকগুলি পামগাছের গোড়া হইতে ডগা পর্য্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু খানিক দূরে জলের কাছাকাছি এক স্তূপ সবুজ রঙের মধ্যে আট দশটা গাছ প্রোথিত হইয়া আছে। ওই গাছগুলি আর তার মাঝখানে লেকের তীর নীচু, লেকের জল ভিতরের দিকে ঠেলিয়া আসিয়াছে। চার পাঁচটি বোবা পশু ওখানে জল খাইতে নামিল। ওপারে এলায়িত পাহাড়। জল গোড়া ছুঁইয়া আছে।

হঠাৎ ভূপতি যামিনীর একখানি হাত দুহাতের মুঠায় শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। এত জোরে ধরিল যে যামিনীর তাতে ব্যথা পাওয়ার কথা।

যামিনী মুখ ফিরাইয়া অবাক হইয়া গেল।

'কি হয়েছে? হাতে লাগে যে আমার?'

কিন্তু সেদিন লাগিত না।

ভূপতি তার হাত ছাড়িয়া দিল। তার মুখ দেখিয়া যামিনীর সবই বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই সে বুঝিল না। একটা সন্দেহ করিয়া পরম স্নেহে আবার জিজ্ঞাসা করিল—'কি হয়েছে? অসুখ বোধ করছ?'

ভূপতি বলিল—'না। অসুখ নয়।'

যামিনী তার দিকে আর একটু সরিয়া গিয়া নিজের ব্যথিত হাতখানা তার লজ্জিত হাতের উপর রাখিয়া ওপারের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিল। ভূপতি যাহা চায় তার মধ্যে তাহা আছে, তাহাদের সেই অনির্ব্বচনীয় অতৃপ্ত প্রেম। কিন্তু ভূপতি তার নাগাল পাইতেছে না।

একদিন হয়ত যামিনীর কল্পনা থামিয়া যাইবে, হয়ত আকুল হইয়া আজ বাত্রেই অন্ধকারে সে এই বাস্তব ভূপতিকে খুঁজিবে, কিন্তু ভূপতি তখন হয়ত জাগিযা নাই। আবাব কাল বাত্রে ভূপতি যখন আলো জ্বালিযা অপলক চোখে তাব মুখেব দিকে চাহিয়া থাকিবে, সে হযত তখন ঘুমাইয়া আছে। এক সঙ্গে তারা যে আজ পবস্পবকে দাবী কবিবে তাব বাধা অনেক।

উদারচরিতানামের

বৌ

যতীনের মত মজলিসি মিশুক মানুষ দেখা যায় না। বেঁটে গোলগাল মানুষটা, চিকণ চামড়া ঢাকা একটু চ্যাপ্টা ধরণের মুখখানিতে হাসিখুসী ভাবটাই বেশী সময় বজায় থাকে, তবে সময় বিশেষে সমবেদনাভরা গাম্ভীর্য্য, সংশয়ভরা জিজ্ঞাসু আশঙ্কা, বিচারহীন নির্ব্বিকার ক্ষমা, দুঃখ, ক্ষোভ মায়ামোহ এসব ভাবও এমন পরিষ্কার ফুটিয়া থাকে যে পটের ছবিও তার চেয়ে স্পষ্ট নয়। গলার আওয়াজটা একটু মোটা। কিন্তু কথা শুনিয়া মনে হয় মিষ্টত্ব একটু বেশীরকম ঘন হইয়া পড়ার জন্যই বুঝি এটা হইয়াছে। কথা সে যে খুব বেশী বলে তা নয়, যা বলে তাতেই সকলেব প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ভাল, মন্দ, ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত, বোকা, বুদ্ধিমান সকলেই ভাবে কি, উঁহুঁ, লোকটা আমার চেয়ে একটুখানি অধম যদিবা হয় উত্তম একেবারেই নয়, সমানই বরং বলা চলে সব বিষয়ে, আমার আপন জনের মত।

যতীনের কয়েকটা দোষ সকলে অনুমোদন করে না, তার মধ্যে প্রধান মেলামেশা আর খাতির করায় বাছ-বিচারের অভাব। সমজ্ঞানী অবশ্য

যতীন নয়। প্রতিবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামদাসকে মাঝে মাঝে অকারণেই ভক্তিভরে প্রণাম করে বলিয়া বাড়ীর সামনে ফুটপাতে যে মুচীটি বসিয়া থাকে তাকে দিয়া জুতা সারাই করাইয়া নেওয়ার পরে যে পায়ের ধুলা মাথা নেয় তা নয়, তবে যতক্ষণ সে জুতাটা সারাই করে হয়তো সামনে উবু হইয়া বসিয়া সুখ দুঃখের গল্প জুড়িয়া দেয়। ব্যাঙ্কের টাকার পরিমাণে যে বড়লোক যতটা সম্মান চায় যতীন তাকে হয়তো বেশীই দেয় তার চেয়ে, আর যে গরীব মানুষটি উপযুক্ত পরিমাণে অবহেলা না পাইলে দারুণ অস্বস্তি বোধ করে তাকে, তাকেও যথেষ্ট পরিমাণে অবহেলা দিতেও তার বাধে না। তবু বড়লোক আর গরীব দুজনেরই মনে হয়, দুজনকেই যেন সে সমান ভাবে আপন করিয়াছে ঃ বাপ আর ছেলের সঙ্গে দুরকম ব্যবহার করিয়াও কুটুম্ব যেমন দুজনের সঙ্গেই সমান কুটুম্বিতা বজায় রাখে। এটা সকলের ভাল লাগে না, মৃদু ঈর্ষার জ্বালায় মনটা খুঁতখুঁত করে।

বাড়ীতে হরদম লোক আসে, বাপের আমলের মাঝারি আকারের বাড়ীটিতে। ছুটির দিন হয়তো এত লোক আসিয়া হাজির হয় যে ছোটখাট বসিবার ঘরটিতে যায়গা হয় না।

যতীন বলে, 'চলুন দাদা, ওপরে যাই সবাই মিলে।'

কেউ কেউ আপত্তি করে, 'না না, থাক গে। মেয়েদের অসুবিধে হবে।'

'অসুবিধে হবে?' আহত বিস্ময়ে যতীন এমন করিয়া বক্তার মুখের দিকে তাকায় যে মনে হয় গালে চড় মারিয়াই যেন তাকে আহত আর বিস্মিত করিয়া দেওয়া হইযাছে। তার বন্ধুরা বাড়ীর ভিতরে গেলে মেয়েদের অসুবিধা হইবে!

বিনা খবরে সদলবলে যতীন অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়ে। মেয়েরা চটপট রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, শোবার ঘরে আর আনাচে কানাচে আশ্রয় নেয়।

যতীনের বৌ শতদলবাসিনী ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া জলের ডেকচি উনানে চাপাইয়া দেয়—এখনই সকলকে চা দিতে হইবে।

যতীন এক ফাঁকে চট্ করিয়া রান্না ঘরে আসে।—'চা হ'ল ?'

শতদলবাসিনী বলে, 'জল চাপিয়েছি। আন্দাজ কত কাপ ?'

'এই ধরো কাপ চল্লিশেক ?—পান পাঠিও কিন্তু।'

ছুটির দিনের পান সাজার দায়িত্ব সেজ ননদ কৃষ্ণার, বিবাহ হইয়া যতদিন না পরের বাড়ী যায়। জল গরম হইতে হইতে পানের খবরটা আনিতে গিয়া শতদলবাসিনী ত্মাখে কি, পান সাজা হইয়াছে মোট পাঁচ সাতটি, পান সাজার সরঞ্জাম সামনে নিয়া কৃষ্ণা মসগুল হইয়া পড়িতেছে চিঠি। হাতের লেখা চেনা, কার চিঠি তাও জানা।

'ঠাকুরঝি!'

কৃষ্ণা চমকায়, থতমত খায়, চিঠিখানা ব্লাউজের আড়ালে চালান করিয়া দেয়, ঢোক গেলে।—'এই হয়ে গেল বৌদি, এক্ষুনি সেজে দিচ্ছি।'

'চুলোয় যাক তোমার সাজা, ফের আরম্ভ করেছ ? দুদিন বাদে তোর বিয়ে, আর তুই—

'লিখলে আমি কি করব ? আমি তো লিখি না।'

'লেখো কিসের, জবাব না পেয়েও সে চিঠির পর চিঠি দিয়ে যাচ্ছে। এবার কিন্তু ওঁকে সব বলব আমি, আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। একটা কিছু ঘটুক, আর সবাই আমায় দুষুক, জেনেও চুপ করে ছিলাম।'

টুকটুকে রাঙ্গা রঙ শতদলবাসিনীর, রূপের আর সব খুঁত তাতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, চোখ দুটি যে একটু ছোট বড় প্রায় সে খুঁতটা পর্য্যন্ত। মুখ ভার করিয়া ট্যারা চোখে সে তাকায় তার সেজ ননদের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে, আর মুখ নীচু করিয়া কৃষ্ণা নীরবে পান সাজে।

'দেখি কি লিখেছে আবার।'

কৃষ্ণা কাতরভাবে বলে, 'দেখে আর কি করবে বৌদি? বলেই যখন দেবে—

শতদলবাসিনী বলে, 'আচ্ছা, এবারকার মত আর বলব না। কিন্তু ফের যদি তোমরা চিঠি লেখালেখি কর—তুই বুঝিস না ভাই তুদিন পরে তোর বিয়ে—

গভীর আগ্রহে শতদলবাসিনী চিঠি পড়ে, কৃষ্ণার ঠোঁটে দেখা দেয় মুচকি একটু হাসি আর এদিকে রান্নাঘরে উনানে চাপানো চায়ের জলের ডেকচি টগবগ শব্দে বাষ্প ছাড়িতে থাকে। চা দিতেও দেরী হয়, পান দিতেও দেরী হয়।

রাগে আগুন হইয়া যতীন আবার আসিয়া প্রায় দাঁত কড়মড় করিতে করিতে বলে, 'তোমরা সবাই হনুমান—এক নম্বরের জাম্বুবান তোমরা সব। একটু চা আর তুটো পান দিতে কি বেলা কাবার করবে। চাউনি ত্থাখো একবার, মারবে নাকি?

সলজ্জ হাসি হাসিয়া শতদলবাসিনী বলে, 'ওমা, ছি, কি যে বল তুমি! মারব কি গো! গরম জলে হাতটা পুড়ে গেল কিনা।'

'পুড়বে না, যা কাজের ছিরি। নাও নাও, চটপট বানাও চা।'

উপরে মজলিসে ফিরিয়া গিয়া যতীন প্রায় তার বৌ-এর লজ্জা পাওয়া হাসিটাই নকল করিয়া বলে, 'তুধ ছিল না কিনা, একটু দেরী হয়ে গেল চায়ের। যাক, এইবার এসে পড়ছে। চা না হলে কি আলাপ জমে!'

আলাপ প্রচণ্ডভাবেই জমিয়াছিল, বর্ষাকালে মেঘের গলিয়া গলিয়া অবিরাম ধারা বর্ষণের মত, যার ঝম-ঝম গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে শুনিতে মনে হয় বিশ্বব্যাপীই বুঝি হইবে। ঘরখানা মস্ত, আগে যতীনের বাবার শয়ন ঘর ছিল, আসবাবে বোঝাই হইয়া থাকিত। এখন যতীন এ ঘরে শোয় বটে, ঘরে আসবাবপত্র একরকম কিছুই নাই, মেঝের প্রায় সবটা

জুড়িয়াই সতরঞ্চি পাতা, এক কোণে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিছানার তোষকপত্র গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। বসিবার ঘরে সবদিন সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় না দেখিয়া যতীন এ ঘরখানা খালি করিয়া নিয়াছে। বসিবার জন্য দেয়াল দরকার হয় না তাই দেয়ালে অনেকগুলি ছবি আর কেলেণ্ডার লটকানো। দক্ষিণের দেয়ালের মাঝামাঝি প্রকাণ্ড তৈলচিত্র—যে জানে না দেখিলেই তার মনে হইবে নিশ্চয় যতীনের পরলোকগত পিতার ছবি। জিজ্ঞাসা করিলে যতীন মাথা নাড়িয়া বলে, 'ওটা হল গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাবার ছবি।' বছর তিনেক আগে পাশের বাড়ীতে এক ভাড়াটে আসিয়াছিল, বাপের একটি তৈলচিত্রের জন্য তার জোরালো সাধ ছিল। যতীন ছবিটি আঁকাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাসখানেকের জন্য দেশে গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া ত্মাখে, পাশের বাড়ীর নতুন বন্ধুটি কোথায় যে গিয়াছে কেউ জানে না। ছেলের চিকিৎসার জন্য বাড়ীটি যে তারা মোটে ছু'মাসের জন্য ভাড়া নিয়াছে তা কি যতীন জানিত!

কারণ যাই হোক, পূবের দেয়ালে কয়েকজন বিভিন্ন মানুষের সাধারণ কয়েকটি ফটোর মধ্যে নিজের বাবার একটি ফটো টাঙ্গাইয়া রাখিয়া কয়েকদিনের পরিচিত একজনের বাবার তৈলচিত্রকে এতখানি প্রাধান্য দিতে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যায়, ভাবে, যতীনের মনটা সত্যই উদার বটে।

এদিকে, যতীনের মা রান্না ঘরের দাওয়ায় বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করে, 'ছেলে কি বলে গেল বৌমা?'

যতীনের মা কানে একটু কম শোনে। শতদলবাসিনী এতখানি গলা চড়াইয়া তার প্রশ্নের জবাব দেয় যে উপরের ঘরে যতীন আর সমবেত সকলেই প্রত্যেকটি কথা শুনিতে পায়ঃ 'কি আর বলবে, বলে গেল চায়ে দুধ-চিনি কম দিতে, চা খাইয়েই ফতুর হবে।'

এ-ধরণের অপরাধের জন্ত শতদলবাসিনী শাস্তি পায়। দিনের বেলা যতীন সময় পায় না, বাড়ীতে অনেক লোক আসে, নিজেকে অনেক লোকের বাড়ীতে যাইতে হয়। রাত্রে,—হয় তো অনেক রাত্রেই, কারণ বিপদ রোগ আর শোক যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ঘাড়ে সব সময় চাপিয়া থাকিতে ভালবাসে এবং তাদের মধ্যে দু'চার জনকে সাহায্য, পরামর্শ সেবা আর সান্ত্বনা দিতেই যে কত সময় লাগে বলিবার নয়—বাড়ী ফিরিয়া যতীন বৌকে ডাকিয়া তোলে। পাঁচ বছরের ছেলে আর দু'বছরের মেয়েকে নিয়া শতদলবাসিনী এ ঘরের লাগাও ছোট ঘরটিতে শোয়, ছেলেমেয়ের কান্না আর নোংবামি যতীনের সহ্য হয় না। দুটি ঘরের মাঝে দরজা আছে, দরকার হইলে কখনো যতীন নিজেই ও ঘরে যায়, কখনো বৌকে এ ঘরে ডাকিয়া আনে।

শাস্তির রাত্রেও ডাক শুনিয়া প্রথমটা শতদলবাসিনী বুঝিতে পারে না শাস্তির জন্ত তাকে ডাকা হইয়াছে, ঘুম ভাঙ্গার বিরক্তি আর অজানা একটা অস্বস্তির মধ্যেও হঠাৎ উগ্র প্রত্যাশায় সর্ব্বাঙ্গে তার বৈদ্যুতিক রোমাঞ্চ হয়। তারপর এঘরে আসিয়া যতীনের পাতা বিছানা তুলিয়া ঘর-জোড়া সতরঞ্চি উঠাইয়া বাহিরে নিয়া গিয়া তাকে ঝাড়িতে হয়। ঘর ঝাঁট দিয়া আবার সতরঞ্চি বিছাইয়া পাতিতে হয় বিছানা। সমস্তক্ষণ যতীন নীরবে চুরুট টানিয়া যায়।

বিছানা পাতা হইলে চিৎ হইয়া শুইয়া বলে, 'এক গ্লাস জল দাও তো।' জল দেওয়া হইলে বলে, 'হেঁটে হেঁটে পা দু'টো কেমন ব্যথা করছে। একটু টিপে দাও না? না, অপমান হবে?'

'ওমা, অপমান হবে কি গো! কি যে বল তুমি!'

যতীন চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে, ঘুমে ঢুলু ঢুলু ট্যারা চোখ প্রাণপণে মেলিয়া রাখিয়া দু'হাতে শতদলবাসিনী তার পা টিপিয়া দেয়, সে হাত

চুটির রঙ তার হাতের সোনার চুড়ির- রঙের সঙ্গে প্রায় মিশ্‌ খায়।

কৃষ্ণার গোপন চিঠির অদ্ভুত খাপছাড়া লাইনগুলি হয় তো তার মনে পড়িয়া যায়, স্বামীর পা টেপার সময় ওসব লাইন কি মনে না পড়িয়া পারে, যে মেয়ের এখনো স্বামী হয় নাই তার কাছে একটা মাথা পাগলা ছেলের লেখা কাকুতি মিনতি হা হুতাশ ভরা লাইন? মনে পড়িতে পড়িতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া ওঠার মত হঠাৎ তার ঘুম টুটিয়া যায়: পা টেপা শেষ হইলে—? পা টেপার পুরস্কার স্বরূপ—?

সন্তর্পণে গায়ে নাড়া দিয়া সে আধ ঘুমন্ত যতীনকে চোখ চাওয়ায়, সলজ্জ একটু মৃদু হাসি মুখে আনিয়া বলে, 'এবার থাক? পরে আবার দেব'খন, এ্যা?'

'দু'মিনিট দিয়েই হয়ে গেল? বলছি ভয়ানক পা কামড়াচ্ছে।'

ঘরে আলো আছে, রাস্তার একটা আলোও জানালা দিয়া দেখা যায়—অসমান চোখ দু'টি যতক্ষণ জলে ভরিয়া থাকে ততক্ষণ মুখ উঁচু করিয়া সে ঘরের আলোটা ছাখে, তারপর জল শুকাইয়া চোখ ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিলে তাকায় রাস্তার আলোর দিকে। ঘড়িতে সময় চলার টিক্‌ টিক্‌ আর যতীনের নিশ্বাস ফেলার 'স্‌ স্‌' শব্দের সঙ্গে মাঝরাত্রির আরও কত শব্দ সে শোনে, সব শব্দ হয় তো শব্দই নয়।

তারপর এক সময় মেয়েটা কান্না সুরু করে, তার কান্নায় জাগিয়া গিয়া ছেলেটাও সে কান্নায় যোগ দেয়। পা টেপা বন্ধ করিয়া শতদল-বাসিনী বলে, 'ওগো শুনছো, ওরা জেগেছে, আমি গেলাম।'

'না, এখন যেতে হবে না।'

'ওরা যে কাঁদছে?'

'কাঁদুক।'

আর পা টেপায় না, এবার যতীন তার আদরের বৌকে আদর করিয়া করিয়া আলিঙ্গন বাঁধিয়া ফেলে। ছেলে মেয়ের চীৎকার যত সপ্তমে ওঠে তার বাহুর বাঁধনও তত জোরালো। শাস্তিই বটে। এতক্ষণ এত করিয়াও যাকে শাস্তি পাওয়ানো যায় নাই এতক্ষণে যে তার শাস্তি সুরু হইয়াছে দুজনেই তা বুঝিতে পারে, যে শাস্তি দিতেছে সেও যে শাস্তি গ্রহণ করিতেছে সেও।

গোড়া হইতেই শতদলবাসিনী সব জানে, সব বোঝে। তবু সে কিছুই জানিতে চায় না, কিছুই বুঝিতে চায় না, এখনো চেষ্টা করে জয়ের।

'এতক্ষণে রাগ পড়ল ?'

'রাগ আবার করলাম কখন ?'

'কথা বলনি কিনা এতক্ষণ, তাই মনে হচ্ছিল রাগ করেছ। আচ্ছা, আজ দাড়ি কামালে কখন বলতো ? সারাদিন তো একমিনিট সময় পাওনি। কি খাটতেই তুমি পারো, বাব্বা !—অত খেটো না, লক্ষীটি, শরীর ভেঙ্গে পড়বে।' মধুর হাসি হাসে শতদলবাসিনী, যতীন দাড়ি কামাইয়াছে কিনা গালে আঙ্গুল বুলাইয়া বুলাইয়া তাই পরীক্ষা করে। হঠাৎ ভয়ানক বিরক্ত হইয়া বলে, আঃ, কি চিল্লানিটাই সুরু করেছে দুটোতে, জ্বালিয়ে মারলো। মেঝেতে আছড়ে ফেলতে সাধ যায়। ছাড়ো তো দুটোকে শান্ত করে আসি, এখ্‌খুনি আসব, দু'মিনিটের মধ্যে।

'কাঁদুক না। ছেলেপিলের কাঁদা ভাল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসছি, দাঁড়াও।'

যতীন দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে উঠিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে গিয়া শতদলবাসিনী পাশ কাটাইয়া চট্ করিয়া ওঘরে চলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু স্বামীর বাহুর বন্ধনের সঙ্গে বৌ কেন পারিয়া উঠিবে ?

দরজাটা বন্ধ করা হয়, কিন্তু তাতে ছেলেমেয়ের চীৎকারের শব্দ আটকান যায় না। একটু পরেই ওঘরের বারান্দার দিকের দরজায় দুম্ দুম্ করাঘাতের শব্দ পাওয়া যায়, কৃষ্ণার গলা শোনা যায়, বৌদি, ও বৌদি ? কী ঘুম বাবা তোমার !—বৌদি, ও বৌদি ?

কৃষ্ণার বিবাহের মাস ছয়েক দেরী আছে। পাত্রটি তেমন সুবিধার নয়। বাড়ীর অবস্থাও ভাল নয়, নিজের উপার্জ্জনও বেশী নয়, বয়সটাও কম নয়। কৃষ্ণার পছন্দ অপছন্দের অবশ্য প্রশ্নই ওঠে না, বাড়ীর অন্য কারো পছন্দ হয় নাই। মা দিনরাত খুঁত খুঁত করে, বিবাহিতা বড় বোন দু'টি আফশোষ ভরা চিঠি লেখে, আত্মীয় স্বজনেরা জিজ্ঞাসা করে, এমন মেয়ের এমন পাত্র ঠিক করা কেন, বাজারে কি আর ছেলে নাই ?

যতীন বলে, কত লোক বোনের বিয়েই দিতে পারছে না, কাণা খোঁড়ার হাতে দিতে হচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত। আমার বোন বলে কি তার জন্য রাজপুত্তুর আনতে হবে ? মন্দই বা কি ছেলেটি ? স্বাস্থ্য ভাল, রোজগার পাতি করছে—আবার কি চাই ?

তা'ছাড়া পাত্রটি সস্তা।

এটাই যে একটা মস্ত বড় কারণ, শতদলবাসিনীর কাছেই সে কেবল তা স্বীকার করে। টাকাপয়সার টানাটানিটা তার সবসময় লাগিয়াই আছে। বাপের অবস্থা তার ভালই ছিল, দেশে কিছু সম্পত্তি আছে, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ছিল, নিজেও মাসে মাসে বেতন পায় প্রায় তিনশ' টাকা। তবু ধার দিয়া আর দান করিয়া টাকায় তার কুলায় না। ব্যাঙ্কের টাকাগুলি যতদিন ছিল ততদিন চেক কাটিয়া কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে, এখন অসুবিধার সীমা নাই। দেশের সম্পত্তির আয়টা বছরে হাজার

দু'য়ের কাছাকাছি ওঠে নামে। এই আয়টা আছে বলিয়া রক্ষা, নয়'তো কি যে হইত।

বৌ-এর সঙ্গে মাঝে মাঝে যতীন এবিষয়ে আলোচনা করে। স্বামীর মুখে দুর্ভাবনার ছাপ দেখিয়ে শতদলবাসিনী বলে, 'এমন করে টাকাগুলো যদি নষ্ট না কর—'

'নষ্ট মানে?'

'আহা, যাদের ধার দাও, তারা কেউ একটি পয়সা কখনো ফেরত দিয়েছে, না দেবে? যাদের এমনি টাকা দাও, তাদের আদ্দেকের বেশী মিথ্যে কাঁদুনি গেয়ে তোমার ভোলায়।'

'মিথ্যে কাঁদুনি গেয়ে ভোলায়? নাম কর'তো একজনের কে ভুলিয়েছে?'

শতদলবাসিনী আর যতীনের বন্ধু ক'জনের নাম জানে, কাকে কি উপলক্ষে কখন ধার দিয়েছে বা দান করিয়াছে তাই বা সে কি জানে। সে সময় তো যতীন তার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসে না। অনেক ভাবিয়া একটি দৃষ্টান্তই কেবল তার মনে পড়ে। তিন চার বছর আগের ঘটনা, যখন হইতে যতীনের দান করা রোগটা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'কেন, সেই যে সেবার শান্তির বিয়েতে সাতাশ শো টাকা দিলে? ওর বাবার মাইনে কম হোক, ওর দাদা তো সাত আটশো টাকা মাইনে পায়।

যতীন অসহিষ্ণু হইয়া বলে, 'সব দাদাই কি বেশী মাইনে পেলে বোনের বিয়েতে টাকা ঢালে? টাকা কম পড়ল, শান্তির দাদা দিতে চাইল না, তাইতো আমি দিলাম। আমি শেষ মুহূর্তে পাত্র বদলে দিলাম, বেশী টাকার দরকার হল, আমি না দিলে কে দেবে? আমার একটা দায়িত্ব নেই?'

শতদলবাসিনী জিজ্ঞাসা করে না যে পরের মেয়ের কোন পাত্রের

সঙ্গে বিবাহ, সাতাশ শো' টাকার খেসারত দিবার দায়িত্ব নিয়া সে বিষয়ে মাথা ঘামাইতে যাওয়ার কি দরকার পড়িয়াছিল, যতীনকে ওকথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। মৃদুস্বরে সে শুধু বলে, 'নাইবা বদল করতে পাত্র? বেশী ভাল পাত্র এনে লাভ তো হয়েছে ভারি, মেয়ের চোখের জল শুকুচ্ছে না। তার চেয়ে আগের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে হয়তো—'

যতীন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি করে' জানলে শান্তি দু[illegible] পাচ্ছে।'

'ওমা, তাও জানবো না? মেজদি যে আগ থেকে থাকে। ননদ সেজদি নয়, আমার মেজদি সেই যে বিয়ের সময় যে তোমার টিকি কেটে নিয়েছিল না?—সে।'

টাকার আলোচনা বেশিক্ষণ তাদের মধ্যে চলে না, অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যক্তিগত সমালোচনায় দাঁড়াইয়া যায়। এক তরফা সমালোচনা, যতীন বলিয়া যায় আর শতদলবাসিনী চুপ করিয়া শোনে। টাকা সম্বন্ধে শতদল-বাসিনীর মতামত [illegible] পাড়িয়া বলে যতীনকে বাগাবার নয়। ভাল করিয়া [illegible] যায়। তবে তার মূল্য কি? মানুষের চেয়ে টাকা কবে বড় [illegible] এ [illegible] তার শাশুড়ি শতদলবাসিনী", বাপকে বলিয়া যতীনের একটা মানুষের বদলে টাকার একটা বস্তাকে বিবাহ করিলেই পারিত।

'[illegible] তো [illegible] চোখ পাবে। একদিন বিষটিস খাইয়ে দিও বরং।'

'ওমা, বিষ খাওয়ানো কি গো? কি যে বল তুমি।'

আলোচনা হইতেছিল [illegible] এক সন্ধ্যাবেলায়। তিন দিন পরে [illegible] মধ্যে যতীন ভবানীপুর চলিয়া গেল।

'শান্তির জন্য যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি আশ্চর্য্য, সেজদি আন্দাজে কি লিখেছে না লিখেছে—'

'দেখেই আসি কেমন আছে।"

পাঁচদিন পরে সে ফিরিয়া আসিল এবং আসিয়াই শান্তির শ্বশুরের নামে পাঠাইয়া দিল পূবা একটি হাজার টাকা। শতদলবাসিনী ব্যাপারটা জানিতে পারিল আরও দিন সাতেক পরে।

'টাকা পাঠালে কেন ?

যতীন হাই তুলিয়া বলিল, পণের সব টাকা দেওয়া হয়নি বলে ওরা শান্তিকে কষ্ট দিচ্ছিল কিনা, তাই পাঠিয়ে দিলাম।'

সহজ কৈফিয়ৎ, কিন্তু শতদলবাসিনীর ট্যারা চোখের সঙ্গে ভ্রু দুটি পর্য্যন্ত কুঁচকাইয়া গেল।—'টাকা পেলে কোথায় ?'

'তা দিয়ে তোমাব দরকার কি ?'

শতদলবাসিনী উদাসভাবে বলিল, 'না আমার আর দরকার কি। ধার করেছ কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম ?'

'তাই বা জিজ্ঞেস করবে কেন ?'

যতীনের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে বুঝিয়া শাস্তির ভয়ে শতদলবাসিনী আর কথাটি বলে না। টাকা সম্বন্ধে নিজের হীনতার চেয়ে স্বামীর উদারতাই তাকে বেশী কাবু করিয়া ফেলে এবং সেজন্য ক্ষণিকের গ্লানি বা অনুতাপ বোধ করিবার মত উদারও সে নয়। নিজের বোনের বিবাহের বেলায় যার টাকা থাকে না, পরের মেয়ের জন্য সে হাজার হাজার টাকা খরচ করিতে পারে, নিজের না থাকিলে ধার করিয়া যোগাড় করে, এরকম পরোপকার আজ যেন হঠাৎ তার বড় বেশীরকমের খাপছাড়া মনে হয়। এবং দু'একটা দিন কাটিতে মনে হয়, শুধু খাপছাড়া নয়, এটা অন্যায়ও বটে।

কৃষ্ণার জন্য সস্তায় অপাত্র কেনা হইতেছে বলিয়া শতদলবাসিনীর এতদিন বিশেষ আপশোষ ছিল না। যে মেয়ে গোপনে পরের ছেলের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেমন তেমন একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হইয়া যাওয়াই ভাল। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের রোগা লম্বা গোঁয়ার গোবিন্দ এক ছোঁড়া যাকে ওরকম আবোল তাবোল কথা ভরা চিঠি পাঠায়, একটু বেশী বয়সের মোটাসোটা একজনের সঙ্গেই তার বিবাহ হওয়া উচিত—শাসনে থাকিবে। কেন যতীনও তো তাকে বেশী বয়সেই বিবাহ করিয়াছে, বিবাহের সময় যতীনও তো কম গোলগাল ছিল না, কিন্তু তাতে কি আসিয়া গিয়াছে? স্বামীকে অপছন্দ করিয়া সে কি কোনদিন গোপনে কারও সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করিয়াছে? তার যদি এতেই মন উঠিয়া থাকে, কৃষ্ণার উঠিবে না কেন? রূপে বল, গুণে বল, কোন দিক দিয়া তার সঙ্গে কৃষ্ণার তুলনা চলে? এমন রঙ আছে কৃষ্ণার, এমন গড়ন, এমন মধুর স্বভাব? এই সব ভাবিত আর অপাত্র-টিকেই কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তার বিশ্বাস জন্মিয়া যাইত। এবার কিন্তু তার মনে হয়, রূপে গুণে যতই তুচ্ছ আর খারাপ মেয়ে হোক কৃষ্ণা, সে তো শান্তির চেয়ে তুচ্ছ নয়, খারাপ নয়? শান্তির জন্য যদি দফে দফে এত টাকা খরচ করা যাইতে পাবে, কৃষ্ণার জন্য কেন যাইবে না? পরের মেয়ের জন্য যতটা করা হইযাছে, ঘবের মেয়ের জন্য অন্ততঃ ততটুকু করা উচিত।

কিন্তু করিবে কে? যতীনের বড় টাকার টানাটানি।

ভাবিতে ভাবিতে শতদলবাসিনীর সোনার মত মুখের রঙ একটু বিবর্ণ হইয়া আসে, উনানের আঁচেও আর যেন তেমন রঙ খোলে না। সামনে দাঁড়াইয়া সে কৃষ্ণার কণ্ঠার হাড়ের কাছে জমানো ময়লা চাহিয়া ছাখে, পিছন হইতে ছাখে তার দোলনময় চলন। মমতায় কাতর হইয়া

ভাবে, আহা, এই মেয়েকে টাকার জন্যে একটা ধেড়ে হনুমানের কাছে বলি দেওয়া হইবে একটা পিপের মত মোটা জাম্ববান হইবে এই কচি মেয়েটার বর ?

'মুখ তোমার শুকনো দেখাচ্ছে কেন ঠাকুরঝি ?'

'কি জানি, জানি না তো ?'

'না ঠাকুরঝি, অত ভেবো না তুমি। আমি সব ঠিক করে দেব। আর চিঠি লিখেছ ?'

কৃষ্ণা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করে কি না সেই জানে, বলে, 'কে চিঠি লিখবে ?'

'আহা, তোমার সে গো--সে। রোজ পাঁচ দশটা চিঠি লেখালেখি করছ, জাননা কে ?'

'ও, সে ?' কৃষ্ণা হঠাৎ রাগিয়া যায়, 'তুমি কেমন ধারা ইয়ে বৌদি, বলছি আজ পর্য্যন্ত আমি একটা চিঠির জবাব দিইনি, বিশ্বাস হয় না কেন তোমার ?'

শতদলবাসিনীও রাগিয়া যায়, 'কেন দাওনি জবাব ? কি এমন মহাপুরুষটা তুমি যে একটা চিঠির জবাব দিতে বেধেছে ? মিছিমিছি মানুষের মনে কষ্ট দিতে বড্ড ভাল লাগে, না ? মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি।'

কৃষ্ণা যেন মেয়েমানুষ জাতটার সম্মান বাঁচানোর জন্যই বলে, 'একটা জবাব দিয়েছি। লিখে দিয়েছি, ফের আমার কাছে চিঠি লিখলে পুলিশে ধরিয়ে দেব।'

'ওমা, পুলিশে ধরিয়ে দেবে কি গো ? কি যে বল তুমি !'

সে বিব্রত হইয়া থাকে, অশান্তি বোধ করে। ভাদ্রের গরমটা যখনই অসহ্য বোধ হয় তখনই মনে পড়ে আশ্বিনের বেশী দেরী নাই। আশ্বিনের

গোড়ায় কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া যাইবে। তার নিজেরই যেন একটা বড় রকমের বিপদের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। চিঠি লিখিলে পুলিশে ধরাইয়া দিবে লিখিয়া দিয়াছে? তার আগে একখানা চিঠিরও জবাব দেয় নাই? এ আবার কি ব্যাপার! অমন আগ্রহের সঙ্গে কেন তবে সে চিঠিগুলি পড়িত, পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া যাইত? ব্লাউজের আড়ালে চিঠি লুকাইয়া সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইত? বড় প্যাঁচালো কাণ্ড কারখানা সংসারে, বড় গোলমেলে মানুষের চালচলন।

তার এত দুর্ভাবনা কেন শতদলবাসিনী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শান্তির সঙ্গে কৃষ্ণার যেন একটা নেপথ্য সংগ্রাম চলিতেছে, কৃষ্ণার পরাজয়ের কথাটা সে ভাবিতেও পারে না। তাই যদি ঘটে, বাঁচিয়া থাকিয়া সুখ কি? কিসের ছেলে মেয়ে, কিসের স্বামী, কিসের সংসার, কিসের রাঁধা বাড়া!

খাইতে বসিয়া যতীন চীৎকার করে, 'ডালে নুন পড়ে নি, মাছের ঝোল নুনকাটা, দিন দিন কি হচ্ছে শুনি? দূর করে দেব বাড়ী থেকে সব কটাকে—লক্ষ্মীছাড়া বজ্জাত এসে জুটেছে কোথা থেকে, জ্বালিয়ে মারলে।'

মা যদি বা কাণে কম শোনে, এ কথাগুলি শুনিতে পায়। ডাকিয়া বলে, 'বৌমা, খারাপ শরীর নিয়ে কেন রাঁধতে গেলে বাছা? ভাল মানুষের এ গরম সয় না, খারাপ শরীরে—'

যতীন ধমকাইয়া ওঠে, 'তুমি থামো, খারাপ শরীর না তোমার মাথা।'

পাশের বাড়ীর দোতলার ছাদের একদিকের খানিকটা আলিসায় ঝুঁকিলে এবাড়ীর বারান্দা দেখা যায়। নাতির কাঁথা মেলিয়া দিতে দিতে পাশের বাড়ীর গিন্নি আলিসায় ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে বাবা?

মুখ তুলিয়া চাহিয়া যতীন হাসিমুখে বলে, 'কিছু হয়নি পিসীমা। নন্দর চিঠি পেয়েছেন?'

যতীনের পাতানো পিসী সরিয়া গেলে শতদলবাসিনী একবাটি দুধ আনিয়া দেয়। 'আজ দুধ দিয়েই খাও। ক'দিন শাস্তির রান্না খেয়ে এসে আমার রান্না মুখে রুচছে না, না?'

মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারার জন্য ডালের বাটিটা তুলিয়া নিয়া দেখিতে পায় ওবাড়ীর পাতানো পিসীমা আড়ালে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু চলিয়া যায় নাই। আলিসার আড়ালে লুকাইয়া একটা ফাঁক দিয়া এদিকেই চাহিয়া আছে। ডালের বাটিটা যতীন নামাইয়া রাখে।

শতদলবাসিনী বুঝিতে পারে, শাস্তিটা রাত্রিব জন্য তুলিয়া রাখ হইল। তা হোক, শাস্তিব ভয় কে কবে? সব শাস্তিব শেষ আছে কিন্তু কতগুলি ব্যাপার যেন কিছুতেই শেষ হইতে চায় না।

ননদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া সে বলে, 'একখানা চিঠি লেখো না ঠাকুরঝি?'

'কাকে চিঠি লিখব?'

'তোমার সেই তাকে?

'ও, তাকে? তুমিই লেখ না?'

শতদলবাসিনী মুখ ভাব কবিয়া নূনকাটা মাছেব ঝোল মাখা ভাত খাইতে থাকে। অনেকক্ষণ পবে বলে, 'তুমি বড় বোকা ঠাকুবঝি, বড্ড বোকা। আমি হলে কি কবতাব জানো, পালিয়ে যেতাম।'

'পালিয়ে গিয়ে কি খেতে?

'সেও একটা সমস্যা বটে। মেয়েমানুষ হইয়া এ সমস্যাটা না বুঝিযা উপায় নাই। কৃষ্ণা তবে অনেক ভাবিয়াই পুলিশে ধরানোব ভয় দেখাইয়া চিঠি লিখিয়াছে।

কৃষ্ণা খাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। মুখের ভাবটা তার কাঁদ কাঁদ।

'তুমি যে বলেছিলে সব ঠিক করে দেবে, দাওনা? দু'চার দিনের মধ্যে বিয়েটা ঘটিয়ে দাওনা।'

'দু'চার দিনের মধ্যে বিয়ে। কার সঙ্গে?'

'যার সঙ্গে ঠিক হয়েছে, আবার কার সঙ্গে।'

'এই ভাদ্র মাসে?'

'হোক ভাদ্র মাস।'

কথা শুনিলে মনে হয় তামাসা করিতেছে, মুখ দেখিলে বিশ্বাস হয় না। শতদলবাসিনী তাই মাখা ভাত নাড়াচাড়া করিতে করিতে চুপ করিয়া থাকে। কৃষ্ণা অধীর হইয়া বলে, 'চোখ নেই তোমার? আমায় দেখে বুঝতে পার না?'

'একটু একটু যেন বুঝতে পারি পারি করছিলাম ঠাকুরঝি, ভরসা পাইনি। চিঠির জবাব দিতে না বল্লে, অথচ—দেখা হত, না?'

'হত।'

তারপর দুজনেই চুপচাপ। আর খাওয়া গেল না, মাছতরকারীও আজ অখাদ্য হইয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে: ভাদ্র মাসে তো বিয়ে হয় না ঠাকুরঝি একটা মাস দেরী করতেই হবে।'

রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িতে দেরী করিতে থাকে, একজন ঘুমায় তো আরেকজন জাগিয়া ওঠে। যতীন দশটা বাজার আগেই শুইয়া পড়িয়াছিল, ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে শতদলবাসিনী আহ্বানের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া থাকে। আজ সে শাস্তি গ্রহণ করিবে না—যাই বলুক যাই করুক যতীন আজ সে বিদ্রোহ করিবেই। একবার এখন ডাকিলেই হয়। আজ যেন তার সাহস বাড়িয়া গিয়াছে,

সমাজ সংস্কার নীতি ধর্ম্ম সব কিছুর বিরুদ্ধে যাইতে কৃষ্ণার যত সাহস দরকার হইয়াছিল তার চেয়ে বেশী। যতীন ডাকিয়া যেই বলিবে, পা টেপো, মাথা উঁচু করিয়া জবাব দিবে : পারবো না, আমি কি তোমার পা-টেপা দাসী ?

তাবপব ? তাবপর যা হয় হইবে। কৃষ্ণা চোখ মেলিয়া ভবিষ্যতের কত গাঢ় অন্ধকারকে বরণ করিয়াছে, সে চোখ বুজিয়া গালে একটা চড় খাইতে পারিবে না ?

মনের মধ্যে সদিচ্ছার চিতা জ্বলিতে থাকে, বীরত্বের দীপ্তিতে আত্মসম্মান উদ্ভাসিত হইযা ওঠে। নিজেকে শতদলবাসিনীর মনে হইতে থাকে অতি উত্তম, অতি মহৎ—একেবারে অসাধারণ কিছু। কিন্তু হায়, ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়ে, রাস্তার ওপাশের বাড়ী দুটিব সব আলো নিভিয়া যায়, পাড়া নিঝুম হইযা আসে কিন্তু বিদ্রোহ কবাব সুযোগ দিতে কেউ তো ডাকে না।

তারপর যতীনের নাক ডাকাব শব্দ কাণে আসিলে মনটা খাবাপ হইয়া যায়। শাস্তি দিতে না ডাকিযাই ঘুমাইযা পড়িযাছে ? নিজেকে বড় অসহায়, বড নিরুপায় মনে হইতে থাকে।

কিছুক্ষণ পবে উঠিয়া গিয়া শতদলবাসিনী ঘুমন্ত স্বামীব পা টিপিতে আরম্ভ করে।

দৌড়ের বৌ

রসিকের প্রৌঢ়ত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই মৃত্যুভয়। মরণের অবিরাম গুঞ্জন আমি আসিতেছি, আমি আসিতেছি, শুনিয়াও না শুনিবার সতেজ ঔদ্ধত্য ঝিমাইয়া পড়ায় এই বয়সে মানুষের প্রথম খেয়াল হয়, দূর হইতে মরণ আশ্বাস দিয়া বলিতেছে, এখনো সময় হয় নাই, একটু অপেক্ষা কর। মরণের স্বাদ পাইতে পাইতে বৃদ্ধ ভাবে, দেরী আছে, এখনো দেরী আছে ঃ জীবন বিস্বাদ হওয়ায় প্রৌঢ় ভাবে, হায়, দিন যে আমার ফুরাইয়া আসিল।

তাই, রসিক ভাবিত, দু'দিনের জন্য কচি একটা মেয়েকে বৌ করিয়া বাড়ীতে আনা উচিত হইবে না। কেবল তাই নয়, ছেলেমানুষ বৌ নিজে কত ছেলেমানুষী করিবে আর তার কাছে কত ছেলেমানুষী আশা করিবে ভাবিলেও রসিকের বড় অস্বস্তি বোধ হইত। আর কি তার সে বয়স আছে? প্রতিদান দেওয়া দূরে থাক, অল্পবয়সী বৌয়ের অন্তহীন ন্যাকামি হাসিমুখে সহ্য করিয়া চলাও কি তার পক্ষে সম্ভব হইবে? যে চলিয়া গিয়াছে সে ছিল জননী ও গৃহিণী, আসিবে একটি চঞ্চলা বালিকা। তার সঙ্গে কি বনিবে রসিকের ?

প্রয়োজন ছিল না, ইচ্ছা ছিল না, তবু একদিন রসিকের বিবাহ হইয়া গেল।

একদিন অসময়ে তাকে অন্দরে ডাকিয়া সুলোচনা বলিল, এই মেয়েটিকে ত্যাখোতো ঠাকুরপো। ওর নাম সুধারাণী।'

রসিক থতমত খাইয়া বলিল, 'তাই নাকি? তা, বেশ তো।'

কচি খুকী নয়, বেশ বড়সড় মেয়েটি। মুখখানা গম্ভীর। মেঝেতে জাঁকিয়া বসিবার ভঙ্গিতে কেমন একটু গিন্নি' গিন্নি' ভাব আছে। রসিক তো জানিত না সুলোচনাই সুধারাণীকে চওড়া কালোপাড় শাড়ীখানি পরাইয়াছে, কাণের দুল খুলিয়া ফেলিয়া বালা আব অনন্ত পরাইয়াছে, চুলের জটিল বিন্যাস নষ্ট করিয়া মাঝখানে সীঁথি কাটিয়া পিছন দিকে টানিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে আর ধমক দিয়া বলিয়াছে : মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকো বাছা, একটু যদি লজ্জা করবে আমাব ত্যাওরকে দেখে, একটু যদি চঞ্চল হবে...। সুধারাণীকে রসিকের তাই মন্দ লাগিল না।

তারপর সুলোচনার কাছেই শোনা গেল, মেয়েটার নাকি বয়স হইযাছে অনেক। গরীব বাপ নাকি বিবাহ দিতে পারে না, কুড়ি'পার হইয়া মেয়ে তাই হইয়া গিয়াছে বুড়ী।—'সময় মত বিবাহ হলে এ্যাদ্দিনে তিন ছেলের মা হ'ত, ঠাকুরপো।'

বিবাহ করার জন্য এতদিন সকলের অনুরোধ উপরোধ যথারীতি চলিতেছিল, সুলোচনার ব্যবস্থাতেই বোধ হয় এবার সেটা দাঁড়াইয়া গেল রীতিমত আক্রমণে। রসিক হার মানিয়া বলিল, তবে তাই হোক।

সুধারাণীকে' দেখার জন্য হার মানাব ইচ্ছা তার কতটুকু জাগিযাছিল বলা কঠিন।

এমনি কপাল সুধারাণীর, প্রথমবারের আলাপে প্রথম শব্দটিতেই সে রসিকের মন বিগড়াইয়া দিল। বসিকের মনে অনুতাপ, আত্মসমর্থন,

দ্বিধা সঙ্কোচ ঔৎসুক্যের আলোড়ন চলিতেছিল, কখনো জাগিতেছিল বিষাদ, কখনো প্রত্যাশার আনন্দ। নিজেকে নিয়াই সে বড় ব্যস্ত হইয়াছিল।

একদিন রাত প্রায় এগারটার সময় বাহিরের ঘরে কাজ করার নামে সে আকাশ পাতাল ভাবিতেছে, ধীরে ধীরে সুলোচনা ঘরে আসিয়া বলিল, ঠাকুরপো, একটিও নাকি কথা কওনি বৌয়ের সঙ্গে? একটা দু'টো পর্য্যন্ত নাকি কাজ কর এখেনে? ছি ঠাকুরপো, ছি, এমন করে কি কষ্ট দিতে আছে ছেলেমানুষের মনে? ঘরে লুকিয়ে চুপি চুপি আজ কাঁদছিল।'

ভাল উদ্দেশ্যেই সুলোচনা বানানো কথাটা বলিয়াছিল, কিন্তু ফলটা হইল বিপরীত। রসিক ভাবিল, ছেলেমানুষ? কাঁদিতেছিল? কি সর্ব্বনাশ! এতটুকু যার ধৈর্য্য নাই তার কাছে তবে আর কি আশা করা চলিবে?

তবু বিবাহ যখন করিয়াছে, মেয়েটির মনে কষ্ট না দেওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া রসিক আজ প্রথম রাত একটার আগে, সুধারাণীকে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িবার সুযোগ না দিয়াই ঘরে গেল। ভাবিল, সুধারাণীকে বুঝাইয়া দিবে, এসব অবহেলা নয়, আদর, যত্ন, স্নেহমমতার অভাব তার হইবে না। তবে রসিক বুড়া হইয়া পড়িয়াছে কি না, মানাইয়া চলিতে হইলে সুধারাণীর একটু ধীর স্থির শান্ত না হইলে চলিবে কেন?

খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া সুধারাণী বসিয়াছিল, আস্তে আস্তে দুলাইতেছিল দু'টি পা। হয়তো আনমনে, নয়তো অভ্যাসের বশে। একে তো তাকে দেখিলেই মনে হয় কার যেন সে প্রতীক্ষা করিতেছে, তার উপর ঠিক তার বড় মেয়েটির মত দু'পাশে হাত রাখিয়া বসিয়া পা দুলাইতে দেখিয়া রসিক হতাশ হইয়া গেল। হয়তো সুলোচনা জানাইয়া দিয়া গিয়াছে এখনি স্বামী ঘরে আসিবে, কিন্তু এমন বেশে প্রেমিকের পথ চাওয়া

এমন অধীর প্রতীক্ষা কেন? হরিণীর মত চঞ্চলা যে দশ বছরের মেয়ে, তার অনুকরণে পা দোলানো কেন?

রসিককে দেখিয়া সুধারাণী একটু জড়সড় হইয়া বসিল—সামান্য একটু। বেশী লজ্জা করিতে সুলোচনা বারণ করিয়া দিয়াছে। রসিক গম্ভীর মুখে হাত দুই তফাতে বসিল, সভায় আসন গ্রহণ করার মত আড়ম্বরের সঙ্গে।

কি বলিয়া কথা আরম্ভ করা যায়? এত জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা রসিকের, এত ধীর স্থির শান্ত তার প্রকৃতি, একটি তরুণীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিতে গিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম কি দেখা দিল রসিকের কপালে? হায়রে কপাল, সত্তর বছর আগে বিবাহের রাত্রেই প্রমীলার সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া তার তো কথা খুঁজিতে হয় নাই, ঘর খালি হওয়া মাত্র চাপা গলায় মহাকাব্যের ছন্দে আদরের সুরে আপনা হইতেই যেন উচ্চারিত হইয়াছিল, কেমন লাগছে? এখন থেকে তুমি আমার হয়ে গেলে।

অনিশ্চয়তায় বিপন্ন মানুষের মত চিবুকে আঙ্গুল ঘষিতে ঘষিতে শেষে রসিক বলিল, 'তোমায় ক'টা কথা বলব সুধা।'

সুধা কিছুই বলিল না।

'আমার বয়েস হয়েছে, তোমার হয়তো আমাকে ঠিক পছন্দ হয় নি—'

শুনিয়া চেষ্টা করা গম্ভীর মুখে কি দুষ্টামিভরা হাসিই যে দেখা দিল সুধারাণীর; কাণের দুলে আলোব ঝলক তুলিয়া মাথা নীচু করার পলকটির মধ্যে মানুষকে মর্ম্মাহত করা কি তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টিতেই একবার সে চাহিয়া নিল রসিকের চোখের দিকে। অস্ফুটস্বরে সে বলিল, 'ধেৎ।'

রসিক নীরবে তার কাজের ঘরে চলিয়া গেল, যখন মনে হইল এতক্ষণ সুধার পক্ষে জাগিয়া থাকা অসম্ভব, তখনও ফিরিয়া গেল না। কাজের ঘরেই শুইয়া রহিল। প্রমীলার আমলেও এঘরে তার জন্য একটি বিছানা প্রস্তুত থাকিত, যদিও তখন এ বিছানায় সে ঘুমাইত কদাচিৎ।

এঘরে রাত কাটানোর ব্যবস্থা অবশ্য স্থায়ী করা গেল না, লোকে বলিবে কি ? কাজের নামে এখানে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটানো চলে, বিশেষ কাজের নামে মাঝে মাঝে দু'একটা রাত কাবার করাও চলে, কিন্তু ফাজিল একটা মেয়ে বৌ হইয়া অন্দরে প্রমীলার শয়ন ঘরটি দখল করিয়াছে বলিয়াই সে ঘরটিকে তো জীবন হইতে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা যায় না। প্রৌঢ় রসিকের পক্ষে ওরকম ছেলেমানুষী করা অসম্ভব।

ফাজিল বৌটাকেও একেবারে বাদ দিয়া দিন কাটানো যায় না। বিশেষতঃ সুলোচনা যখন আছে এবং কোমর বাঁধিয়া রসিকের পিছনে লাগিয়াছে। নানা ছুতায় সুলোচনা সুধারাণীকে রসিকের কাছে পাঠায়, এমন অবস্থাই সৃষ্টি করে যে রসিকের দৈনন্দিন জীবনের অনেকগুলি খুঁটিনাটি প্রয়োজন সুধারাণীকে ছাড়া মিটিবার কোন উপায় থাকে না। তার ফলে সুধারাণীর অস্তিত্ব রসিকের কাছে খানিকটা অভ্যস্ত হইয়া যায়, টুকরা টুকরা সান্নিধ্যে বাহিরের একটা সহজ সম্পর্ক তাদের মধ্যে গড়িয়া ওঠে, ছোট বড় অনেক উপলক্ষ্য প্রশ্ন আর জবাবের ধাঁচের আলাপ আলোচনাও চলে, কিন্তু আর কিছুই হয় না। মধ্যস্থের চেষ্টায় কবে কোন স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল ঘটিয়াছিল, চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ, ফাগুনের হাওয়া, রাতজাগা বাজে কথার কাব্য, এইসব চিরকালের মধ্যস্থ ছাড়া ?

সুলোচনা বলে, 'ব্যাপার কি বলো তো ঠাকুরপো ? সুধাকে তোমার পছন্দ হয়নি ?'

রসিক বলে, 'বুড়ো বয়সে আবার পছন্দ অপছন্দ।'

'তবু ব্যাপারটা কি শুনি না ? না হয় বললেই আমায় ?'

'সুধা বড় ফাজিল বৌ'ঠান। ফাজিল মেয়ের সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার বয়স কি আমার আছে, আজ বাদে কাল চোখ বুজব আমি ?'

সুলোচনা এবার রাগ করিয়া বলে, 'ফাজিল! সুধা ফাজিল! একটা সাত ছেলের মা বুড়ীকে এনে দিলে তুমি সুখী হ'তে, না? সাত ছেলের মাও কিন্তু একটু আধটু ফাজলামি করে ঠাকুরপো, আর দশটা মানুষের মত। তোমার মত গণেশ ঠাকুর সবাই নয়।'

সুলোচনার রাগ দেখিয়া রসিকের মনের অশান্তি বাড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছা তো করে তার সুধারাণীকে বৌ-এর মত আদর করিতে, কিন্তু অনেকদিন আগে প্রমীলার সঙ্গে যে ছেলেমানুষী খেলার আবছা স্মৃতিটুকু শুধু মনে আছে, আজ সে খেলার পুনরাভিনয় আরম্ভ করার কথা ভাবিলেই তার যে ভয় হয়, বিতৃষ্ণা জাগে। মনে হয়, দূরে বসিয়া থাকিলে যার মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া থাকে, গম্ভীরভাবে তাদের সম্পর্কের গভীর সমস্যার কথা তুলিলে যে দুষ্টামির হাসি হাসে, কাছে গিয়া বসিলেই যার লজ্জা সঙ্কোচ ভীরুতার অসহ্য ন্যাকামি দেখা দেয়, অপটু একটু সেবা-যত্নের চেয়ে সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্য, মুখের কথা আর চোখের চাহনি দিয়া যে দিবারাত্রি মন ভুলানোর চেষ্টা করে, তাকে আপন করিতে গেলে সং সাজিতে হইবে, অভিনয় করিতে হইবে হাস্যকর। অন্য কিছুতে সুধারাণীর মন উঠিবে না, আর কোন খেলা সে বুঝিবে না। প্রমীলার সঙ্গে যে খেলা তার চলিত শেষের দিকে, তার গাম্ভীর্য্য গভীরতা আর মাধুর্য্যের খবর তো সুধারাণী জানে না। সাংসারিক সমস্যার আলোচনা যে চটুল প্রেমের কাকলীর চেয়ে প্রীতিকর হইতে পারে, বুঝাইয়া বলিতে গেলে সুধারাণী মুচকি মুচকি হাসে। প্রমীলার প্রথম বয়সের সেই গা-জ্বালানো হাসি, চুম্বন ছাড়া আর কিছু দিয়াই সে হাসি মুছিয়া নেওয়া যাইত না।

সুলোচনা যতই চেষ্টা করুক, রসিক তাই মনের বিরাগ জয় করিয়া কোন মতেই নতুন বৌকে কাছে টানিতে পারে না এবং এমনিভাবে দিন

কাটিতে থাকে। সুধারাণীর মুখের বিস্ময় ও বিষাদের ভাব ঢাকিয়া ক্রমে ক্রমে এক দুর্ব্বোধ্য অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে থাকে।

কাজের ঘরে প্রতিদিন রাত্রি একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে প্রথম প্রথম রসিকের কষ্ট হইত, মাঝে মাঝে বিছানায় শুইয়া কাজ করিতে গিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িত খেয়ালও থাকিত না। তারপর কিভাবে তার সে স্বাভাবিক ঘুমের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর ঘুম আসে না, ঘুমাইতে চাহিলেও নয়। জাগিয়া থাকার জন্য তাকে আর কোন চেষ্টাই করিতে হয় না। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়, বাড়ী আর পাড়াটা ধীরে ধীরে নিঝুম হইয়া আসে, এই ঘরে শুধু জাগিয়া থাকে রসিক একা। মাথার মধ্যে মৃদু যন্ত্রণা বোধ হয়, দু'চোখ জ্বালা করিতে থাকে কিন্তু ঘুম আসে না। সমস্ত জগৎ চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িতেছে অনুভব করিতে করিতে নিজের চিন্তা আর কল্পনার জগৎ যেন স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে।

প্রমীলার জন্য তখন রসিকের বড় কষ্ট হয়, অবুঝ শিশুর মত তার মন ফিরিয়া চায় প্রমীলাকে। সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে একটা যুক্তিহীন ক্রুদ্ধ অভিযোগ জাগিয়া ওঠার সঙ্গে তার মনে হয়, প্রমীলা থাকিলে এত রাত পর্য্যন্ত তাকে জাগিতে দিত না, জোর করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিত, শুধু কপালে হাত বুলাইয়া ঘুম আনিয়া দিত তার চোখে।

অন্দরের ঘরে গিয়া সুধারাণীকে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিয়া রসিকের সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন ধরিয়া যায়। ইচ্ছা হয়, লাথি মারিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাকে ঘরের বাহির করিয়া দেয়। স্বামীর আগে যে ঘুমাইয়া পড়ে, স্বামীকে যে ঘুম পাড়াইতে জানে না, সে কি মেয়েমানুষ, সে কি বৌ?

সেদিন রাত্রি সবে দশটা বাজিয়াছে। পাড়ার একজন গল্প করিতে

আসিয়াছিল। হাতের আড়ালে তাকে হাই তুলিতে দেখিয়া রসিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'শরীর খারাপ নাকি হে?'

'না, দুপুরে ঘুমোইনি, ঘুম পাচ্ছে।'

একটু পরে আরেকবার হাই তুলিয়া সে চলিয়া গেল। রসিক ভাবিল, কোন ছুতায় মানুষটাকে অনেক রাত পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখিতে পারিলে ঘুমের সঙ্গে তার লড়াইটা দেখা যাইত। মাঝ রাত্রে নিদ্রাহীন চোখে তার জাগিয়া থাকার কসরত দেখিয়া একটু কি আমোদ পাওয়া যাইত না? তা ছাড়া, ঘুম হয় তো সংক্রামক। চোখের সামনে ঘুমে একজনের দেহ অবশ আর চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তার চোখেও হয় তো একটু আবেশ আসিত ঘুমের।

না, তা আসিত না। সুধারাণীকে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াও কি একদিন তার ঘুম আসিয়াছে?

কাজে আর মন বসিল না, উৎসাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চেয়ারটা একটু পিছনে ঠেলিয়া দিয়া হেলান দিয়া বসিয়া রসিক টেবিলে পা তুলিয়া দিল। ঠিক সামনেই দেয়ালের গায়ে বড় একটি ফটো টাঙ্গানো, দামী ফ্রেমের মধ্যে সাধারণ ঘরোয়া সাজে প্রমীলা দাঁড়াইয়া আছে, মুখে দুষ্টামিভরা তৃপ্তির হাসি। ফটোখানা ছাড়া এদিকের দেয়ালটি একেবারে ফাঁকা, এখানে ওখানে কতগুলি পেরেকের দাগ শুধু আছে। বুঝা যায়, আরও দু'চারখানা ফটো বা ছবি এ দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল, সরাইয়া ফেলা হইয়াছে।

গড়গড়ার নল মুখে দিয়া টানিতে গিয়া রসিকের খেয়াল হইল, প্রমীলার ফটো ঘিরিয়া একটা নূতনত্বের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কালও যার অস্তিত্ব ছিল না—টাটকা ফুলের একটি মালা। তাই বটে, সন্ধ্যার পর ঘরে ঢুকিয়া মৃদু একটু ফুলের গন্ধ সে পাইয়াছিল।

তারপর তামাকের ধোঁয়ায় কখন সে গন্ধ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, ফ্যানের বাতাসে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, খেয়ালও থাকে নাই।

কিন্তু প্রমীলার ফটোতে হঠাৎ টাটকা ফুলের মালা জড়াইল কে? এ বুদ্ধি জাগিল কার? প্রথম কয়েক মাস সে নিজেই বিকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় মোড়ের দোকান হইতে মালা কিনিয়া আনিয়া ফটোতে পরাইয়া দিত, একদিন বাসি মালাটি খুলিয়া নতুন মালা পরাইয়া দিবার সময় হঠাৎ তার মনে হইয়াছিল, ফুলের মালা ঘুষ দিয়া স্মৃতির মর্য্যাদা বজায় রাখিতে চেষ্টা করার মত ছেলেমানুষী আর হয় না। একথা কেন মনে হইয়াছিল কে জানে, সেদিন হইতে আর সে মালা কেনে নাই। এতদিন পরে আবার ফুলের মালা দিয়া প্রমীলার স্মৃতিকে পূজা করিল কে?

অন্দরের দরজা একটু ফাঁক করিয়া বাড়ীর চাকর নিখিল ঘরের মধ্যে একবার উঁকি দিয়া চলিয়া গেল। রোজ এই সময় এমনিভাবে সে একবার উঁকি দিয়া যায়। দু'চার মিনিটের মধ্যে সুধারাণী সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, মৃদুস্বরে অনুরোধ জানায়, 'খেতে চলো?' আজও সে আসিল, রসিকের টেবিলে তোলা পায়ের কাছেই টেবিলে হাত রাখিয়া সহজভাবে মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টায় চিবুক পর্য্যন্ত চোখ তুলিয়া বলিল, 'খেতে যাবে না?'

পা নামাইয়া রসিক সোজা হইয়া বসিল।

রসিক জানে, এসব সুলোচনার ব্যবস্থা। খাইতে বসিবার সময় হইলে সুলোচনার হুকুমে নিখিল আসিয়া দেখিয়া যায় ঘরে বাহিরের লোক কেউ আছে কি না, তারপর সুলোচনার হুকুমেই সুধারাণী তাকে ডাকিতে আসে। অল্পদিন আগে তার যে বিবাহ হইয়াছে একথা ভুলিয়া গিয়া অনেকদিনের পুরাণো বৌ এর মত একটু গিন্নি গিন্নি ভাব দেখানোর করুণ

চেষ্টার মধ্যেও রসিক সুলোচনার শিক্ষা ও পরামর্শ স্পষ্টই দেখিতে পায়। কোনদিন সে আমোদ পায়, কোনদিন মমতা বোধ করে। আজ কিন্তু মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল।

'তুমি মালা দিয়েছ ?'

প্রশ্নে নয়, গলার আওয়াজে সুধারাণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। চিরদিন সে বড় ভীরু, তার উপর কুমারী জীবনের অন্তে এই প্রৌঢ় বিপত্নীকের বৌ হইয়া খাপছাড়া অস্বাভাবিক অবস্থায় তার দিন কাটিতেছে।

'এসব ঢং শিখলে কোথায় ? যেখানেই শিখে থাকো, আমি ওসব পছন্দ করি না। বুঝলে ?'

নির্ব্বাক সুধারাণীর আঙুলে আঁচলের কোণটা জড়াইয়া যাইতে থাকে আর রসিক নিজের উপর বিরক্ত হইয়া ভাবে যে রাগ না করিয়াও এমন কড়া কথা সে বেচারীকে বলিল কেন ? এসব কিছু বলার ইচ্ছাও তো তার ছিল না। প্রমীলার ফটোতে মালা টালা সে যেন আর না দেয়, শুধু এই কথাটা সে সুধারাণীকে বলিবে ভাবিয়াছিল। সুধারাণী যদি এখন কাঁদিয়া ফেলে সে কি করিবে ?

সুধারাণী কিন্তু কাঁদাকাটা করিল না, একটু কাঁদো কাঁদোও মনে হইল না তার মুখখানা। একটু রাগের ভঙ্গিতেই যেন দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ফিরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিল। তখন একটা সন্দেহ মনে জাগায় রসিক বলিল, 'যেও না, শোন। বৌঠান তোমাকে মালা দিতে বলেছে নাকি ?'

'জানি না। আমিই যদি দিয়ে থাকি, কি করবে তুমি ? মারবে ?'

জবাব, জবাব দেওয়ার ভঙ্গি, গলার সুর সমস্তই অপ্রত্যাশিত। রসিক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সুধারাণীও যে এতখানি অভিমান করিয়া অন্যায় ভর্ৎসনার এমন ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানাইতে পারে এ যেন একেবারে

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আজ পর্য্যন্ত একবারও সুধারাণীকে সে এমন ভাবে কথা বলিতে শোনে নাই। হয়তো সুযোগ দেয় নাই বলিয়া; সুযোগ পাইলে আগেই হয় তো সে এমনি ভাবে ফোঁস করিয়া উঠিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারিত নতুন বৌ হইলেও সে কাপড়মোড়া তের বছরের ছিঁচকাদুনে খুকী নয়। রসিকের মনে হয়, আজ এইমাত্র সে যেন সুধারাণীর অস্তিত্ব প্রথম অনুভব করিয়াছে, এতদিন সে যেন থাকিয়াও ছিল না।

তাই, কয়েক মুহূর্তের জন্য সে যেন ভুলিয়াই গেল যে সুধারাণী প্রমীলা নয়। প্রমীলা রাগ করিলে যেভাবে তার রাগ ভাঙ্গানো একরকম অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল রসিকের, আজও তেমনি ভাবে বড় রকম ভূমিকা করিয়া সে রাগ দুব কবিতে গেল সুধারাণীর। কিন্তু বেশীদূর এগোনো গেল না, হাত ধরিয়া প্রাথমিক আদরের ভোঁতা কয়েকটা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই সে চাহিয়া দেখিল, সুধারাণীর গাল বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে।

প্রমীলা হইলে কাঁদিত না। আগে হইতে কাঁদিতে থাকিলেও কান্না বন্ধ করিয়া দিত। মুখের মেঘ কাটিয়া হাসি ফুটিতে হয় তো সময় লাগিত অনেকক্ষণ, কিন্তু চোখের জল ফেলিয়া সে ন্যাকামি করিত না।

সুধারাণীর ছেলেমানুষী কান্না সচেতন করিয়া দেওয়ায় রসিক অপ্রস্তুত হইয়া থামিয়া গেল। সোহাগের কথা বন্ধ করিয়া ভদ্রতা করিয়া বলিল, 'খিদে পেয়েছে, চলো খেয়ে আসি। রান্না হয়নি?'

সুধারাণী চোখ মুছিয়া বলিল, 'হয়েছে। রাগ করলে?'

রসিক জবাব দিল না। ক'দিন আগে তার ক্রন্দনশীলা দশ বছরের

মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে দিতে হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় সেও এমনিভাবে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'রাগ করেছ বাবা ?' বলিয়া বাপের রাগের ভয়ে নিজের কান্না সে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

সৰ্ব্ব-বিদ্যাবিশারদের বৌ

বিবাহের রাত্রেই নিবারণ ডানদিকের স্ত্রীকে বাঁদিকে চালান করিয়া দিয়াছিল।

'তুমি এপাশে এসে শোও, কেমন ?'

এই তার প্রথম প্রেমালাপ। সুকুমারী একটু ভীরু আর ভাবপ্রবণ মেয়ে, তার আশঙ্কা আর আশা দুই-ই ছিল অন্তরকমের। ব্যাপারটা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু কারণ জানিবার চেষ্টাও করে নাই। কে জানে, ডানদিকের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হয়তো ব্যাথাট্যাথা হইয়াছে মানুষটার, ডানদিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বৌ-এর সঙ্গে আলাপ করিতে কষ্ট হইবে। এইরকম একটা অনুমান করিয়া সে নীরবে স্বামীর সঙ্গে শয্যায় স্থান পরিবর্তন করিয়াছিল।

সুকুমারী কোন প্রশ্ন করিল না দেখিয়া নিবারণ নিজেই কারণটা ব্যাখ্যা করিয়া তাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল : 'স্ত্রীকে বাঁ দিকে শুতে হয়—তাই নিয়ম। পরে এ নিয়ম মেনে চলো বা না চলো তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, কিন্তু বিয়ের রাতে—'

রাত্রি তখন প্রায় তিনটা বাজে। এতরাত্রে এরকম একটা তামাসার মধ্যে কি কেউ বৌ-এর সঙ্গে প্রথম আলাপ আরম্ভ করে? যারা আড়ি পাতিয়াছে তারা শুনিলে কি ভাবিবে! সুকুমারী ভীরু বটে, কিন্তু ভাবপ্রবণতার জোরে ভীরুতাকে জয় করিয়া একটু রাগিয়াই গিয়াছিল। আর কিছু মাথায় না আসুক, সোজাসুজি নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কথা আরম্ভ করিলেই হইত।

নিবারণের বোধ হয় ধারণা হইয়াছিল, কথা আরম্ভ করা মাত্র বৌ-এর সঙ্গে ভাব জমিয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া অন্তরঙ্গ স্বামীর মত সে বলিয়াছিল, 'কত যে ভুল হয়েছে বিয়েতে বলবাব নয়। মন্ত্র তন্ত্র থেকে আরম্ভ করে- স্ত্রী-আচার পর্য্যন্ত। নতুন জামাই বলে চুপ করে ছিলাম, কিন্তু এমন অস্বস্তি লাগছিল মাঝে মাঝে—'

শুনিতে শুনিতে সুকুমারীর সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছিল। কি সর্ব্বনাশ, শেষ পর্য্যন্ত তবে কি একটা পাগলেব সঙ্গে তাব বিবাহ হইয়াছে? একটু পরেই অবশ্য জানা গিয়াছিল ঠিক পাগল নিবারণ নয়, সম্ভবতঃ তামাসাই করিতেছিল।

'তুমি যে কথা বলছ না? ও, সাধাসাধি কবিনি বলে?' বলিয়া এতক্ষণ পরে নিবাবণ আবার গোড়া হইতে বৌ-এর সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল, সুকুমারীর বন্ধুদের কাছে শোনা বিবরণের সঙ্গে যার অনেক মিল। বেশ মিষ্টি লাগিয়াছিল নিবাবণকে সুকুমাবীব তখন, ভোর পর্য্যন্ত সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই অনেকবার বোমাঞ্চ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ তার অবশ হইযা আসিয়াছিল—প্রথমবারের চেয়ে ভিন্ন কারণে।

কয়েকটা দিন কাটিতে না কাটিতে সুকুমারী বুঝিতে পারিল, বিবাহের রাত্রে বাঁ দিকে তাকে শোয়াইয়া আর মন্ত্র তন্ত্র এবং স্ত্রী-আচারের ভুল দেখাইয়া দিয়া নিবারণ তার সঙ্গে তামাসা করে নাই। তামাসা যে

নিবারণ করে না তা নয়, রস কস মানুষটার মধ্যে যথেষ্টই আছে, কিন্তু নিয়ম পালনের সময় আর ভুল ত্রুটি দেখাইয়া দেওয়ার সময় তামাসা করার পাত্র সে নয়।

বিবাহ হইয়াছে শীতকালে, মুখে তাই সুকুমারী একটু ক্রীম মাখে। নয় তো, এমন টুকটুকে রঙ তার, স্নো ক্রীম পাউডার মাখিবার তার দরকার? ক্রীমের কৌটাটি দেখিয়া নিবারণ একদিন বলে কি, 'এই ক্রীম মাখো তুমি? ছি! আর মেখো না।'

সুকুমারী অবাক।—'কেন।'

'এই ক্রীমটা ভাল নয়, চামড়া উঠে যায়। তোমায় অন্য ক্রীম এনে দেব।'

সুকুমারীর দুই বৌদিদি এই ক্রীম মাখিয়া মাখিয়া চামড়া ফাটা ঠেকাইয়া রাখে—দুজনের চামড়াই বড় ফাটল-প্রবণ। সুকুমারী নিজেও আজ কত বছর এই ক্রীম মাখিতেছে ঠিক নাই। সে একটু হাসিয়া বলে, 'তুমি কি করে জানলে চামড়া ফাটে?'

নিবারণ রীতিমত বিরক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সুকুমারীর হাসি পরক্ষণেই মিলাইয়া যায়। নিবারণ গম্ভীর মুখে বলে, 'আমি জানি। আর মেখো না।'

এরকম হুকুম কোন নতুন বৌ মানিতে পারে? অন্য একটা ক্রীম আনিয়া দিলেও বরং কথা ছিল। বিকালবেলা সুকুমারী মুখে একটু ক্রীম মাখিয়াছে, তারপর কতবার যে আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়াছে হিসাব হয় না, রাত্রি আটটার সময় বাড়ী ফিরিয়া নিবারণ যে কি করিয়া টের পাইয়া গেল!

'ক্রীম মেখেছ যে?'

নিবারণের মুখ দেখিয়া সুকুমারীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। ঢোক গিলিয়া সে বলে, 'এমন চড়্ চড়্ করছিল—'

'চড়্ চড়্ করবে বলেই তো মাথাতে বারণ করেছি। এবার থেকে এই ক্রীম মেখো।'

পকেট হইতে নিবারণ নতুন ক্রীমটি বাহির করে দেয়। হাতে নিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সুকুমারী হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। 'এই ক্রীম মাখবো ? এ কি মেয়েরা মাখে ? এতো ব্যাটাছেলের দাড়ি কামিয়ে মাথবার ক্রীম।'

নিবারণ জাঁকিয়া বসিয়া বলে, 'তাই তো এটা আনলাম। দাড়ি কামিয়ে লোকে ক্রীম মাখে কেন, চামড়া চড়্ চড়্ করবে না বলে তো ? কামানোর পর যে ক্রীমে চড়্ চড়্ করে না, এমনি লাগালে তো তোমার আরও বেশী কম চড় চড় করবে।'

সেদিন হইতে সুকুমারীর ক্রীম মাখা বন্ধ হইয়াছে।

কেবল মেয়েদের প্রসাধনের একটি বিষয় নয়, নিবারণ জানে না এমন বিষয় নাই। বিবাহের রাত্রে চারিদিকে সমস্ত ব্যাপাবে ভুল ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া নিবারণের অস্বস্তি বোধ করিবার অর্থটা ধীরে ধীরে সুকুমারী বুঝিতে পারে। চোখের সামনে মানুষকে ভুল করিতে দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে হওয়াটা নিবারণের পক্ষে অস্বস্তির ব্যাপারই বটে। এখনও মাঝে মাঝে ওরকম অস্বস্তি তাকে বোধ করিতে হয়। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের কথা, নিজের বাড়ীতে চুপ করিয়া থাকিবার প্রয়োজন বেশী হয় না বলিয়া অস্বস্তিটাও তাকে বেশী ভোগ করিতে হয়। বাড়ীর বাহিরে পথে ঘাটে, আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ীতে আর আপিসে সে কি করে সুকুমারী জানে না।

সমস্ত বিষয়েই নিবারণ ব্যবস্থা দেয়, সমস্ত ব্যবস্থার সমালোচনা করে। ব্যাখ্যা তার মুখে লাগিয়াই আছে, পিঁপড়ার লাইন বাঁধিয়া চলার কারণ হইতে সেজো পিসীর ছেলেটা অপদার্থ কেন পর্য্যন্ত। তার অনেকগুলি নিয়ম এখন এ বাড়ীতে চালু হইয়াছে, তার প্রায় সবগুলি নিষেধই বাড়ীর মানুষেরা তার সামনে মানিয়া চলে। আগে যে তার মতামতের এতটা মর্য্যাদা ছিল না, বাড়ীর কর্ত্তা হওয়ার পর হইয়াছে, এটুকু সুকুমারী সহজেই অনুমান করিতে পারে। তবে কর্ত্তা হইয়া নিবারণ যে নিয়ম কানুনের বহর আর অবিচার অনাচারে বাড়ীটাকে গারদখানা বানাইয়া তুলিয়াছে তা নয়। মত মানানোর জন্য তার কোন রকম জোর জবরদস্তি নাই, তার মতের বিরুদ্ধে গেলেও সে রাগ করে না বা তার মতটা মানিয়া চলিলেও বিশেষ খুসীও হয় না। মত প্রকাশ করিতে পাইলেই তার হইল। কঠোর সে শুধু তার অমতের বেলা। তার নিষেধ কেউ না মানিলে সে রাগিয়া আগুন হইয়া ওঠে—তা সে যত তুচ্ছ বিষয়েই নিষেধ হোক। কাঁচা টম্যাটো খাওয়া যে কত উপকারী আর কেন উপকারী সে কথা সে প্রায়ই বলে, কিন্তু সে ছাড়া বাড়ীর কেউ কাঁচা টম্যাটো খায় না। খায় কি না খায় এটা সে খেয়াল করিয়াও ছাখে না। কিন্তু একবার যদি তার নজরে পড়ে যে কেউ এক তলায় খালি পায়ে হাঁটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। চটি বা স্যাণ্ডেল পায়ে সকলের হাঁটার ব্যবস্থা সে দেয় নাই, দিলে হয় তো সকলে মিলিয়া একসঙ্গে সেঁতসেঁতে উঠানে খালি পায়ে সারাদিন হাঁটিলের সে চাহিয়া দেখিত না! কিন্তু খালি পায়ে একতলায় হাঁটা সে নিষেধ করিয়া দিয়াছে কিনা, তাই বিধবা পিসীকে পর্য্যন্ত খালি পায়ে হাঁটিতে দেখিলে সে গজ গজ করে আর কাঠের সোল দেওয়া নানা প্যাটার্ণের কাপড়ের জুতা কিনিয়া আনিয়া জুতা পরানোর জন্য দু'বেলা পিসীর সঙ্গে ঝগড়া করে।

পিসী বলে, 'নে থাম। জুতো পরিয়ে আমায় চিতায় তুলিস।'

নিবারণ বলে, 'ছেলে কি তোমার সাধে বিগড়েছে পিসীমা ? তোমার স্বভাবের জন্য।'

পিসী তখন কাঁদিতে আরম্ভ করে। দুটি অন্ন দেয় বলিয়া এমনভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জণা অপমান করা নিবারণের উচিত, যতই হোক সে তো তার বাপের বোন ? বলিতে বলিতে ভাই-এর জন্য পিসীর শোক উথলাইয়া ওঠে, নিবারণ কিছু বলিলেই পিসীর এরকম হয়। বাড়ীতে একমাত্র পিসীর সঙ্গেই নিবারণ আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

পিসীর ছেলের নাম নিখিল। যেমন রোগা তেমনি লম্বা চেহারা। ছেলেটা সত্যই এক নম্বরের সয়তান। এদিকে মা হয় তো তার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে আর যুদ্ধে হার মানিয়া নিবারণ গজর গজর করিতেছে, ভাল মানুষের মত মুখ করিয়া চোখ মিট্‌ মিট্‌ করিতে কবিতে নিখিল প্রশ্ন করে, 'কাঁদলে মানুষের চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন দাদা ?'

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার উপক্রম করিতে করিতে স্বকুমারী মুখ লাল করিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। ভাবে, উদ্ধত গোঁয়ার ছেলেটার এমন একটা খোঁচা দেওয়া ফাজলামিতে কি রাগটাই না জানি নিবারণ করিবে। হয় তো দূব করিয়া তাড়াইয়া দিবে বাড়ী হইতে। কিন্তু পরক্ষণে নিবারণের ব্যাখ্যা তার কানে আসে—বাপের বাড়ীব জন্য মন কেমন করিয়া কাঁদায় একদিন তাকে যে ব্যাখ্যা শুনিতে হইয়াছিল। চাহিয়া দেখিতে পায়, দু'হাত পিছনে দিয়া একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া নিবাবণ পায়চারি আরম্ভ করিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে উপরে গিয়া নিবারণ নিজেই বলে, 'বড় বজ্জাত হয়েছে নিখিলটা। কি রকম অপমান করল আমায় দেখলে ?'

'অপমান জ্ঞান আছে তোমার ?'—সুকুমারীর বড় রাগ হইয়াছিল।

'কি বললে ?' বলিয়া রাগ করিয়া কাছে আসিয়া নিবারণ অন্যমনা হইয়া যায়। এতক্ষণ সুকুমারী মাথা নীচু করিয়া ছিল, মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্র নিবারণ ব্যস্ত হইয়া বলে, 'তোমার জ্বর হয়েছে।'

'না, জ্বর হতে যাবে কেন ?'

'উঁহু, তোমার নিশ্চয়ই জ্বর হয়েছে। এবেলা ভাত খেয়ো না।'

স্নেহ করিয়াই নিবারণ তাকে ভাত খাইতে বারণ করে, চিন্তিত মুখে সহানুভূতিভরা কোমল গলায়। অন্যসময় হয়তো সুকুমারী গলিয়া যাইত, এখন ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কি করে জানলে আমার জ্বর হয়েছে ? মুখ দেখে ?

নিবারণ গম্ভীর হইয়া যায়।—'আমি জানি।'

'ছাই জানো তুমি। রাগটাগ হলে আমার মুখ এরকম লাল দেখায়—সবারি দেখায়। থার্মোমিটার দিয়ে ছাখো, এক ফোটা জ্বর যদি ওঠে—'

'সব জ্বর থার্মোমিটারে ওঠে না। যাই হোক, এবেলা ভাত খেয়ো না।'

ছুটির দিন সকাল বেলার ঘটনা, সবে চা'টা খাওয়া হইয়াছে, ভাত খাইতে তখনও অনেক দেরী। তবু সুকুমারীর মনে হয়, সে যেন কত-কাল খায় নাই, তখন তখন খুব ঝাল কোন একটা তরকারী দিয়া দুটি ভাত খাইতে পাইলে বড় ভাল হইত। এখনো দেহে মনে স্বামীর গতরাত্রের আদরের স্বাদ লাগিয়া আছে, এর মধ্যে স্বামীর নিষেধ ভাঙ্গার স্বাদ পাওয়ার জন্য এরকম ছটফটানি জাগার মত রাগ হওয়া কি তার উচিত ? ঠিক রাগ কিনা সুকুমারী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেমন একটা ঝাঁঝাঁলো বিষাদ ! দিন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে অন্যদিনও তো এটা সে অনুভব করিয়াছে, আজ তো নয় কেবল ?

এবেলা তাকে ভাত খাইতে বারণ করিয়া নিবারণ বাজারে গিয়াছে, সমস্ত বাজারটাই কিনিয়া আনিবে। কিন্তু একটি বেহিসাবী জিনিষ কি থাকিবে তাতে? যা খাইলে মানুষের ভিটামিন বাড়ে না, রক্তমাংস হাড়ের পুষ্টি হয় না, তাপের উৎপাদন হয় না? খাওয়ার কথা ভাবিলে নিছক জিভে জল আসে মাত্র এমন কোন বাজে জিনিষ?

সকালবেলা এখন সংসারের কত কাজ, ঘরে বসিয়া থাকা তার উচিৎ নয় জানে, তবু ভাত খাইতে বারণ করার রাগে ঘরেই সুকুমারী বসিয়া থাকে। বাজার আসার পাঁচ মিনিট পরে আসে ছোট ননদ পলটু। বিবাহের এক বছরের মধ্যে পলটুর সন্তান সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। পলটুর ধারণা, এ জগতে এমন কেলেঙ্কারি আর কোন মেয়ের অদৃষ্টে জোটে নাই।

'দাদা যেন কি, ছি!' বলিয়া লজ্জায় প্রায় মূর্চ্ছা গিয়া সে বৌদিদির গায়ের উপর ঢলিয়া পড়ার উপক্রম করে, 'এক গাদা কত কি সব কিনে এনে বলছে আমার জন্য এনেছে, আমার খেতে ভাল লাগবে। এ অবস্থায় আমাদের নাকি অরুচি হয়!'

চোখ বুজিয়া থাকিয়াই পলটু একবার শিহরিয়া ওঠে!

সুকুমারী ভাবে, তবু তো আনিয়াছে? তাই বা কম কি! কাজের ছলে বাজার দেখিতে নীচে গিয়া বাহিরের ঘর হইতে নিবারণের গলা তার কাণে ভাসিয়া আসে। খবরের কাগজকে কেন্দ্র করিয়া পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোকের কাছে রাজনীতির বক্তৃতা হইতেছে। কথা শুনিলে মনে হয়, সব যেন তার কাছে অপগণ্ড শিশু। ভিতরের দিকের জানলার পর্দা একটু ফাঁক করিয়া সুকুমারী একবার উঁকি মারে, মুচকি হাসি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সকলের মুখের দিকে তাকায়। সকলেই চা পানে ব্যস্ত। নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনাও তাদের নির্ব্বিবাদে চলিতেছে। এক বছরের মধ্যে ইউরোপের অবস্থা কি দাঁড়াইবে ব্যাখ্যা

করিতে নিবারণ যেন কেমন করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে চলিয়া গিয়াছিল, কার একটা কথা কাণে যাওয়ায় মুখের কথাটা শেষ না করিয়াই বলে, 'আপনি ভুল করেছেন সতীশ বাবু, ও শেয়ার কি কিনতে আছে! এক মাসের মধ্যে আর্দ্ধেক নেমে যাবে। তার চেয়ে যদি—'

এখন নয়, এসব বিষয়ে নিবারণের সঙ্গে কেউ বিশেষ তর্ক করে না, ঝগড়া বাধিবে খেলার সময়। আজ ছুটির দিন, তাস আর দাবার আড্ডা বসিবেই, নিবারণ হয়তো তাস হাতে করিয়া দাবার চাল বলিয়া দিতে থাকিবে। ঝগড়া শুনিয়া মাঝে মাঝে ভয় হইবে এই বুঝি মারামারি বাধিয়া গেল। কেন যে ওরা এখানে খেলিতে আসে!

'কি ঠাকুর?'

'এবার মাংস চড়াব।'

বাহিরের ঘরের ভেজানো দরজার কাছে ঠাকুর ইতস্ততঃ করে।

'নাই বা ডাকলে? নিজেই চড়িয়ে দাও আজকে—চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

সে সাহস ঠাকুরের নাই, মাংস চড়ানোর সময় নিবারণ তাকে ডাকিবার হুকুম দিয়া রাখিয়াছে, না ডাকিলে কি রক্ষা রাখিবে!

শুনিয়া সুকুমারীর মনে হয়, তবে তো বারণ না মানিয়া এবেলা মাংস দিয়া সে দুটি ভাত খাইলেও নিবারণ রক্ষা রাখিবে না! এতক্ষণ পরে গভীর অভিমানে সুকুমারীর চোখে হঠাৎ জল আসিয়া পড়ে।

নতুন কিছুই আজ বাড়ীতে ঘটে নাই, তবু যেন সব সুকুমারীর কেমন খাপছাড়া অর্থহীন মনে হয়, বাড়ীর সকলের কাজকর্ম্ম চলাফেরা গল্প-গুজব। নিবারণের ভাগ্নী অর্গান বাজাইয়া গান ধরিয়াছে, নিবারণ নিজেই তাকে গান শেখায়। সুকুমারী নিজেও ভাল গান জানে, ভাগ্নীর ভুল সুর শুনিতে শুনিতে তার হতাশা মেশানো এমন একটা

উৎকট কষ্ট হয়! রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবারণের মা একটি নাতিকে দুধ খাওয়াইতেছিল, ভাড়ার ঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে বাড়ীর অন্য মেয়েরা চানাচুর খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে, ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করিয়া খেলা করিতেছে সারা বাড়ীতে। এর মধ্যে কি খাপছাড়া, কি অর্থহীন? এত বড় একটা সংসারের দায়িত্ব যার ঘাড়ে সেই লোকটা একটু খাপছাড়া বলিয়া কি তার এরকম মনে হয়? সঙ্গ ভাল না লাগায়, করার মত একটা বাজে কাজও হাতের কাছে না থাকায় সুকুমারী ঘরে গিয়া ব্লাউজ সেলাই করিতে বসে। ব্লাউজ দুটি নিবারণ ছাঁটিয়া দিয়াছে। গলার ছাঁট দেখিতে দেখিতে সুকুমারী ভাবে, এ ব্লাউজ পরিলে লোকে হাসিবে না তো?

বেলা প্রায় তিনটার সময় সুকুমারীর দাদা পরমেশ আসিল। এই দাদাটির জন্য সুকুমারীর মনে কত যে গর্ব্ব আছে বলিবার নয়। পরমেশ খ্যাতনামা অধ্যাপক, এই বয়সেই কলেজের ছেলেদের মত দু'খানা বই পর্য্যন্ত লিখিয়া ফেলিয়াছে। তার ডিগ্রীগুলি উচ্চারণ করিবার সময় আহ্লাদে সুকুমারীর জিভ জড়াইয়া আসে।

খানিকটা দুধ বার্লি গিলিয়া সুকুমারী বিছানায় পড়িয়াছিল। ততক্ষণে তার নিজের মনেই সন্দেহ জন্মিয়া গিয়াছে, থার্ম্মোমিটারে ধরা পড়ে না এমন জ্বর হয়তো সত্য সত্যই তার হইয়াছে। ঘরের পাশে একতলার মস্ত খোলা ছাদ, তারই এক প্রান্তে এদিকের ঘরগুলির সঙ্গে কোণাকুণি-ভাবে আরেকটি ঘর তোলা হইতেছে। নিবারণ গিয়া মিস্ত্রীদের কাজ দেখাইয়া দিতেছিল আর শুইয়া শুইয়া জানালা দিয়া সুকুমারী তাই দেখিতেছিল। পরমেশ সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিতে সে খুসী হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'এসো দাদা।'

'তোর নাকি জ্বর হয়েছে ?

'হুঁ।'

পরমেশ বসিয়া বলিল,'নিবারণ কই ?'

সুকুমারী আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল। একজন মিস্ত্রী তখন কাজ বন্ধ করিয়া নিবারণের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় সর্দ্দার মিস্ত্রী। ঘরের মধ্যে ভাই বোন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে, আর ওদিকে সর্দ্দার মিস্ত্রী বলে, 'আপনি যদি সব জানেন বাবু তবে আর আমাদের কাজ করতে ডেকেছেন কেন ?

সুকুমারী চাপা গলায় বলে, 'শীগগির ডাকো দাদা—এখুনি হয় তো মেরে বসবে।'

নিবারণ কি করিত বলা যায় না, পরমেশের ডাক শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তারপর মিস্ত্রীকে বলিল, 'তোমাদের আর কাজ করতে হবে না। নীচে যাও, তোমাদের পাওনা দিয়ে দিচ্ছি।' বলিয়া গটগট করিয়া ঘরে চলিয়া আসিল।

তারপর সাধারণ কুশল প্রশ্নের অবসরও তাদের হয় না, শালা ভগ্নী-পতিতে তর্ক সুরু হইয়া যায়। পরমেশ বলে, 'ওরা সব ছোটলোক, ওদের সঙ্গে কি ঝগড়া মারামারি করতে আছে হে !'

নিবারণ আশ্চর্য্য হইয়া বলে, 'ছোটলোক ? ছোটলোক হবে কেন ওরা ? ওই তো দোষ আপনাদের, যারা খেটে খায় তাদেরি ছোটলোক ধরে নেন।'

অকারণে খোঁচা খাইয়া পরমেশ একটু চটিয়া বলে, 'ও, তোমার বুঝি ওসব মতবাদ আছে ? কিন্তু তুমিও তো বাবু সামান্য একটা কথা সইতে না পেরে বেচারাদের তাড়িয়ে দিলে ?'

নিবারণ একটু অবহেলার হাসি হাসিয়া বলে, 'তাড়িয়ে দিলাম কি ওরা ছোটলোক বলে? ওইখানে তো মুস্কিল আপনাদের নিয়ে, বই পড়ে পড়ে সহজ বিচার বুদ্ধিও আপনাদের লোপ পেয়ে গেছে। ঘর তুলব আমি, আমি যে রকম বলব সেরকম ভাবে ওরা যদি কাজ না করে তা হলে চলবে কেন? তাই ওদের বিদেয় করে দিলাম—ওরা ছোটলোক বলে নয়।'

আজ প্রথম নয়, আগেও কয়েকবার দুজনে তুমুল তর্ক হইয়া গিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত যা গড়াইয়াছে প্রায় রাগারাগিতে। তর্কটা অবশ্য আরম্ভ করে নিবারণ, বিজ্ঞানের কোন একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা অভিমত প্রশ্ন বা সন্দেহের মধ্যে ব্যক্ত করিয়া পরমেশ মুখ খুলিয়া দেয়। প্রথমে পরমেশ পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, তারপর ধৈর্য্যহারা হইয়া চেষ্টা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের, তারও পরে চটিয়া গিয়া আরম্ভ করে আক্রমণ। আজ নিবারণের খোঁচায় প্রথমেই তাকে চটিয়া উঠিতে দেখিয়া সুকুমারী চট্ করিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ডাকে, 'দাদা, একবার শোনো। শীগ গির শুনে যাও আগে।'

পরমেশ কাছে গেলে ফিস ফিস করিয়া বলে, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, ওর সঙ্গে তর্ক কর কেন? যাই বলুক হেসে উড়িয়ে দিতে পার না?'

শুনিয়া আজ পরমেশের হঠাৎ প্রথম খেয়াল হয় যে, তাই তো বটে, নিবারণের সঙ্গে সে তর্ক করে কেন? নিবারণ ছেলেমানুষী করে বলিয়া সেও ছেলেমানুষ হইতে যায় কেন? তারপর দুজনে ঘরে ফিরিয়া যায়, একথায় সেকথায় কিছুক্ষণ কাটিয়া যায়, কোথা হইতে এক টুকুরা মেঘ আসিয়া বাহিরের রোদটুকু মুছিয়া নিয়া যায়। ভাসা আলগা মেঘ, একটু পরেই সরিয়ে যাইবে।

তখন নিবারণ বলে, 'আচ্ছা আপনারা যে বলেন লাইটের চেয়ে বেশী স্পীড্ আর কোন কিছুর হতে পারে না, তার কি প্রমাণ আছে?'

পরমেশ তাকায় সুকুমারীর মুখের দিকে, ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু হাসি দেখা দেয়। উদাস ভাবে বলে, 'কে জানে।'

জবাব শুনিয়া একটু থতমত খাইয়া নিবারণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। তারপর বলে, 'আমি বলছিলাম, মানুষের চিন্তার স্পীড তো আরও বেশী হতে পারে। যাকগে ওকথা। আচ্ছা, গ্রহণের সময় দেখা গেছে তারার আলো সূর্য্যের পাশ দিয়ে আসবার সময় সূর্য্যের আকর্ষণে বেঁকে যায়।—'

'তাও আমি জানি না।'

'ও!' বলিয়া নিবারণ এবার গম্ভীর হইয়া যায়। গাম্ভীর্য্য তার বজায় থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণে সুকুমারী মুখ শুকাইয়া গিয়াছে এবং পরমেশ দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিয়া ভাবিতেছে, তার রাগটা কমানোর জন্য কি বলা যায়। কিন্তু গাম্ভীর্য্য নিবারণের আপনা হইতেই উবিয়া যায়। সহজভাবেই আবার সে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে। আগলা মেঘটা উড়িয়া গিয়া আবার চারিদিক রোদে ভরিয়া যায়, সুকুমারীর মুখের বিষাদের ছায়াটা কিন্তু সরিয়া যায় না। গম্ভীর হইয়া থাকাটা বেশী অপমানকর জানিয়াই কি নিবারণ গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিল? আর সমস্ত বিষয়ে যেমন, রাগ-দুঃখ মান-অভিমানের বেলাতেও কি তেমনি জানাটা নিবারণের কাছে বড়? এত যে ভালবাসে তাকে নিবারণ, তার মধ্যেও জানাজানির প্রাধান্য কতখানি কে জানে!

সন্ধ্যার সময় পরমেশের সঙ্গে নিবারণও বাহির হইয়া যায়। পরমেশ যায় বাড়ী ফিরিয়া, নিবারণ যায় বেড়াইতে। বেড়াইতে গেলে নিবারণ

ফিরিয়া আসে এক ঘণ্টার মধ্যে, আজ নটার সময়ও তাকে ফিরিতে না দেখিয়া মনের ক্ষোভে সুকুমারীর মুখে জ্বালাভরা হাসি দেখা দেয়। ক্ষুধায় পেটটা বড় বেশী জ্বলিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় ক্ষোভটাও তার বেশী হয়। বাড়ীর সকলে অনেকবার খবর নিয়া গিয়াছে, দুধ আনিয়া খাইতে সাধিয়াছে, সুকুমারী খায় নাই। পল্টু বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া গিয়াছে নটা পর্য্যন্ত। একা হওয়ামাত্র ক্ষোভটা যেন একলাফে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে।

আর কি সুকুমারীর মানিতে বাকী আছে, এতকাল তাকে ভালবাসার মধ্যে এত বৈচিত্র্য নিবারণ কি করিয়া আনিয়াছে? আর সব সে যেমন জানে বলিয়া করে, ভালবাসিবার নিয়ম কানুনও জানে বলিয়া মানিয়া চলে। পল্টুর মত অবস্থায় মেয়েদের অরুচি হয় জানে বলিয়া সে যেমন বিশেষ বিশেষ খাবার জিনিষ আনিয়া দিয়াছে, ওর মধ্যে দয়ামায়া স্নেহ-মমতার প্রশ্ন কিছু নাই, স্ত্রীর সঙ্গে কি করিয়া ভাব করিতে, স্ত্রীকে কি করিয়া আদর যত্ন করিতে হয় তাও তেমনি জানে বলিয়াই তার সঙ্গে এমনভাবে ভাব করিয়াছে, তাকে এত আদরযত্ন করিয়াছে। নয়তো নিবারণের মত মানুষের কাছে ওরকম রোমাঞ্চকর মধুর কথা ও ব্যবহার কে কল্পনা করিতে পারে, প্রতিদিন রাতে ঘরে আসিবার পর এতকাল তার যা জুটিয়াছে?

নিজের মনের জানাজানি প্রক্রিয়াকে সেও যে নিবারণের চেয়ে অনেক বেশী খাপছাড়াভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে এটা অবশ্য তার খেয়াল হয় না, বেশ জোরের সঙ্গেই অনেক কিছু জানিয়া চলিতে থাকে। একবারে নিঃসন্দেহ হইয়া মানে, রাত্রে নিবারণকে একেবারে নতুন মানুষ মনে হইত কেন তার কারণটা। বাপের বাড়ীতে যে রাত্রিগুলি নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে সেগুলি ছাড়া প্রত্যেকটি রাত্রি আজ দুপরেও তার কাছে রোমাঞ্চ ও

শিহরণে ভরা ছিল, এখন সব ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। সব ফাঁকি নিবারণের, শুধু নিয়ম পালন।

আজ একটু রাগ হইয়াছে তাই নিয়ম মাফিক স্ত্রীকে স্নেহ করিবার ইচ্ছাটাও উবিয়া গিয়াছে। পরমেশের উপর রাগটা চলিয়া গেল দু'চার মিনিটের মধ্যেই, কিন্তু অসুস্থা উপবাসী বৌকে আর ক্ষমা করিতে পারিল না। কি করিয়া করিবে? যেখানে দরদ আন্তরিক নয়, সেখানে সুবিচারের প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে?

বিবাহের আগে এরকম বিশ্লেষণের ক্ষমতা সুকুমারীর ছিল না, কোন মানুষের মাথার মধ্যে যে নিজের পছন্দ মত সিদ্ধান্ত দাঁড় করানোর জন্য দৈনন্দিন জীবনের রাশি রাশি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবর্জ্জনা হইতে যুক্তিরূপী প্রয়োজনীয় টুকরাগুলিকে শুধু বাছিয়া নেওয়ার এমন একটা প্রক্রিয়া চলিতে পারে একথা কল্পনা করার ক্ষমতাও ছিল না। এখন সে যেন খানিক খানিক বুঝিতে পারে, এ ধরণের চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া তার পক্ষে ঠিক উচিত হইতেছে না, এসব ছেলেমানুষী কল্পনা মাত্র, এরকম জ্বালাভরা দুঃখ ভোগ করার কোন কারণ ঘটে নাই। তবু অন্ধকার ঘরে ছটফট করিতে করিতে না ভাবিয়া সে পারে না যে, হায়, যে স্বামী উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে বলে এই করা উচিত আর ওই করা উচিত নয়, যে ক্রীম মাখিতে দেয় না, অকারণে উপস করাইয়া রাখে আর একরকম বিনা দোষে রাগ করিয়া বাড়ী ফিরিতে দেরী করে, তার সঙ্গে জীবন কাটাইবে কি করিয়া?

দশটার পরে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া নিবারণ আলো জ্বালে। সুকুমারী চোখ বুজিয়া ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকে আর চোখের পাতা একটু ফাঁক করিয়া চুপি চুপি নিবারণ কি করে দেখিবার চেষ্টা করিয়া রামধনুর রঙ দেখিয়া বসে। চোখে একটু জল জমিযাছে। চোখ মেলিয়া হয়তো সব

স্পষ্ট দেখা যাইবে, চোখের পাতা একটুখানি ফাঁক করিয়া কিছু দেখা সম্ভব নয়,—অন্ততঃ চোখ না মুছিয়া।

জামা কাপড় ছাড়িয়া নিবারণ মুখ হাত ধুইতে বাহির হইয়া যায়। সুকুমারী তাড়াতাড়ি চোখ দুটি মুছিয়া ফেলে বটে, কিন্তু এবার আরও বেশী জল আসিয়া পড়ে। জানে জানে, নিবারণের মত সব না জানুক, এটুকু সে জানে যে নিবারণ আর কোনদিন তার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিবে না।

নিবারণ ঘরে ফিরিয়া আসে। খানিকক্ষণ তার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। তারপর প্রায় কানের কাছে অতি মৃদুস্বরে তার প্রশ্ন শুনিতে পায়, 'কাঁদছো কেন?'

সুকুমারীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে, একমুহূর্ত্তে তার এতক্ষণের সমস্ত জানা যেন বাতিল হইয়া যায়। চোখে একটু জল দেখিবামাত্র রাগ কমিয়া গিয়াছে! দাদাকে পরামর্শ দিয়া অপমান করানোর মত অমার্জ্জনীয় অপ-রাধের জন্য যে রাগ হইয়াছিল। এমন গভীর মায়া তার জন্য তার স্বামীর আর সে এতক্ষণ সন্দেহ করিয়া মরিতেছিল কিছুই তার আন্তরিক নয়!

চোখের পলকে উঠিয়া সুকুমারী নিবারণের পা চাপিয়া ধরে।—'আমায় মাপ কর, আমি বড্ড অন্যায় করেছি।'

নিবারণ অবশ্য তখন তাকে বুকে তুলিয়া নেয়।—'তোমার জ্বর তো বেড়েছে দেখোছি।'

'জ্বর বেড়েছে? গা গরম হয়েছে আমার?'

'বেশ গরম হয়েছে। দাঁড়াও, একবার থার্ম্মোমিটার দিয়ে দেখি।'

থার্ম্মোমিটারে দেখা যায়, সত্যই সুকুমারীর জ্বর হইয়াছে, প্রায় একশর কাছাকাছি। থার্ম্মোমিটারটি রাখিয়া আসিয়া সুকুমারীর গায়ে আদর করিয়া হাত বুলাইয়া দেয়। সুকুমারী আরামে চোখ বোজে।

নিবারণ বলে, 'আমার সত্যি রাগ হয়েছিল। রাগ করে থাকতে পারলাম না কেন জান ?'

সুকুমারী নীরবে মাথাটা একটু কাত করে। মনে মনে বলে, জানি, আমায় ভালবাস বলে।

আবার প্রায় কানের সঙ্গে মুখ লাগাইয়া অতি মৃদুস্বরে নিবারণ বলে, 'আজ জানতে পারলাম কিনা তোমার খোকা হবে। জানা মাত্র সব রাগ যেন জল হয়ে গেল।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া সুকুমারী বিস্ফারিত চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। জানা মাত্র সব রাগ জল হয়ে গেল! এই তবে নিবারণের ক্ষমা করিবার কারণ। যে খোকার মা হইবে তার গুরুতর অপরাধও ক্ষমা করিতে হয়! গায়ের চামড়া বড় চড়্ চড়্ করিতে থাকে সুকুমারীর, যেখানে যেখানে নিবারণের হাত বুলানোয় এতক্ষণ আরামের সীমা ছিল না। পেটটা জ্বালা করিতে থাকে। মুখটা তিতো লাগে। মাথাটা ঘুরিতে থাকে।

হঠাৎ সে করে কি, নিবারণকে দু'হাতে ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া খোলা ছাতে চলিয়া যায়। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় মিস্ত্রীরা ঘরের যে গাঁথনি আরম্ভ করিয়াছিল অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। তবু সেই হাত-খানেক উঁচু গাঁথনিতে হোঁচট খাইয়া সুকুমারী দড়াম্ করিয়া পড়িয়া যায়।

অন্ধের বৌ

বিবাহের একবছর পরে ধীরাজ অন্ধ হইয়া গেল। চোখের একটা অসুখ আছে, বড় বিপজ্জনক অসুখ, চোখের ভিতরের চাপ যাতে বাড়িয়া যায়। অবস্থা বিশেষে একদিনের মধ্যেই মানুষের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

আগের দিনটা ছিল বিবাহের বার্ষিক তিথি। রাত্রিটা দু'জনে জাগিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল! সারারাত কয়েক মিনিটের জন্যও চোখ না বুজিয়া প্রতিদিন সকালে একেবারে সূর্য্যের মুখ না দেখিলেও রাতজাগাটা তাদের অবশ্য বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। বিবাহের প্রথম বছরে রাত দু'টোর আগে ফিসফিসানি শেষ হওয়াটা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর পক্ষেও স্বাভাবিক নয়।

ধীরাজ চোখে একটু যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল, একটু ঝাপসা দেখিতে-ছিল। চোখ দু'টি বেশ লাল দেখাইতেছিল। কিন্তু বিবাহের তিথিকে যথাযোগ্য সম্মান করার উৎসাহে ওসব সামান্য বিষয়কে তারা গ্রাহ্যও করে

নাই। সুনয়না বলিয়াছিল, 'তাই বলে আজ রাতে ঘুমোতে পাবে না। ক'ল সারাদিন ঘুমিও সব ঠিক হয়ে যাবে। আমারও তো চোখ জ্বালা করছে।'

'তবে একটু সেইরকম নাচ দেখাও ?'

'চোখ বোজো ?'

পরদিন বিকালের দিকে ডাক্তার ডাকা হইল। তারপর তাড়াহুড়া ছুটাছুটি করিয়া অনেক কিছুই করা হইল। কিন্তু তখন বড় বেশী দেরী হইয়া গিয়াছে। ভোরে সুনয়নার হাত ধরিয়া ছাতে দাঁড়াইয়া নূতন সূর্য্যকেও ধীরাজ যখন ঝাপসা দেখিতেছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করিলেও হয়তো কিছু হইতে পারিত। কিন্তু তখন কে ভাবিয়াছিল টকটকে লাল চোখ, যন্ত্রণা, ঝাপসা দেখা চোখের মধ্যে আলোর ঝলক-মারা, এসব অন্ধ হওয়ার ভূমিক! ওসব তারা রাত জাগার ফল বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে।

বিশেষজ্ঞ অনেক রকম পরীক্ষা করিলেন কিন্তু অপারেশন করিতে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, আর কিছুই করিবার নাই।

পরদিন সকালে জগতের আলোর উৎস যথাসময়ে আকাশে দেখা দিলেন কিন্তু ধীরাজ সেটা টেরও পাইল না। তার চোখের আলো চির-দিনের জন্য নিভিয়া গিয়াছে।

চোখের ডাক্তার স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, রাত জাগা ধীরাজের অন্ধ হওয়ার আসল কারণ নয়। রাত না জাগিলেই অবশ্য ভাল ছিল কিন্তু তাতেও যে ধীরাজের চোখ বাঁচিত তাই বা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? এ বড় সাংঘাতিক অসুখ, কত লোকের চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষের মন কি সহজে এসব যুক্তি মানিতে চায়? সুনয়নার কেবলি মনে হয়, ওভাবে জোর করিয়া স্বামীকে রাত না জাগাইলে চোখের

অসুখটা কখনও এত তাড়াতাড়ি এরকম বাড়িয়া যাইত না। অন্ততঃ রোগের লক্ষণগুলিকে রাত-জাগার ফল ভাবিয়া নিশ্চয় তারা অবহেলা করিত না, সকালবেলাই চোখের অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত। ভাবে আর চোখের জলে সকালবেলার আলো এমন ঝাপসা দেখায় যেন সেও আধাআধি অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সেই ঝাপসা দৃষ্টিতে স্বামীর বিকৃত মুখখানা দেখিতে দেখিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, 'ওগো, আমার জন্যেই আমাদের এ সর্ব্বনাশ ঘটল।'

ধীরাজ মরার মত বলিল, 'তোমার কি দোষ ?'

সুনয়না সজোরে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, 'কার দোষ তবে ? কে তোমার টকটকে লাল চোখ দেখেও তোমায় ঘুমোতে দেয়নি ? সকালে কে তোমায় বলেছে, একটু ঘুমোলেই সব সেরে যাবে ? আমি তোমার চোখ নষ্ট করেছি—স্বামীর চোখ-খাগী হতভাগী আমি, আমার মরণ নেই। আমিও অন্ধ হয়ে যাব—নিজের চোখ উপড়ে ফেলব। যদি না উপড়ে ফেলি, মা কালীর দিব্যি করে বলছি —'

'চুপ্, ওসব বলতে নেই।'

ধীরাজ ব্যস্ত হইয়া সুনয়নার একখানা হাত হাতড়াইয়া খুঁজিতে আরম্ভ করায় সুনয়না হঠাৎ শিহরিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ধীরাজের কাকা অন্ধ, প্রথম এ বাড়ীতে আসিয়া তাকে প্রণাম করার পর এমনি ভাবে আন্দাজে তার গায়ে মাথায় শীর্ণ হাত বুলাইয়া কাকা তাকে অভ্যর্থনা আর আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছিলেন।

'কি খুজছ ? কি খুঁজছ তুমি ?'

'তোমার হাত কই ?'

'এই যে'---

তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ধীরাজ স্বান্তনার সুরে বলিতে লাগিল, 'ওসব কথা মনেও এনো না। তোমার চোখ গেলে আমি বাঁচব কি করে? এখন থেকে তোমার চোখ দিয়েই তো দেখব। তুমি আমার সেবা করবে, কাজ করে দেবে, বইটই পড়ে শোনাবে —'

সুনয়নার হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরাজ তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে থাকে। সুনয়নার মাথাটা হঠাৎ এমন জোরে তার বুকে আসিয়া পড়িয়াছে যেন সে তার বুকেই মাথা কুটিয়া মরিতে চায়। সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে, স্বান্তনা আর সাহস পাওয়ার বদলে সে নিজেই অপরজনকে বুঝাইয়া আদর করিয়া শান্ত করিতেছে, এটা দু'জনের কারও কাছে খাপছাড়া মনে হইল না। ভালবাসার এই অন্ধ ব্যাকুলতার মত দুর্ভাগ্যের ভাল ওষুধ জগতে আর কি আছে?

ধীরাজ বেশী ব্যাকুল হয় নাই। কতকটা বজ্রাহত মানুষের মত সে বিছানায় পড়িয়া আছে, মুখে বেশী কথা নাই, অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া নাই, কি পাপে তার এমন শাস্তি জুটিল ঈশ্বরের কাছে সে কৈফিয়ৎ দাবী করে নাই, লোভী শিশুর মত সকলের সহানুভূতি গিলিবার অধীর আগ্রহও নাই। এখনও সে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই, চিরদিনের জন্য সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। মনের তলে এখনও যেন তার একটা যুক্তি-হীন অন্ধ আশা জাগিয়া আছে, হয়তো সব ঠিক হইয়া যাইতে পারে। ইতিমধ্যেই সুনয়নাকে সে বলিয়াছে—'তাছাড়া কি জান, কিছুদিন পরে হয় তো একটু একটু দেখতে পাব। ভাল দেখতে পাবনা বটে, চশমা টশমা নিয়ে হয়তো ধোঁয়াটে ঝাপসা মত কাছের জিনিষ শুধু দেখতে পাব, তবু দেখতে পাব তো। খুব বড় একজন স্পেশালিষ্টের কাছে যেতে হবে।'

ধীরাজের মনে যতখানি হতাশা জাগা উচিত ছিল, ধীরাজের কাছে আমল না পাইয়া তার সবখানি যেন সুনয়নাকে আশ্রয় করিয়া তাকে

আত্মহারা করিয়া দিয়াছে। ধীরাজের আফশোষ আর হাহুতাশ যেন মুক্তি পাইতেছে তার মুখে।

পরপর দু'টি রাত্রি সে ঘুমায় নাই। একটি রাত্রি জাগিয়াছে স্বামীর সোহাগ ভোগ করিয়া, আরেকটি রাত্রি জাগিয়াছে অন্ধ স্বামীর স্ত্রী হইয়া জীবন কাটানোর বীভৎস অসুবিধাগুলির কথা কল্পনা করিয়া। সারারাত সে আলো নিভায় নাই। প্রথম রাত্রে তারা আলো নিভায় নাই, দু'জনে দু'জনকে দেখিবে বলিয়া। পরের রাত্রে সে আলো নিভায় নাই অন্ধকারের ভয়ে। হাসপাতাল হইতে ধীরাজ বাড়ী ফিরিয়াছিল রাত্রি প্রায় এগারটার সময়, শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন, অন্ধ ধীরাজ। একবাটি দুধ চুমুক দিয়া খাইয়াই সে শুইয়া পড়িয়াছিল। শুইয়া পড়িতে তাকে সাহায্য করিয়াছিল বাড়ীর প্রায় সকলে, মা বাবা ভাই বোন পিসী খুড়ী ভাইপো ভাইঝি ভাগ্নে ভাগ্নীর দল। বাড়ীর ঠাকুর চাকর পর্য্যন্ত দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুধু আসে নাই ধীরাজের অন্ধ কাকা। ধীরাজের মার মৃদু কান্নার শব্দ শুনিতে শুনিতে তখন সুনয়নার কানের মধ্যে হঠাৎ ভাঙ্গা কাসির বেতালা আওয়াজের মত কি যেন ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল, বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল ঘরখানা পাক খাইয়া অন্ধকার হইয়া অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল।

মূর্চ্ছা নয়, মূর্চ্ছা গেলে সুনয়না পড়িয়া যাইত, জ্ঞান থাকিত না। একটু টলিতে থাকিলেও সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে প্রায় মিনিটখানেক চোখ দিয়াই যেন সেই গাঢ় সেঁতসেঁতে অন্ধকার দেখিয়াছিল। কানের মধ্যে তখন শব্দ থামিয়া গিয়াছে। বাহিরেও কোন শব্দ নাই। সেই স্তব্ধতাকেও সুনয়নার মনে হইয়াছিল সাময়িক অন্ধকারের অঙ্গ।

তারপর সেই নিবিড় কালো অন্ধকার পরিণত হইয়াছিল গাঢ় কুয়াশায় এবং ক্রমে ক্রমে কুয়াশাও কাটিয়া গিয়াছিল। সকলের কথার গুঞ্জনধ্বনি

হঠাৎ স্পষ্ট ও বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এক অজানা আতঙ্কে তখন সুনয়নার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করিতেছে। সে আতঙ্ক ধীরাজের চোখের জন্য নয়—চোখ যে তার নষ্ট হইয়া গিয়াছে সুনয়না আগেই সে খবর পাইয়াছিল। অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ কানের কাছে জোরে শব্দ হইলে কিছুক্ষণের জন্য মানুষ যেমন বেহিসাবী আতঙ্কে অভিভূত হইয়া যায়, কি জন্য আতঙ্ক তাও বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না, চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিবার পরেও সুনয়না অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই রকম একটা আতঙ্ক অনুভব করিয়াছিল।

তাকে চমক দিয়া বাস্তবে টানিয়া আনিয়াছিল ঘরখালি হওয়ার পর ধীরাজের অস্ফুট প্রশ্ন : 'আলো নিভালে না ?'

এ প্রশ্ন সুনয়না অনেকবার শুনিয়াছে। শোয়ার আগে আলো নিভাইতে তার প্রায়ই খেয়াল থাকে না, ধীরাজ মনে পড়াইয়া দেয়। কাল এই পরিচিত সাধারণ প্রশ্নটি শুনিয়া আকস্মিক উত্তেজনায় তার দম যেন আটকাইয়া আসিয়াছিল। ধীরাজ কি তবে ঘরের আলো দেখিতে পাইতেছে !

ধীরাজ সাড়া দেয় নাই। তখন সুনয়না বুঝিতে পারিয়াছিল, ঘুমের অভ্যাস বশে ধীরাজ ওকথা বলিয়াছে। ঘরে আলো জ্বালানো থাক বা নিভানো হোক, ধীরাজের তাতে সব সমান।

বুকের অস্বাভাবিক টিপ্‌টিপানি কমিয়া তখন স্বাভাবিক কান্না বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ধীরাজের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ভয়ে প্রাণ খুলিয়া সে কাঁদিতেও পারে নাই।

তারপর কখনও সন্তর্পণে বিছানায় উঠিয়া কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া আবার নামিয়া আসিয়া, কখনও এক দৃষ্টিতে ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দেখিয়া, কখনও জানালার শিক ধরিয়া পাশের বাড়ীর উঠানে আবছা চাঁদের আলোয়

চেনা জিনিষগুলিকে নূতন করিয়া চিনিবার চেষ্টা করিয়া আর সমস্তক্ষণ আকাশ পাতাল ভাবিয়া সে রাত কাটাইয়াছে। ঘরের আলো নিভানোর কথা একবারও তার মনে পড়ে নাই।

বেলা বাড়িলে কয়েকজন প্রতিবেশী দেখা করিতে এবং দুঃখ জানাইতে আসিলেন। আগে সুনয়না ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, আজ সে উদ্ধত-ভাবে বিছানার কাছ হইতে শুধু একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়ায়। এই সামান্য ব্যাপারে তার এমন বিরক্তি বোধ হয় বলিবার নয়। সকলের সমবেদনার গাম্ভীর্য্যে বিকৃত মুখ দেখিয়া আর অর্থহীন ভদ্রতার মিঠা মিঠা কথা শুনিয়া গায়ে যেন তার আগুন ধরিয়া যাইতে থাকে। একজন অকালবৃদ্ধ সবজান্তা ভদ্রলোক যখন অদ্ভুত একটা আফশোষের শব্দ করিয়া বলেন যে এলোপ্যাথি না করিয়া হোমিওপ্যাথি করিলে হয়তো উপকার হইত, তখন বাঘিনীর মত তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাকে ঘরের বাহির করিয়া দেওয়ার ইচ্ছাটা দমন করা কাল রাত্রে কান্না চাপিয়া রাখার চেয়েও সুনয়নার কঠিন মনে হয়।

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল তার গলার আওয়াজে তারই মনের কথা কে যেন উচ্চারণ করিতেছে: 'আপনারা এখন আসুন, উনি একটু বিশ্রাম করবেন।'

সকলে আহত বিস্ময়ে তার এলোমেলো চুল, ক্লিষ্ট মুখ আর বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকায়। ধীরাজ ভদ্রতার খাতিরে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বিনয়ের হাসি হাসিবার চেষ্টা করিতেছিল, তার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়।

সকলের আগে কথা বলেন অকাল বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি: 'চলো হে চলো, আপিসের বেলা হল।'

ধীরাজের ছোট ভাই বিরাজ সকলকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আনিয়াছিল, সকলে চলিয়া গেলে সে বলিল, 'তুমি সকলকে তাড়িয়ে দিলে বৌদি !'

ধীরাজ ভৎর্সনার সুরে বলিল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?'

সুনয়না উদ্‌ভ্রান্তভাবে বাঁ হাতের বুড়া অঙ্গুল দিয়া নিজের কপালটা ঘষিতে থাকে, কথা বলে না। বিরাজ বছর তিনেক ডাক্তারি পড়িতেছে, সুনয়নার মূর্ত্তি দেখিয়া এতক্ষণে তার খেয়াল হয়, হয় তো তার অসুখ করিয়াছে।

'তোমার অসুখ করেছে নাকি বৌদি !'

সুনয়না মাথা নাড়িয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরেই বিরাজ গিয়া খবর দিল, 'দাদা ডাকছে বৌদি।'

ঘরে ফিরিয়া গিয়া ধীরাজের পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুনয়না স্তম্ভিত হইয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে, ডান হাতে সে নিজের চুলগুলি সজোরে মুঠা করিয়া ধরিয়া আছে।

সুনয়না সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল 'কি হয়েছে ?'

ধীরাজ অস্বাভাবিক চাপা গলায় বলিল, 'তোমার অসুখ করেছে তো ? আমি টের পাইনি ! বিরাজ না বললে জানতেও পারতাম না। এবার থেকে তোমার অসুখ করবে আর আমি না জেনে তোমায় খাটিয়ে মারব, বকব—'

ধীরাজ হঠাৎ যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, 'ঠকাও, ঠকাও, তুমিও আমায় ঠকাও। চোখে তো দেখতে পাই না, যা ইচ্ছা তাই বলে কচি ছেলের মত ভোলাও।' বলিয়া ধীরাজ কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আগের মত শান্তভাবে ধীরাজ কথাগুলি বলিলে সুনয়না হয়তো তার পাশে বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদাকাটা আরম্ভ করিয়া দিত। স্বামীর ব্যাকুলতা আর কান্না দেখিয়া নিজেকে সে সংযত করিয়া ফেলিল। ধীরে

ধীরে পাশে বসিয়া স্বামীর মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া কয়েক ঘণ্টা আগে ধীরাজ যে ভাবে তার মাথায় হাত বুলাইয়া তাকে স্বান্তনা দিয়াছিল তেমনি ভাবে এখন তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'ওরকম কোরো না। পাগল হয়েছ, তোমায় ঠকাব ? ঠাকুরপোর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে ? ভাবনায় চিন্তায় রাত জেগে মুখ একটু শুকনো দেখাচ্ছে, ওম্‌নি ঠাকুরপো ধরে নিল আমার অসুখ হয়েছে। অসুখ হলে তোমায় বলব না ?'

'কিন্তু বিরাজ যে বলল তোমার নার্ভাস ব্রেকডাউনের উপক্রম হয়েছে ?'

'ঠাকুরপো তো মস্ত ডাক্তার !'

এমন সময় আসিলেন পিসীমা। সুনয়নার দিকে কেউ নজর দিতেছে না বলিয়া বিরাজ বোধ হয় বাড়ীর লোককে একটু খোঁচাইয়া দিয়াছিল, ঘরে ঢুকিয়াই পিসীমা বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, তুমি কি আরম্ভ করে দিয়েছ বৌমা ? কাল থেকে উপোস দিচ্ছ এয়োস্ত্রী মানুষ —'

পিসীমার পিছনে পিছনে কাকীমাও আসিয়াছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'আহা, থাক্, থাক্। এসো বৌমা, একটু কিছু খেয়ে নেবে এসো।'

কাকীমা একটু গম্ভীর চুপচাপ মানুষ, কারও সঙ্গে বেশী মেলামেশা করেন না। এতদিন মানুষটাকে দেখিলেই সুনয়নার বড় মায়া হইত, মনে হইত, আহা, দশ বার বছর বেচারী অন্ধ স্বামীকে নিয়া ঘর করিতেছে। আজ কাকীমার শান্ত কোমল মুখখানা দেখিয়া তার গভীর বিতৃষ্ণা বোধ হইতে লাগিল, আন্তরিক মমতাভরা কথাগুলি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল ; সুযোগ পাইয়া তাকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছেন, পিসীমার মৃদু ভর্ৎসনার প্রতিবাদ করিয়া যেন ইঙ্গিতে বলিতেছেন, আহা থাক থাক, ওকে বকবেন না, ও এখন আমার দলের।

একটু আগে সুনয়না হয় তো নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া প্রতিবেশী ভদ্রলোকদেব মত গুরুজন দু'জনকেও অপমান করিয়া বসিত। কিন্তু ধীরাজের আকস্মিক উদ্‌ভ্রান্তভাব তার সমস্ত সঙ্গত ও অসঙ্গত উচ্ছ্বাসের বাহির হওয়ার পথ তখনও বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া সে নীববে কাকীমাব সঙ্গে চলিয়া গেল।

একবার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াই ধীরাজের ধৈর্য্য আর সংযম যেন নষ্ট হইয়া গেল। এতক্ষণে সে যেন টের পাইয়াছে তাব চারিদিকে যে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে সেটা রাত্রির সাময়িক অন্ধকাব নয়, ভাগ্যের চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত। কখনও দুঃখে সে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কখনও অধীর হইয়া ছটফট কবিতে লাগিল। মা একবার ছেলেকে দেখিতে আসিয়া ছেলের অবস্থা দেখিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, চোখে আঁচল দিয়া পালাইয়া গেলেন। বাড়ীর সকলে আসিয়া নানাভাবে তাকে শান্ত করিবাব চেষ্টা কবিল, কিন্তু তাতে সে যেন আবও অশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

সব কথার জবাবে গুমরাইয়া গুমবাইয়া কেবলি বলিতে লাগিল, 'অন্ধ হয়ে বেঁচে থেকে কি হবে, এব চেয়ে মবাই ভাল।'

ধৈর্য্য আর সংযম দেখা দিল সুনয়নার মধ্যে। মনেব সমস্ত অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকে সে যেন জোর করিয়া মনেব জেলে পুরিয়া ফেলিল, বাহিরে আর তাদের অস্তিত্বেব কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। দু'জনেব দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তারা যেন পরামর্শ করিয়া পরস্পরের মানসিক অবস্থাকে অদল বদল করিয়া নিয়াছে। ধীবাজ যতক্ষণ শান্ত ছিল ততক্ষণ পাগলামী করিয়াছে সুনয়না, এবার ধীবাজকে পাগল হওয়াব সুযোগ দিয়া সুনয়না আত্মসম্বরণ করিয়াছে।

জুয়াড়ীর বৌ

ধরিতে গেলে জুয়ার দিকে মাখনের ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা হইতেই। তার অল্প বয়সের খেয়াল আর খেলাগুলির মধ্যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের এমন জোরালো মানসিক বিকারের সূচনা অবশ্য কেউ কল্পনা করিতে পারিত না। বাজী ধরে না কে, লটারীর টিকিট কেনে না কে, মেলায় গেলে নম্বর লেখা টেবিলে দু'চারটা পয়সা দিয়া ঘূর্ণ্যমান চাকায় লেখা নম্বরের দিকে তীর ছোঁড়ে না কে? এসব তো খেলা—নিছক খেলা। তবে মাখনের একটু বাড়াবাড়ি ছিল। কথায় কথায় সকলের সঙ্গে বাজী ধরিত, লটারীর টিকিট কেনার পয়সার জন্য বিরক্ত করিয়া করিয়া গুরুজনের মার খাইত, মেলায় গিয়া অন্য জিনিষ কেনার পয়সা তীর ছুঁড়িবার খেলায় হারিয়া আসিত। এই তুচ্ছ ছেলেমানুষী পাগলামী যে একদিন একটা মারাত্মক নেশায় দাঁড়াইয়া যাইবে একথা কারও মনে আসে নাই।

প্রকৃত জুয়া আরম্ভ হয় ঘোড় দৌড়ের মাঠে। মাখন তখন কলেজে গোটা দুই পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। নলিনীর দাদা সুরেশ ছিল তার প্রাণের বন্ধু, একদিন সেই তাকে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে নিয়া গেল।

'আজ একটু রেস্ খেলি চ' মাখন।'

'রেস? আমার কাছে মোটে দশটা টাকা আছে।'

'আবার কত চাই? লাগে তো আমি দেব'খন—যায়।'

সাত টাকা জিতিয়া দু'জনের সেদিন কি ফুর্তি! সায়েবী হোটেলে সাতগুণ দাম দিয়া চিংড়ী মাছের মাথা আর মুর্গীর ঠ্যাং গিলিয়া বায়স্কোপ দেখিয়া সুরেশ বাড়ী গেল আর মাখন ফিরিল তার মেসে। তারপর আর দু'একবার রেস খেলিতে গিয়া কয়েকটা টাকা হারিয়াই সুরেশ যদিবা বিরক্ত হইয়া মাঠে যাওয়া এক রকম বন্ধ করিয়া দিল, একটা দিন যাইতে না পারিলে মাখনের মন করিতে লাগিল কেমন কেমন। সুরেশের কাছে প্রায়ই সে টাকা ধার করিতে লাগিল।

আরেকটা পরীক্ষা কোন রকমে পাশ করিবার পর একদিন হিসাব করিয়া দেখা গেল সুরেশের কাছে মাখন অনেক টাকা ধারে। বন্ধুকে টাকা ধার দিতে দিতে সুরেশের নামে পোষ্টাফিসে জমা টাকাগুলি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

'এবার বাড়ী গিয়ে তোর টাকা এনে দেব।'

ছেলেকে একেবারে এতগুলি টাকা দেওয়া মাখনের বাবার পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না, তবু তিন তিনটা পরীক্ষা পাশ করা ছেলে চাকরীর চেষ্টা করার আগে একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেখিতে চায়, সুযোগ না পাইলে ভয়ানক কিছু করিয়া বসিবার মত প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে চায়, টাকাটা তাকে না দিলেই বা চলে কেমন করিয়া?

বন্ধুকে দেওয়ার জন্য টাকাগুলি সঙ্গে নিয়া মাখন কলিকাতায় পৌঁছিল শনিবার সকাল দশটার সময়। সমস্ত পথ সে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এতদিন অল্প টাকা নিয়া খেলার জন্য সে হারিয়াছে। বেশী টাকা নিয়া খেলিলে জিতিবার সম্ভাবনা বেশী। বন্ধুর সমস্ত ঋণ

একেবারে শোধ করার কি দরকার আছে? আজ যদি কিছু বেশী টাকা টাইগার জাম্পের উপর ধরে—টাইগার জাম্প আজ নিশ্চয় জিতিবে,—ঘোড়াটা ফেবারিট হইলেও তিনগুণ নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। সুরেশকে দিয়া দেওয়ার আগে টাকাটা খাটাইয়া কিছু লাভ করিয়া নিলে দোষ কি আছে? সব টাকা নয়—অর্দ্ধেক। হারুক বা জিতুক অর্দ্ধেক টাকা সে স্পর্শ করিবে না, ঋণ পরিশোধের জন্য থাকিবে।

সন্ধ্যার আগে শেষ ঘোড়দৌড়ের শেষে খালি পকেটে মাখন এনক্লোজারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পরদিন অনেক বেলায় সে ম্লান মুখে সুরেশদের বাড়ী গেল। দরজা খুলিয়া দিল নলিনী। আগে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিত, আজ কিন্তু মুখখানা তার বড়ই গম্ভীর দেখাইতে লাগিল।

'ছাতে চুল শুকোচ্ছিলাম, আপনাকে আসতে দেখে নেমে এলাম।'

নলিনীর হাসির অভাবটা পূরণ করার জন্য মাখন নিজেই একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'বেশ করেছো। সুরেশ কই?'

'দাদা আসছে। টাকা এনেছেন দাদার?'

মাখন থতমত খাইয়া বলিল, 'টাকা? ও, টাকা। তুমি জানলে কি করে টাকার কথা?'

'আমি কেন, সবাই জানে। বাবা রেগে আগুন হয়ে আছে। আনেন নি তো? তা আনবেন কেন!'—গম্ভীর মুখ অন্ধকার করিয়া নলিনী ভিতরে চলিয়া গেল।

সুরেশ আসিলে টাকার কথাটা উঠিল বড়ই খাপছাড়া ভাবে। মাখন বলিল, 'তোর টাকাটা দিতে পারব না সুরেশ। এক কাজ কর, ওই টাকাটা আমায় পণ দে, আমি নলিনীকে বিয়ে করব।'

কথা ছিল কথাটা গোপন থাকিবে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা থাকিল না। বিনা পণে বন্ধুর বোনকে বিবাহ করার জন্য মনে মনে বাড়ীর সকলেই একটু চটিয়াছিল—নলিনী তেমন রূপসীও নয়। কথাটার সমালোচনা হইত নানাভাবে—একটু কটু ভাবেই। নলিনী যে কি করিয়া মাখনকে ভুলাইল ভাবিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইত। আজকালকার মেয়ে, ফন্দিবাজ বাপের মেয়ে, ওদের পক্ষে সবই হয়তো সম্ভব। আচ্ছা, পয়সা কড়ি যখন দিল না, গয়না কিছু বেশী দেওয়া কি উচিত ছিল না নলিনীর বাপের ?

শুনিতে শুনিতে একদিন রাগে নলিনী দিশেহারা হইয়া গেল। বড় গুরুজন কেউ মন্তব্য করিলে রাগে দিশেহারা হইয়াও হয়তো সে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু সেদিন মন্তব্যটা করিয়াছিল ননদ বিধু। তার সঙ্গে ইতিমধ্যে কতকটা ভাব হইয়া যাওয়ায় সে বলিয়া ফেলিল, 'পণ দেওয়া হয়নি মানে ? পণ তো ওঁকে আগেই দেওয়া হয়েছে।'

তারপর সব জানাজানি হইয়া গেল। প্রথমটা কেউ বিশ্বাস করিতেই চায় না, কিন্তু সত্য কথায় বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি! মাখনকে জিজ্ঞাসা করায় সেও স্বীকার করিয়া ফেলিল।

রাত্রে মাখন বলিল, 'টাকার ব্যাপারটা বলতে না তোমায় বারণ করেছিলাম ? বললে কেন ?'

নলিনী বলিল, 'ব্যবসার নাম করে দাদাকে দেবার জন্য টাকা নিয়ে গিয়েছিলে আমায় বলনি কেন ? আমার রাগ হয় না বুঝি ?'

'হুঁ, রাগ হলে তুমি বুঝি দশজনের কাছে আমার বদনাম করে শোধ তুলবে ? তুমি তো কম শয়তান নও!'

বিশ্রী একটা কলহ হইয়া গেল, কথা বন্ধ রহিল তিন দিন। আবার কথা আরম্ভ হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা,

অতগুলো টাকা কি করলে ? দাদার কাছ থেকে নিয়েছো, বাবার কাছ থেকে নিয়েছো, টাকা তো কম নয় !'

প্রথমে কৈফিয়ৎটা ভাল করিয়া নলিনীর মাথায় ঢুকিল না। চুপি চুপি কার সঙ্গে মাখন ব্যবসা করিতেছিল, সব টাকা লোকসান গিয়াছে। তারপর সে টের পাইল মাখন মিথ্যা বলিতেছে। মনটা তার খারাপ হইয়া গেল। স্বামীর মন তো তার ছোট নয়, টাকা পয়সার ব্যাপারে সে বরং অতিমাত্রায় উদার। টাকা পয়সার ব্যাপারেই তার কেন মিথ্যা বলার প্রয়োজন হইল ?

বাপ আর শ্বশুরের চেষ্টায় মাখনের একটা চাকরী জুটিয়া গেল ভালই। বছর পাঁচেকের মধ্যে বেতন বাড়িয়া দাঁড়াইয়া গেল প্রায় তিনশ' টাকায়। এতদিনে নলিনীর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইয়াছে এবং কতকটা স্বামীর চাকরীর জন্যই অতি দ্রুত প্রমোশন পাইয়া পাইয়া স্বামীর সংসারে প্রায় গিন্নীর পদ পাইয়াছে। সংসারে বিশেষ অশান্তি নাই, রোগ শোক নাই, অনটন নাই—নলিনীর মনেও জোরালো দুঃখ কিছু নাই। কেবল সেই যে তিন দিন কথা বন্ধ থাকার পর মাখনের মিথ্যা বলার জন্য মনটা তার খারাপ হইয়া গিয়াছিল, মৃদু আশঙ্কার মত একটা স্থায়ী অস্বস্তির মধ্যে সেই মন খারাপ হওয়ারই কেমন যেন একটা অদ্ভুত খাপছাড়া জের চলিতেছে। কোন পাপ করে নাই নলিনী তবু ভয়ে রূপান্তরিত পুরাণো পাপের মতই কি যেন একটা দুর্বোধ্য ভার সব সময়েই তার মনকে বহন করিতে হইতেছে।

মাখনের জুয়ার নেশা কাটিয়া যায় নাই, ভালবাসার নেশার মতই প্রথম বয়সের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আর অসহ্য অধীরতার যুগটা পার হইয়া ধীর স্থির হিসাব করা নেশায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পাকা প্রেমিকের অভ্যস্ত প্রেম করার মত তার জুয়া খেলাটাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে অনেকটা

নিয়মিত। টাকা অবশ্য জমে না, অনেক সাধ অবশ্য মেটে না, মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনের সময় টাকার জন্য অবশ্য সাময়িক ভাবে রীতিমত বিপদে পড়িতে হয়, তবু মোটামুটি সংসার চলিয়া যায়। মাখনের শ'খানেক টাকা বেতন হইলে যেমন চলিত তেমনিভাবে চলিয়া যায়। মাখনের বেতন শ'খানেক টাকা ধরিয়া নিলে অবশ্য অনেক হাঙ্গামাই মিটিয়া যাইত, এর চেয়ে অনেক কম বেতনেও জগতে অনেক লোক চাকরী করে, কিন্তু মুস্কিল এই যে তিনশ' টাকা যে বেতন পায় তার বেতনের দুশো টাকা কোন কাজে না আসিলেও বেতন তার শ'খানেক টাকার বেশী নয় এটা ধরিয়া নেওয়া তার নিজের পক্ষেও অসম্ভব, আত্মীয় বন্ধুর পক্ষেও অসম্ভব।

আত্মীয় বন্ধুর রাগ অভিমান বিরক্তি আর উপদেশ উপরোধ সমালোচনা এখনও চলিতে থাকিলেও নলিনী একরকম আর কিছুই বলে না। সে জানে এ রোগের ওষুধ নাই। এ কথাটাও সে জানে যে প্রয়োজন হইলে জুয়ার খরচটা মাখন কমাইয়া দিবে, কিন্তু সত্য সত্যই প্রয়োজন হওয়া চাই। পেট ভরানোর মত, গা ঢাকা দেওয়ার মত, রোগের সময় ডাক্তার টাকা ওষুধ কেনার মত খাঁটি প্রয়োজন। এরকম আসল প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ববোধের কাছেই কেবল তার জুয়ার নেশা হার মানে।

কত কৃত্রিম প্রয়োজনেই নলিনী দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছে! কতবার কতভাবে স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সংসারে এটা চাই, ওটা চাই সেটা চাই। মাখন শুধু বলিয়াছে, আচ্ছা আচ্ছা, হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রায় কিছুই হয় নাই।

বাড়ী বদলানোর জন্য নলিনী অনেকবার ঝগড়া করিয়াছে। বলিয়াছে, 'এ বাড়ীতে আমি থাকিব না, একটা ভাল বাড়ীতে চল।'

বলিয়া রাগ করিয়া বাপের বাড়ীতে চলিয়াছে। তখন অবশ্য মাখন বেশী ভাড়ার একটা ভাল বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তার ফলটা নলিনীর পক্ষেই হইয়াছে মারাত্মক। কারণ, জুয়ার খরচ মাখন এক পয়সা কমায় নাই, টান পড়িয়াছে সংসারের খরচেই। আবার উঠিয়া যাইতে হইয়াছে কম ভাড়ার বাড়ীতে।

নলিনী বলিয়াছে, 'আমি দু'গাছা করে নতুন চুড়ি গড়াব।'

মাখন বলিয়াছে, 'আচ্ছা।'

কিন্তু তারপর দু'বছরের মধ্যে সস্তা এক জোড়া দুলও নলিনীর গড়ানো হয় নাই। কারণ, চুড়িও নলিনীর আছে, দুলও আছে।

কিন্তু নলিনী যেদিন বলিয়াছে, 'একটা লাইফ ইনসিওর পর্য্যন্ত করবে না তুমি?' তার একমাসের মধ্যে মাখন দশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়া আসিলেও বেশী ভাড়াব বাড়ীতে উঠিয়া যাওয়ার ফলটা নলিনীকে ভোগ করিতে হয় নাই।

ধরিতে গেলে টাকা পয়সার ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়াই হইয়া গিয়াছে। তবু সেই রহস্যময় মৃদু আতঙ্কের পীড়ন একটুও শিথিল হয় নাই। কি যেন একটা বিপদ ঘটিবে—অল্পদিনের মধ্যেই ঘটিবে। কিন্তু কি ঘটিবে? মাখন একদিন জুয়ায় সর্ব্বস্ব হারিয়া সর্ব্বনাশ করিবে? কিন্তু মাখনের সর্ব্বস্ব তো তার তিনশ' টাকার চাকরী, উপার্জ্জনের টাকা জুয়ার নেশায় নষ্ট করা সম্বন্ধে সে যতই অবিবেচক হোক, চাকরী নষ্ট করার মানুষ সে নয়। সে বিশ্বাস নলিনীর আছে। তবে? আরও অনেক বেশী আরামে ও সুখে বাঁচিয়া থাকার সুযোগ পাইয়াও স্বামীর দোষে কোনরকমে খাইয়া পরিয়া অতি গরীবের

মত বাঁচিয়া থাকিতে হওয়ার যে জ্বালাভরা অভিযোগ, এটা কি তারই প্রতিক্রিয়া ?

কিন্তু কোথায় জ্বালাভরা অভিযোগ ? রাজপ্রাসাদে রাজরাণীর মত সুখে ও আরামে থাকিবার ব্যবস্থা মাখন করিয়া দিক এটা সে চায়, মাখনের ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে চায়, কিন্তু না পাওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষোভ তো তার নাই।

নলিনী তাই কিছু বলে না। সব বিষয়েই সে এক রকম হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, মাখনের সহজ সাধারণ ভালবাসার মধ্যে একটু রোমাঞ্চ আনিবার চেষ্টায় পর্য্যন্ত। চেনা মানুষ স্বামী হইয়াছে, তার কাছে কি অচেনা মানুষের নাটকীয় ভালবাসা আশা করা যায় ? এতদিন ছেলেমানুষ ছিল তাই চেষ্টা করিয়াছে, বিবাহের আগে বুদ্ধি কম ছিল তাই তখন ভাবিয়াছে, বিবাহ হইলে হয়তো মাখন বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু জুয়ার নেশায় উত্তেজনা আর অবসাদের মধ্যে যার মনের জোয়ার ভাঁটা বৌ-এর কথা কি তার মনে পড়ে, বৌ-এর জন্য একবার একটু পাগল হওয়ার সময় কি তার থাকে !

ভাবিতে ভাবিতে নলিনীর সাধারণ ছোট ছোট চোখ দুটিতে অস্পষ্ট স্বপ্নের স্পষ্ট ছায়া এমন অদ্ভুত ভাবালুতার আবরণে ঘনাইয়া আসে যে জগতের সব ডাগর ডাগর চোখগুলিতেও তা সম্ভব মনে হয় না। হয়তো তখন দুপুর বেলায় আঁচল পাতিয়া মেঝেতে গড়ানোর অবসরটা পাওয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়ের একজন খেলায় মত্ত, একজন ঘুমে অচেতন। চোখ বুজিলে কষ্ট বাড়িয়া যায়, নলিনী তাই চোখ মেলিয়া স্বপ্ন ত্থাখে—তার কুমারী জীবনের স্বপ্ন : আত্মহারা আবেগের সঙ্গে তাকে ভালবাসিলে মাখন কি করিত। সম্ভব অসম্ভব কত কথাই নলিনী ভাবে।

তারপর অল্প অল্প অস্বস্তির মধ্যে মৃদু ভয়ের পীড়নে স্বপ্ন শেষ হইয়া চোখ দুটি তার বড় সাধারণ দেখাইতে থাকে। দু'টি সন্তান যার তার কেন আর এসব স্বপ্ন দেখা, আর কি এ স্বপ্ন সফল হয়! যদিবা হয়, কোন এক আশ্চর্য্য উপায়ে আংশিকভাবে সফল হয়, দুদিন পরে সেটুকু সম্ভাবনাও আর থাকিবে না। আবার ছেলে বা মেয়ে কোলে আসিবে নলিনীর, তারপর সব শেষ। উদাসীন মাখনের মধ্যে প্রেমের উদ্দীপনা জাগানোর কথা ভাবিতে তার নির্জ্জেরই কি লজ্জা করিবে না? কি দিয়াই বা সে উদ্দীপনা জাগাইবে।

এখনো কেউ জানে না! দু'দিন পরেই জানিবে। মাখন হয় তো খুসী হইয়া আদর যত্ন বাড়াইয়া দিবে, বলিবে: 'একটু দুধ খেয়ো। এসময় দুধটুধ খেতে হয়।' কিন্তু তারপর? আরও শ্রান্ত হইয়া পড়িবে মাখন, আরও ঝিমাইয়া পড়িবে। মাথা কপাল খুঁড়িয়া মরিয়া গেলেও আর নলিনী তাকে জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না। নলিনীর ভ্রু কুঁচকাইয়া যায়, সঙ্কুচিত চোখ দুটিতে মরণের চেয়ে গভীর আতঙ্কের ছাপ পড়ে, শীতের দুপুরে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়।

কোন কি উপায় নাই? যে কোন একটা উপায়? ব্যর্থ হইলে যদি সর্ব্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, তবু সার্থকতার যেটুকু সম্ভাবনা থাকিবে তারই লোভে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত। কিন্তু সেরকম উপায়ই বা কোথায় যাতে সমস্ত শেষ হইয়া যায়, নয় মাখনের ভালবাসা মেলে?

ঠিক সেই সময় দুরু দুরু বুকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে মাঠে রেলিং ঘেঁষিয়া এগারটি ঘোড়ার মধ্যে একটির অগ্রগতি লক্ষ্য করিতে করিতে ভাবিতেছিল, এবারও না জিতলে বিপদে পড়িবে বটে, কিন্তু যদি জেতে—

সন্ধ্যার পর ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতে বন্ধু অবনীর সঙ্গে শ্রান্ত ক্লান্ত মাখন ফিরিয়া আসে। সুরেশের মত অবনী এখন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মানুষটা সে একটু বেঁটে, রোগা লাজুক আর ভীরু। কথার জবাবে পারিলে কথা বলার বদলে মৃদু একটু হাসিয়াই কাজ সারে। কখনো কেউ তাকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। ঘোড়া ছুটিবার সময় মাখন যখন আগ্রহে উত্তেজনায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কামড়াইতে থাকে, অবনী নির্ব্বিকার ভাবে বিড়ি টানিয়া যায়। জিতিলে মাখন 'হুররে' বলিয়া প্রচণ্ড একটা চীৎকার করিয়া লাফাইয়া ওঠে, হারিলে ঝিমাইয়া পড়ে। অবনী জিতিলেও মৃদু একটু হাসে, হারিলেও হাসে।

নলিনীর সাজপোষাক দেখিয়া দুজনেই একটু অবাক হইয়া যায়। ফ্যাসন করিয়া শাড়ী পরিয়াছে, রঙীন ব্লাউজ গায়ে দিয়াছে, শুধু ঘষামাজায় খুসী না হইয়া গালে বোধ হয় একটু রঙের আব চোখে একটু কাজলের ছোঁয়াচ দিয়াছে।

মাখন বলে, 'কোথায় যাবে?'

নলিনী একগাল হাসিয়া বলে, 'কোথায় আবার যাব?'

'সেজেছ যে?'

'সেজেছি? কি জ্বালা, কোথাও না গেলে বাড়ীতে বুঝি ভূত সেজে থাকতে হবে?' তারপর অবনীর কাছে গিয়া বলে, 'সইকে বুঝি তালা বন্ধ করে রাখেন, আসেনা কেন?'

অবনী নীরবে মৃদু একটু হাসে।

'চলুন সইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

বলিয়া স্বামীর যে বন্ধুর সঙ্গে তিন হাত তফাতে দাঁড়াইয়া নলিনী সংক্ষেপে কথা বলিত, রীতিমত তার হাত ধরিয়া তাকে টানিয়া তোলে এবং মাখনের দিকে এক নজর না চাহিয়াই বাহির হইয়া যায়।

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও নলিনী ভিতরের উত্তেজনা গোপন করিতে পারে না। অবনীর বৌ বলে, 'কি হয়েছে সই?'

'কিছু না।'

কোমরে আঁচল জড়াইয়া অবনীর বৌ রান্না করিতেছিল। নলিনীর চেয়ে সে বয়সে বড়, কিন্তু বড়ই তাকে ছেলেমানুষ দেখায়। মানুষটা সে সব সময়েই হাসি-খুসী, কাজ করিতে করিতে গুণ গুণ করিয়া এখনও গান করে। তাকে দেখিলেই নলিনীর বড় হিংসা হয়, মনটা কেমন করিতে থাকে। ওর স্বামীও তো জুয়া খেলে, তার চেয়ে অনেক কষ্টেই ওকে সংসার চালাইতে হয়, দুটি ছেলের মধ্যে একটি ওর মরিয়া গিয়াছে, তবু সব সময় এমন ভাব দেখায় কেন, দুদিন আগে বিবাহ হইয়া আসিয়া স্বামীর আদরে মাটিতে যেন পা পড়িতেছে না?

অবনীর বৌ বলে, 'এমন সেজে গুজে হঠাৎ?'

নলিনী বলে, 'এমনি এলাম তোমায় দেখতে?'

'কি ভাগ্যি আমার!' ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপাইয়া হাসিতে হাসিতে অবনীর বৌ কাছে আসিয়া বসে।

কথা আজ জমে না। রাত্রির সঙ্গে নলিনীর ভয় বাড়ে, ক্রমেই বেশী অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তবু উঠিবার নাম করে না। যত রাত হইবে মাখন তত বেশী রাগ করিবে—তত বেশী নাড়া খাইবে মাখনের মন। একটুও কি পরিবর্ত্তন আসিবে না? রাগটা যখন পড়িয়া যাইবে তখন?

রান্না শেষ হয়, অবনীর খাওয়া হইয়া যায়, তখনও নলিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অবনীর বৌ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। হাসি-খুসী ভাব মিলাইয়া গিয়া তারও মুখে যেন ভয়ের ছাপ পড়ে।

'আমায় কিছু বলবে সই?'

নলিনী মাথা নাড়িয়া বলে, 'কি বলব? না না, কিছু বলব না।'

'তোমায় নিতে আসছে না যে?'

'কে জানে। ওর কথা বাদ দাও।'

খানিক পরে অবনীর বৌ বলে, 'ওই তবে তোমায় দিয়ে আসুক আর রাত্তি করে কাজ নেই। পুঁই চচ্চড়ি রেঁধেছি, মুখে দিয়ে যাবে সই?

হোক আরেকটু রাত, মাখনের রাগ আরেকটু বাড়িবে। আরম্ভ যখন করিয়াছে, শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না। মরিয়া হইয়া নলিনী সখির রান্না পুঁই চচ্চড়ি মুখে দিবার জন্য সখীর সঙ্গে একথালায় খাইতে বসে। দুজনে বেশ পেট ভরিয়া খায়, সকালের জন্য পান্তা না রাখাতেই ভাতে কম পড়ে না, আর ডাল ভাজা মাছ তরকারী যতটুকুই থাক; ভাগা-ভাগি করিয়া খাওয়ার সময় তো মেয়েদের কখনো কম পড়েই না।

খাওয়ার পরে পান মুখে দিয়া অবনীর বৌ স্বামীকে ডাকিয়া বলে, 'ওগো শুনছো, একটু বেরিয়ে এসো ঘর থেকে। সইকে বাড়ী পৌছে দিয়ে এসো। বাবা, এগারটা বাজে!'

নলিনীর বুক কাঁপিয়া ওঠে। যেভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এতরাত্রে আবার অবনীর সঙ্গে একা ফিরিতে দেখিলে কি রাগটাই না জানি মাখন করিবে! করুক রাগ রাগাইবার জন্যই তো সাজিয়া গুজিয়া এভাবে সে বাহির হইয়াছে, এখন সে জন্য ভয় পাইলে চলিবে কেন? নিজেকে নলিনী অনেক বুঝায় কিন্তু বুকের টিপ্‌টিপানি কিছুতেই কমে না।

দু'বন্ধুর বাড়ী বেশী দূরে নয়। রিক্সায় মিনিট দশেক লাগে। অবনীর বাড়ীর কাছেই গলির মোড়ে রিক্সা পাওয়া যায়। অবনী দু'টি রিক্সা ভাড়া করিতেছিল, নলিনী বারণ করিল, 'মিছিমিছি কেন বেশী পয়সা দেবেন? একটাতেই হবে।'

'না না, দুটোই নিই—

নলিনীর গলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, এসব খাপছাড়া উত্তেজনা কি তার সহ্য হয়! তবু মরিয়া হইয়া সে বলিল, 'আসুন না, একটাতে বসে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

গল্প কিছুই হয় না, সমস্ত পথ দুজনেই যতটা সম্ভব পাশের দিকে হেলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। বাড়ীর দরজার সামনে রিক্সা থামা মাত্র নলিনী তড়াক্ করিয়া নামিয়া যায়। অবনীকে বলে, 'ও কে ডেকে দিয়ে আপনি এই রিক্সাটা নিয়ে ফিরে যান।'

দরজা খুলিয়া দিতে আসিয়া মাথন দেখিতে পাইবে এতরাত্রে বৌ তার এক রিক্সায় অবনীর সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, নলিনীর এই আশা বা আশঙ্কা পূর্ণ হইল না। দরজা খুলিয়া দিল চাকর।

ঘরে গিয়া নলিনী ছাথে কি, মেয়েটাকে কোলে নিয়া অনাড়ির মত থাপড়াইয়া থাপড়াইয়া মাথন তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করিতেছে। বৌ-এর সাড়া পাইয়া মাথন ক্ষুন্ন কণ্ঠে বলিল, 'কি আশ্চর্য্য বিবেচনা তোমার! দুজনকে ফেলে রেখে এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে কাটিয়ে এলে? খুকীকে তো অন্ততঃ নিয়ে যেতে পারতে সঙ্গে।'

মেয়েকে নামাইয়া দিয়া মাথন নিজের বিছানায় উঠিয়া শ্রান্তভাবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। খুব যে রাগ করিয়াছে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

'তুমি কাউকে পাঠালে না কেন? অবনীবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে—'

'কাকে পাঠাব? শম্ভু এতক্ষণ খুকীকে রাখছিল।'

দু'মিনিট আগে দরজা খুলিতে যাওয়ার সময় শম্ভু তবে মেয়েকে মাথনের কোলে দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে মাথনেকে মেয়ে রাখিতে হয় নাই! নলিনী জিজ্ঞাসা করিল না, মাথন নিজে কেন তাকে আনিতে যায় নাই। আর জিজ্ঞাসা করিয়া কি হইবে? নিজের চোখে বৌ আর বন্ধুকে জড়াজড়ি করিতে দেখিলেও বোধ হয় তার রাগ হইবে না। এমন বদমেজাজী মানুষ, একগ্লাস জল দিতে দেরী হওয়ায় আজ সকালেই

শম্ভুকে মারিতে উঠিয়াছিল, শুধু বৌকে তার এত অনুগ্রহ কেন? একদিন কি সে রাগের মাথায় বৌ-এর গালে একটা চড় বসাইয়া দিতে পারে না, যাতে খানিক পরে ভালবাসার জন্য না হোক অন্ততঃ অনুতাপের জন্যও অনেকগুলি চুমু দিয়া চড়ের দাগটা মুছিবার চেষ্টা করা চলে?

বাহিরটা একবার তদারক করিয়া আসিয়া নলিনী ঘুমন্ত মেয়ের পাশে শুইয়া পড়ে। মাখন বলে, 'খেলে না?'

নলিনী বলে, 'ওদের বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া যায়, তারপর মাখন যেন ভয়ে ভয়েই আস্তে আস্তে বলে, 'আজ অনেকগুলি টাকা জিতেছি।'

নলিনী সাড়া দেয় না।

'প্রায় সাতশো।'

নলিনী তবু সাড়া দেয় না।

'তোমায় একটা গয়না গড়িয়ে দেব—যা চাও।'

নলিনী চুপ করিয়া থাকে। নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবে: 'কে শুনতে চায় তুমি হেরেছো কি জিতেছো, কে চায় তোমার গয়না, একবার কাছে ডাকতে পারনা আমায়?'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মাখন বলে, 'রাগ করেছ? না না, ঘুমোও আর জালাতন করব না।'

সমাপ্ত